ভাষা প্রসঙ্গ

পঞ্চম শ্রেণি

সিরাজুল ইসলাম

সূ চি প ত্র

প্রথম খণ্ড ঃ ব্যাকরণ অংশ

১ **ভাষা ও ব্যাকরণ** ০৭-১২

ভাষার সংজ্ঞা।। ভাষার প্রয়োজনীয়তা।। ভাষার রূপভেদ।। সাধুভাষা ও চলিতভাষা।। ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা।। মাতৃভাষায় ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর।। অনুশীলনী।।

২ **ধ্বনি ও বর্ণ** ১৩-২১

ধ্বনি ও বর্ণের সংজ্ঞা।। স্বরধ্বনির সংজ্ঞা।। স্বরবর্ণের শ্রেণিবিভাগ।। ব্যঞ্জনধ্বনি ও ব্যঞ্জনবর্ণ।। ব্যঞ্জনবর্ণের শ্রেণিবিভাগ।। বানান, অক্ষর ও যুক্ত ব্যঞ্জন।। বর্ণ বিশ্লেষণ।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর।। অনুশীলনী।।

৩ **শব্দ, পদ ও বাক্য** ২২-৩০

শব্দের সংজ্ঞা।। পদের সংজ্ঞা।। বাক্যের সংজ্ঞা।। উদ্দেশ্য ও বিধেয়।। বাক্যের শ্রেণিবিভাগ।। অর্থ ঠিক রেখে বাক্য পরিবর্তন ।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর।। অনুশীলনী।।

৪ **পদের শ্রেণিবিভাগ** ৩১-৪৬

পদের শ্রেণিবিভাগ।। বিশেষ্য পদ।। বিশেষ্য পদের শ্রেণিবিভাগ।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর।। অনুশীলনী। সর্বনাম পদ ও তার শ্রেণিবিভাগ।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর।। অনুশীলনী। বিশেষণ পদ ও তার শ্রেণিবিভাগ।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর।। অনুশীলনী। অব্যয় পদ ও তার শ্রেণিবিভাগ।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর।। অনুশীলনী। ক্রিয়াপদ ও তার শ্রেণিবিভাগ।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর।। অনুশীলনী।।

৫ **ক্রিয়ার কাল** ৪৭-৫০

ক্রিয়ার কাল ও তার শ্রেণিবিভাগ।। বিভিন্ন কালের উপবিভাগ।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর।। অনুশীলনী।।

৬ **বচন** ৫১-৫৪

বচনের সংজ্ঞা।। একবচন ও বহুবচনের নিয়ম।। একবচন থেকে বহুবচনে রূপান্তর।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর।। অনুশীলনী।।

৭ **পুরুষ** ৫৫-৫৭

পুরুষের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ।। পুরুষ অনুযায়ী ক্রিয়ার রূপ।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর।। অনুশীলনী।।

৮ **লিঙ্গ** ৫৮-৬৩

লিঙ্গের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ।। লিঙ্গ পরিবর্তনের নিয়ম।। পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর।। অনুশীলনী।।

৯ **সন্ধি** ৬৪-৭৪

সন্ধির সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ।। সূত্র অনুযায়ী স্বরসন্ধির উদাহরণ।। সূত্র অনুযায়ী ব্যঞ্জনসন্ধির উদাহরণ।। নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি ও নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর।। অনুশীলনী।

১০ **কারক ও বিভক্তি** ৭৫-৭৮

কারকের সংজ্ঞা ও শ্রেণিবিভাগ।। বিভিন্ন প্রকার কারকের সংজ্ঞা ও উদাহরণ।। সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ।। সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর।। অনুশীলনী।।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ নির্মিতি অংশ

১১ **পদ পরিবর্তন** ৭৯-৮২

বিশেষ্য থেকে বিশেষণ এবং বিশেষণ থেকে বিশেষ্য পদে রূপান্তর। অনুশীলনী।।

১২ **বিপরীতার্থক শব্দ** ৮৩-৮৫

বিপরীতার্থক শব্দের উদাহরণ।। অনুশীলনী।।

১৩ **সমার্থক শব্দ** ৮৬-৮৮

১৪ **সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ** ৮৯-৯১

১৫ **বিরাম চিহ্ন** ৯২-৯৩

১৬ **শুদ্ধ বানান** ৯৪-৯৫

১৭ **দেওয়াল পত্রিকা** ৯৬-৯৭

১৮ **দিনলিপি প্রস্তুত বা ডায়েরি লিখন** ৯৮-৯৯

১৯ **বোধ-পরীক্ষণ** ১০০-১০৪

২০ **গল্প-রচনা** ১০৫-১০৯

২১ **পত্র-রচনা** ১১০-১১৭

পত্রের শ্রেণিবিভাগ।। পত্র-রচনার নিয়মাবলি।। বিভিন্ন প্রকার পত্রের নমুনা।। অনুশীলনী।।

২২ **অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ রচনা** ১১৮-১৪৯

অনুচ্ছেদ

গোরুর উপকারিতা।। কুকুর।। বিড়াল।। হাতি।। মরুভূমিতে উঠের উপকারিতা।। ধান।। পাট।। চা।। গ্রীষ্মকাল।। বাংলার বর্ষা।। শরৎকাল।। শীতকাল।। বসন্তকাল।। দুর্গাপূজা।। সরস্বতীপূজা।। মহরম।। ইদ।। বড়োদিন।। আমাদের জাতীয় পতাকা।। স্বাধীনতা দিবস।। একতাই বল।। সময়ের মূল্য।। শ্রমের মর্যাদা।। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।। কাজী নজরুল ইসলাম।। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।। স্বামী বিবেকানন্দ।। বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্র বসু।। করুণাময়ী মাদার টেরেসা।। মহাত্মা গান্ধি।। বিশ্বজয়ী কন্যাশ্রী।। আমার প্রিয় খেলা ক্রিকেট।। আমার ভালোলাগা একটি বই।। একটি বনভোজনের অভিজ্ঞতা।। একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা।। ছৌ নৃত্য।।

প্রবন্ধ

পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার।। কম্পিউটার।। দূরদর্শন।। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান।। বনমহোৎসব বা গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও।। চরিত্র গঠনে খেলাধূলার ভূমিকা।। শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে দেশভ্রমণ।। তোমার দেখা একটি মেলা।। আমার প্রিয় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়।। সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা।। রিও অলিম্পিক—২০১৬।। তোমার দেখা একটি খেলা ।। প্রকৃতির রুদ্ররোষে কেদার-বদ্রী।।

পঞ্চম শ্রেণির উপযোগী কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকরণগত প্রশ্নের সমাধান ১৫০-১৬৮

অধ্যায় ১ ভাষা ও ব্যাকরণ

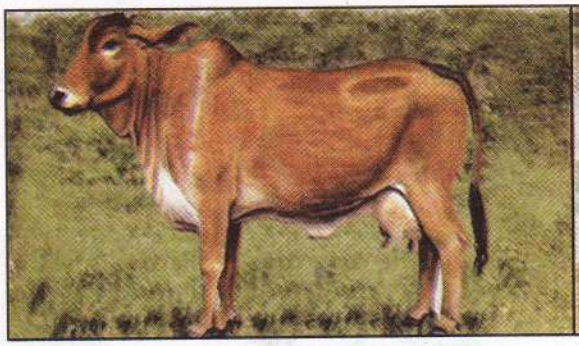

গোরুটি 'হাম্বা' শব্দ করে তার বাছুরকে ডাকছে

ঠাকুর মা তাঁর নাতনিকে বলছেন, 'নাচো তো, দিদি ভাই।'

গোরুটি যেই 'হাম্বা' বলে ডেকে উঠেছে, অমনি বাছুরটি ছুটে চলে এল। 'হাম্বা' হল গোরুর মনের ভাব প্রকাশক একটি শব্দ। এর বিশেষ কোনো অর্থ নেই বলে ব্যাকরণবিদ্‌রা একে ভাষা বলেন নি। দ্বিতীয় ছবিতে ঠাকুরমা তাঁর নাতনিকে বলছেন ''নাচো তো, দিদিভাই।'' এই বাক্যের দ্বারা ঠাকুরমার মনের ভাব বা ইচ্ছা প্রকাশ পাচ্ছে। নাতনিও ঠাকুরমার বক্তব্য বুঝতে পেরে নাচতে শুরু করেছে। আমাদের মনুষ্য সমাজে পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের জন্য আমরা মুখে যে কথা বলি, তাকেই **ভাষা** বলে।

ভাষার সংজ্ঞা ঃ মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত অর্থপূর্ণ ধ্বনি সমষ্টিকেই ভাষা বলে।

ভাষার প্রয়োজনীয়তা ঃ আদিম মানুষ জঙ্গলে বাস করত। তারা আকারে ইঙ্গিতে মনের ভাব প্রকাশ করত। অনেক সময় বিশেষ এক ধরনের শব্দ করে মনের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করত। মানুষ যখন সভ্য হল,

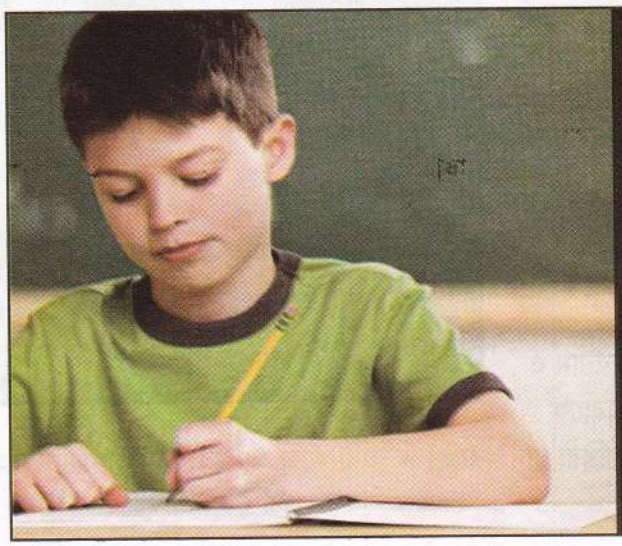

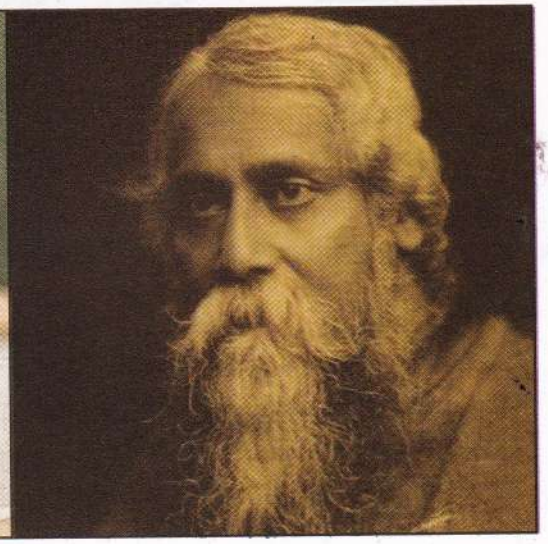

সমাজ তৈরি হল, তখন প্রয়োজন হল ভাষার। ভাষার সাহায্যেই মানুষ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে স্থাপন করেছে আধিপত্য। নিজের মনের কথা অন্যের কাছে ব্যক্ত করতে ভাষা একান্ত অপরিহার্য। ভাষার মাধ্যমেই পারস্পরিক আদান-প্রদানের ক্ষেত্রটি মজবুত হয়। মানুষ যে সমাজ তৈরি করেছে, তারও ভিত্তি এই ভাষা। পরবর্তীকালে এই ভাষাকে লিখে রাখার প্রয়োজনে মানুষ তৈরি করেছে লিপি। ভাষা না থাকলে মানুষের কোনো গৌরব থাকত না। পশু-পাখিদের কোনো ভাষা নেই বলে মানুষের মতো তারা উন্নত হতে পারেনি। ভাষা নেই বলেই তাদের কোনো স্কুল নেই, কলেজ নেই, সমাজ নেই, সাহিত্য নেই। ভাষাই মানুষকে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জীবে পরিণত করেছে। ভাষাকে অবলম্বন করেই মানুষ কালান্তরের মানুষের জন্য লিখে রাখে জীবনের কথা, উত্থানের কথা, বিবর্তনের ইতিহাস।

ভাষার রূপভেদ ঃ

যে ভাষার সাহায্যে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি তার দুটো ভাগ ঃ ১. কথ্যভাষা ২. লেখ্যভাষা।

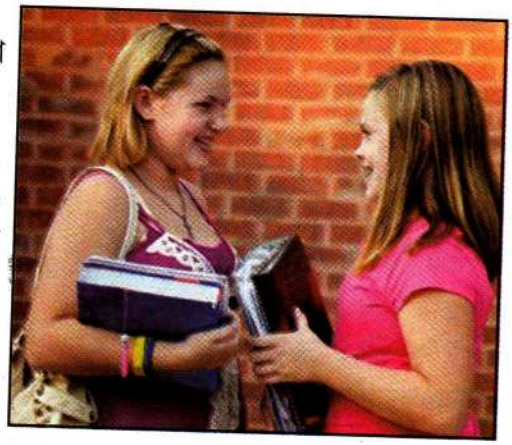

কথ্যভাষা ঃ

যে ভাষায় আমরা প্রতিদিন কথা বলি, গল্পগুজব করি, সমাজের মানুষের সঙ্গে মনের ভাব বিনিময় করি তাকে কথ্যভাষা বলে।

লেখ্যভাষা ঃ

যে ভাষায় আমরা আমাদের মনের ভাবকে সুচারুরূপে লিখে রাখি, তাকে লেখ্যভাষা বলে।

লেখ্যভাষার আবার দুটি রূপ ঃ ১. সাধুভাষা ও ২. চলিতভাষা।

সাধুভাষা ঃ

সংস্কৃত শব্দবহুল, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের পূর্ণরূপ সম্বলিত গুরুগম্ভীর ভাষাকে সাধুভাষা বলে। যেমন—

- ▲ পক্ষিগণ কূজন করিতেছে।
- ▲ মৃদু মন্দ সমীরণ বহিতেছে।
- ▲ তাহারা অদ্য কলকাতায় যাইবে।
- ▲ রৌদ্র উঠিয়াছে বলিয়া কুয়াশা দূর হইয়াছে।

চলিতভাষা ঃ

প্রাত্যহিক জীবনে ব্যবহৃত পরিচিত শব্দবহুল, সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্তরূপ সম্বলিত সহজ বোধগম্য ভাষাকে চলিতভাষা বলে। যেমন— ▲ বাতাস বইছে। ▲ পাখিরা গান করছে। ▲ তারা আজ আসবে। ▲ তোমরা নিশ্চয় কলকাতা দেখেছ।

কে অন্যপ্রান্তে স্থাপন
র্ব। ভাষার মাধ্যমেই
ও ভিত্তি এই ভাষা।
লে মানুষের কোনো
পারেনি। ভাষা নেই
ক পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ
রাখে জীবনের কথা,

▲ তোমরা নিশ্চয়

সাধুভাষা থেকে চলিতভাষা রূপান্তরের নিয়ম ঃ

১) ক্রিয়াপদের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহার করতে হবে।
যেমন— করিতেছে > করছে , আসিবে > আসবে , লিখিয়াছিল > লিখেছিল।

২) সর্বনামপদের সংক্ষিপ্তরূপ ব্যবহার করতে হবে।
যেমন— তাহারা > তারা , ইহারা > এরা , তাহাকে > তাকে , ইহাদিগকে > এদেরকে , ইহাতে > এতে।

৩) তদ্ভব, দেশি এবং আঞ্চলিক শব্দের ব্যবহার বেশি করতে হবে।

➡ **নীচে সাধু ও চলিতভাষায় ব্যবহৃত সর্বনাম, ক্রিয়াপদ এবং বিশেষ্য পদের রূপ দেখানো হল ঃ**

সর্বনাম পদ

সাধুভাষা	চলিতভাষা	সাধুভাষা	চলিতভাষা	সাধুভাষা	চলিতভাষা
তাহার	তার	আমাদিগকে	আমাদেরকে	ইহাদের	এদের
তাহাকে	তাকে	তাহাদিগকে	তাহাদেরকে	ইহাকে	একে
তাঁহার	তাঁর	যাহারা	যাদের	তাহাতে	তাতে
ইহার	এর	কেহ	কেউ	কেহ কেহ	কেউ কেউ
তাহারা	তারা	কাহার	কার	যাহা	যা
উহারা	ওরা	ইহারা	এরা	তাহা	তা

ক্রিয়াপদ

সাধুভাষা	চলিতভাষা	সাধুভাষা	চলিতভাষা	সাধুভাষা	চলিতভাষা
করিতেছি	করছি	খেলিতেছে	খেলছে	দেখিয়া	দেখে
করিতেছিলাম	করছিলাম	নাই	নেই	বলিলেন	বললেন
করিব	করব	পাইয়াছি	পেয়েছি	ভাসিতেছে	ভাসছে
খেলিতেছিল	খেলছিল	শুনিয়াছি	শুনেছি	উঠিবে	উঠবে
রহিল	রইল	গাহিব	গাইব	খেলিতে থাকিব	খেলতে থাকব
শুনিয়া	শুনে	আসিলাম	এলাম	করিয়া	করে

বিশেষ্য পদ

সাধুভাষা	চলিতভাষা	সাধুভাষা	চলিতভাষা	সাধুভাষা	চলিতভাষা
বাটী	বাড়ি	পূজা	পুজো	বৃক্ষ	গাছ
গৃহ	ঘর	ধূলা	ধুলো	মক্ষিকা	মাছি
হস্ত	হাত	মূলা	মুলো	রূপা	রুপো
মস্তক	মাথা	ব্যাঘ্র	বাঘ	স্বর্ণ	সোনা
হস্তী	হাতি	একাদশ	এগারো	সন্তরণ	সাঁতার
পক্ষী	পাখি	দ্বাদশ	বারো	প্রভাত	সকাল

➡ **সাধুভাষা থেকে চলিতভাষায় রূপান্তর ঃ**

সাধুভাষা ঃ শুনিয়া তাহার ক্রোধের সীমা রহিল না।
চলিতভাষা ঃ শুনে তার রাগের সীমা থাকল না।
সাধুভাষা ঃ ইন্দ্র হাল ধরিয়া বসিয়া আছে।
চলিতভাষা ঃ ইন্দ্র হাল ধরে বসে আছে।
সাধুভাষা ঃ তাহাদের দুঃখের আর সীমা নাই।
চলিতভাষা ঃ তাদের দুঃখের আর সীমা নেই।
সাধুভাষা ঃ আজ সকালে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে।
চলিতভাষা ঃ আজ সকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।
সাধুভাষা ঃ হস্তী দল বাঁধিয়া অরণ্যে বাস করে।
চলিতভাষা ঃ হাতি দল বেঁধে বনে বাস করে।

➡ **চলিতভাষা থেকে সাধুভাষায় রূপান্তর ঃ**

চলিতভাষা ঃ তার মা এখানে নেই।
সাধুভাষা ঃ তাহার জননী এই স্থানে নাই।
চলিতভাষা ঃ আজ আর সময় নেই।
সাধুভাষা ঃ অদ্য সময় অতীত হইয়াছে।
চলিতভাষা ঃ তারা এতক্ষণে পৌঁছে থাকবে।
সাধুভাষা ঃ তাহারা এতক্ষণে পৌঁছাইয়া থাকিবে।
চলিতভাষা ঃ খবর পেয়ে মাসিমা ছুটে গেলেন।
সাধুভাষা ঃ খবর পাইয়া মাসিমা ছুটিয়া গেলেন।
চলিতভাষা ঃ বেলা প্রায় দুপুর হল।
সাধুভাষা ঃ বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইল।

ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ব্যাকরণ ঃ কোনো ভাষাকে শুদ্ধভাবে লিখতে ও বলতে গেলে যে বইয়ের সাহায্য নিতে হয়, তাকে **ব্যাকরণ** বলে।

পৃথিবীতে নানা দেশের নানা ভাষা। **যেমন**— পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু, ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিন্দি, গ্রেট বৃটেনের রাষ্ট্রভাষা ইংরেজি, গ্রিসের রাষ্ট্রভাষা গ্রিক। এরকম প্রত্যেক দেশে রাষ্ট্রভাষা ছাড়াও আরও অনেক প্রাদেশিক ও আঞ্চলিক ভাষা আছে। আমাদের দেশ ভারতেও অজস্র ভাষা প্রচলিত। এদের মধ্যে ১৮টি সরকার স্বীকৃত ভাষা। এগুলি হল হিন্দি, পাঞ্জাবি, গুজরাটি, মালায়ালাম, তেলেগু, সাঁওতালি, বাংলা, ওড়িয়া, অসমিয়া, তামিল ইত্যাদি। এই সব ভাষার প্রত্যেকের একটা ব্যাকরণ আছে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। তাই আমাদের ব্যাকরণের নাম '**বাংলা ব্যাকরণ**'। ব্যাকরণ না জানলে ভাষাকে শুদ্ধভাবে লিখতে, পড়তে ও বলতে পারা যায় না। সেই কারণেই ব্যাকরণ পাঠ আবশ্যক।

মাতৃভাষার ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা

শিশু মায়ের কোলে বসে যে ভাষা শিখতে শিখতে বড়ো হয়, তাকে **মাতৃভাষা** বলে। ব্যাকরণ না শিখলেও মাতৃভাষা বলা যায়, বোঝা যায়। অনেক নিরক্ষর মানুষ তাদের মাতৃভাষা সহজেই বলতে ও বুঝতে পারে। তার জন্য তাদের ব্যাকরণ পড়তে হয় নি। কিন্তু ভাষাকে শুদ্ধভাবে বা নির্ভুলভাবে লিখতে গেলে মাতৃভাষার ব্যাকরণ পড়তেই হবে। তা না হলে ভাষার উৎকর্ষ নষ্ট হবে। আমাদের মাতৃভাষায় ব্যাকরণ লিখে যাঁরা স্মরণীয় হয়ে আছেন তাঁরা হলেন— রাজা রামমোহন রায়, আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সুকুমার সেন প্রমুখ। তবে মজার কথা এই যে, বাংলা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ লিখেছিলেন মনোএল দ্য-আসুম্প্সাম নামে এক পর্তুগিজ পাত্রী ।

মনে রাখবে ঃ

■ মানুষের বাগ্‌যন্ত্র সৃষ্ট অর্থপূর্ণ ধ্বনি সমষ্টিকে **ভাষা** বলে। ■ ভাষার দুটি রূপ — **কথ্যভাষা** ও **লেখ্যভাষা**।
■ লেখ্যভাষার দুটি রূপ — **সাধুভাষা** ও **চলিতভাষা**। ■ ভাষাকে শুদ্ধভাবে লিখতে, পড়তে ও বলতে গেলে যে বইয়ের সাহায্য প্রয়োজন তাকে ব্যাকরণ বলে। ■ মায়ের মুখ থেকে শিশু যে ভাষা শিখতে শিখতে বড়ো হয়, তাকে **মাতৃভাষা** বলে।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

ক) ভাষা কাকে বলে?

খ) ভাষা কয় প্রকার ও কী কী?

গ) লেখ্যভাষা কাকে বলে? লেখ্যভাষা কয় প্রকার ও কী কী?

ঘ) সাধুভাষা কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

ঙ) চলিতভাষা কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

চ) সাধুভাষা ও চলিতভাষার দুটি পার্থক্য লেখো।

ছ) ব্যাকরণ কাকে বলে?

জ) ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?

ঞ) মাতৃভাষার ব্যাকরণ পাঠের প্রয়োজনীয়তা কী?

২। সাধুভাষায় রূপান্তর করো ঃ

ক) ছেলেরা মাঠে খেলছে।

খ) শীতল বাতাস বইছে।

গ) পাখিরা কিচিরমিচির করছে।

ঘ) তারা আজ কলকাতায় যাবে।

ঙ) সুবোধ স্কুলে যাচ্ছে।

৩। চলিতভাষায় রূপান্তর করো ঃ

ক) সূর্য অস্ত যাইতেছে। এখন সন্ধ্যা নামিবে।

খ) বেগে বাতাস বহিতেছে। মনে হয় এখনই বৃষ্টি আসিবে।

গ) ভয়ে তাহার সর্ব শরীর কাঁটা দিয়া উঠল।

ঘ) ইহাতে বিশেষ ক্ষতি হয় না।

ঙ) প্রভাত হইলে প্রফুল্ল পথে বাহির হইল।

৪। নীচের ক্রিয়াপদগুলির চলিত রূপ লেখো ঃ

করিতেছে, লিখিতেছিলাম, গাহিব, আসিবেন, নাচিতে থাকিব, বহিতেছে, শুনিয়া যাও, বলিব, চমকাইতেছে, ভাবিতেছিলাম।

৫। নীচের সর্বনাম পদগুলির চলিত রূপ লেখো ঃ

ইহা, তাঁহারা, আমাদিগকে, তাহাকে, উহা, কেহ, ইহাতে, ইহাদিগকে, তাহা, যাহারা।

৬। নীচের শব্দগুলির চলিত রূপ লেখো ঃ

পক্ষী, বাটী, গৃহ, পর্বত, প্রভাত, হস্তী, হস্ত, একাদশ, ষোড়শ, বিংশ।

৭। শূন্যস্থানে সাধুভাষার ক্রিয়াপদ বসাও ঃ

ক) আমি এখন ——— (লেখা)।

খ) তাহারা আজ ——— (আসা)।

গ) মেয়েটি ভালোই গান ——— (গাওয়া)।

SATISH CHANDRA MEMORIAL SCHOOL
SCMS
CHAKDAHA, NADIA

ঘ) গতকাল কলকাতা ——— (যাওয়া)।

ঙ) প্রচন্ড বেগে বাতাস ——— (বয়ে যাওয়া)।

৮। **নীচের বাক্যগুলো সাধু ও চলিত ভাগ করে ছকে বসাও ঃ**

ক) ঝড় উঠিবে বলিয়া আমরা বাহিরে যাইব না।

খ) সবাই ছুটছে বাড়ির দিকে।

গ) ধীরে বহে নদী।

ঘ) ঘোড়া ছুটছে টগবগিয়ে।

ঙ) এটা দুর্গম অঞ্চল বলে জানি।

চ) মেয়েরা ফুল তুলিতেছে।

ছ) মেঘ ডাকিতেছে।

জ) তারা ফুটবল খেলছে।

সাধুভাষা	চলিতভাষা

৯। **নীচের ক্রিয়াপদগুলি সাধুভাষার বাক্যে ব্যবহার করো ঃ**

করিতেছি, গাহিব, উঠিয়াছিল, শুনিতেছে, যাইবে, আসিবেন, দেখিয়াছে, বলিতেছিল, লইব, দেখিতাম।

১০। **নীচের ক্রিয়াপদগুলি চলিতভাষার বাক্যে ব্যবহার করো ঃ**

শুনেছি, খেয়েছ, গাইল, রইবে, যাব, শুনে নিও, পড়তেছিল, লিখতে থাকব, দেখছি, এসো।

১১। **সঠিক পদটি বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও**

(ক) তাহারা আগামী কাল ——— (আসবে / আসিবে)।

(খ) তাকে অবশ্যই ——— (আসতে বলবে / আসিতে বলিবে)।

(গ) হস্তী শাবকটি জলে ——— (নামল / নামিল)।

(ঘ) শুনিয়া ——— (তার / তাহার) আক্রোশের সীমা ——— (রইল / রাহিল) না।

(ঙ) শ্মশানে শব ——— (পোড়ানো / দাহ) হইতেছে।

১২। **গুরুচণ্ডালী দোষ আছে এমন বাক্যগুলি আলাদা করো ঃ**

(ক) তাকে আসিতে বলবে।

(খ) তাহারা সুর করিয়া গাহিতেছে।

(গ) জলে হাঁসগুলি সাঁতার কাটিতেছে।

(ঘ) সূর্য উঠিলে কুয়াশা দূর হবে।

(ঙ) দেখে শুনে কাজ করিও।

অধ্যায় ২ ধ্বনি ও বর্ণ

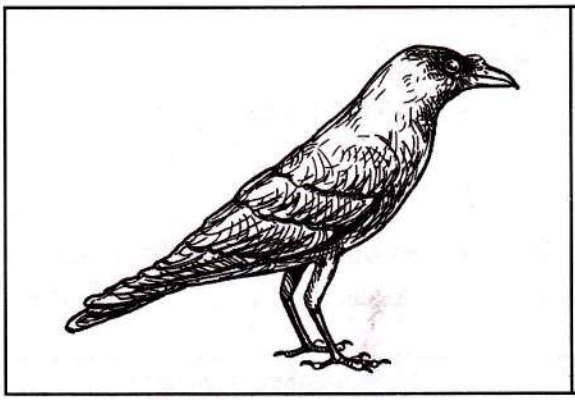

কাকটি 'কা কা' ডাকছে।

ছেলেরা 'ছুটি' বলে আনন্দ করছে।

ধ্বনি

প্রথম ছবিতে কাকের 'কা কা' এক ধরনের আওয়াজ। দ্বিতীয় ছবিতে ছেলেদের 'ছুটি'ও এক ধরনের আওয়াজ। এই দুটি আওয়াজের মধ্যে পার্থক্য আছে। 'কা কা' আওয়াজের তেমন কোনো অর্থ নেই। কিন্তু 'ছুটি' আওয়াজের একটা অর্থ আছে। ব্যাকরণে 'ধ্বনি' কথার অর্থ হল আওয়াজ। কিন্তু যে কোনো আওয়াজকেই ধ্বনি বলা হয় না। শুধু যে আওয়াজের অর্থ আছে তাকেই **ধ্বনি** বলে। মানুষ এই ধ্বনির সাহায্যেই কথা বলে। ধ্বনি কেবল মুখেই উচ্চারিত হয়।

ধ্বনির সংজ্ঞা ঃ বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ যে অর্থপূর্ণ আওয়াজ বা স্বর সৃষ্টি করে, তাকে **ধ্বনি** বলে।

এবার বুঝে নেওয়া যাক 'বাগ্‌যন্ত্র' কী। মুখের যে সব অংশের সাহায্যে আমরা কথা বলি সেগুলিকে বাগ্‌যন্ত্র বলে। এগুলি হল— নাসিকা, দন্ত, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, তালু ও মূর্ধা।

ধরো, 'বলাকা' একটি শব্দ। এই শব্দটি কতগুলি ধ্বনির সাহায্যে গঠিত। যেমন ঃ বলাকা = ব্+অ+ল্+আ+ক্+আ — এখানে মোট ছ'টি ধ্বনি আছে। অতএব, ধ্বনি হল শব্দের সবচেয়ে ছোটো অংশ।

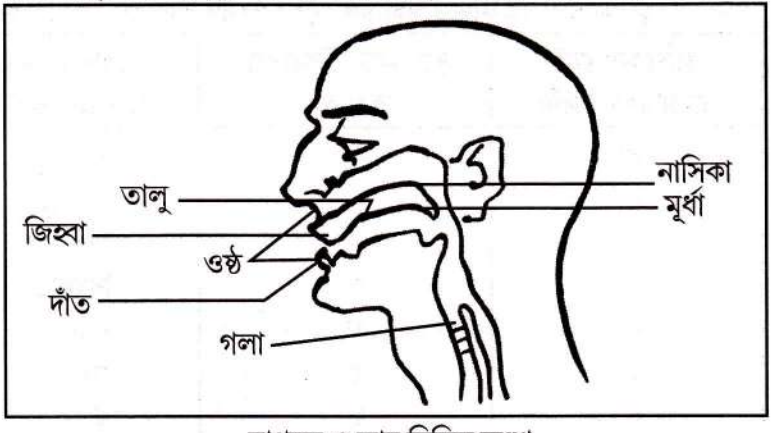

বাগ্‌যন্ত্র ও তার বিভিন্ন অংশ

বাংলা ভাষায় ধ্বনি দু'প্রকার — ১. **স্বরধ্বনি** ও ২. **ব্যঞ্জনধ্বনি**।

স্বরধ্বনি ঃ

যে ধ্বনিকে অন্য ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই উচ্চারণ করা যায়, তাকে **স্বরধ্বনি** বলে।

যেমন — **বাংলা ভাষায় ১১টি স্বরবর্ণ আছে**। সেগুলি হল ঃ অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ।

কিন্তু আমরা মাত্র **৭টি স্বরধ্বনি** বাংলায় উচ্চারণ করে থাকি। এগুলি হল— **অ, আ, ই, উ, এ, ও, অ্যা**। বাকিগুলোকে আমরা অন্য স্বরধ্বনির সাহায্যে উচ্চারণ করে থাকি।

যেমন — ঐ = ও + ই　　ঔ = ও + উ

ঈ = ই- এর মতো উচ্চারণ।　　ঊ = উ- এর মতো উচ্চারণ।

ঋ = 'রি'- এর মতো উচ্চারণ।

ব্যঞ্জনধ্বনি ঃ

যে ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, তাকে **ব্যঞ্জনধ্বনি** বলে। ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত চিহ্ন বা প্রতীককে বলা হয় ব্যঞ্জনবর্ণ। বাংলায় মোট ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও উচ্চারণে মাত্র ২৯টি ব্যঞ্জধ্বনি পাওয়া যায়।

যেমন —

ব্যঞ্জনবর্ণ				
ক	খ	গ	ঘ	ঙ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ
ত	থ	দ	ধ	ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য	র	ল	ব	শ
ষ	স	হ	ড়	ঢ়
য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ

উচ্চারিত ব্যঞ্জনধ্বনি				
ক্	খ্	গ্	ঘ্	ঙ্
চ্	ছ্	জ্	ঝ্	×
ট্	ঠ্	ড্	ঢ্	×
ত্	থ্	দ্	ধ্	ন্
প্	ফ্	ব্	ভ্	ম্
×	র্	ল্	×	শ্
×	স্	হ্	ড়	×
×	×	×	×	×

অন্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির নিজস্ব উচ্চারণ নেই। এদের উচ্চারণ পদ্ধতি হল —

তালিকায় নেই এমন ব্যঞ্জনধ্বনি	যার মতো উচ্চারণ করা হয়	লেখায় যেমন ব্যবহার করা হয়	আমরা যেমন উচ্চারণ করে থাকি
ঞ্	ন্	বাঞ্ছারাম	বান্ছারাম
ণ্	ন্	গণশত্রু	গনশত্রু
য্	জ্	যদি	জদি
ষ্	শ্	বিষদাঁত	বিশদাঁত
য়	অ	নয়ন	নঅন
ৎ	ত্	সৎ	সত্
ং	ঙ্	ব্যাং	ব্যাঙ্
ঢ়	ড়	রাঢ়	রাড়
ঃ	হ্	আঃ	আহ্

বর্ণ

ধ্বনির লিখিত রূপকেই বর্ণ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, ধ্বনিকে লিখিত রূপ দেওয়ার জন্য বিশেষ কতকগুলি সংকেত বা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। এর নামই বর্ণ।

বর্ণের সংজ্ঞা ঃ

লিখে বোঝাবার জন্য ধ্বনির যে চিহ্ন বা সংকেত ব্যবহার করা হয়, তাকে **বর্ণ** বলে। যেমন — অ, আ, ক্, খ্ ইত্যাদি।

➡ **ধ্বনি ও বর্ণের পার্থক্য ঃ**

ধ্বনি	বর্ণ
১. ধ্বনি হল বর্ণের উচ্চারিত রূপ।	১. বর্ণ হল ধ্বনির লিখিত রূপ।
২. ধ্বনি কানে শোনা যায়, দেখা যায় না।	২. বর্ণকে চোখে দেখা যায়।
৩. ধ্বনি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায়।	৩. বর্ণ লেখার পরে তা চিরস্থায়ী রূপ পায়।
৪. ধ্বনির সমষ্টিকে ধ্বনিমালা বলে।	৪. বর্ণের সমষ্টিকে বর্ণমালা বলে।

বাংলায় বর্ণ দু'প্রকার —১. **স্বরবর্ণ** ও ২. **ব্যঞ্জনবর্ণ**।

স্বরবর্ণ ঃ স্বরধ্বনির লিখিত চিহ্ন বা প্রতীককে বলে স্বরবর্ণ।

বাংলায় মোট **১১টি স্বরবর্ণ** আছে — **অ, আ, ই, ঈ, উ, ঊ, ঋ, এ, ঐ, ও, ঔ**।

➡ **স্বরবর্ণের শ্রেণিবিভাগ ঃ**

উচ্চারণের সময়ভেদে ঃ উচ্চারণের সময়ভেদে স্বরবর্ণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় — ১. **হ্রস্বস্বর** এবং ২. **দীর্ঘস্বর**।

হ্রস্বস্বর ঃ অ, ই, উ, ঋ — এই চারটি স্বরবর্ণের উচ্চারণে কম সময় লাগে বলে এদের বলা হয় **হ্রস্বস্বর**।

দীর্ঘস্বর ঃ আ, ঈ, ঊ, এ, ঐ, ও, ঔ — এই সাতটি স্বরবর্ণের উচ্চারণে বেশি সময় লাগে বলে এদের **দীর্ঘস্বর** বলে।

গঠন অনুসারে স্বরবর্ণকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায় — ১. **মৌলিক স্বর** এবং ২. **যৌগিক স্বর**।

মৌলিক স্বর ঃ যে স্বরধ্বনিকে আর ভাঙ্গা যায় না, তাকে **মৌলিক স্বর** বলে। বাংলায় **মৌলিক স্বর ৭টি** — অ, আ, ই, উ, এ, অ্যা, ও।

যৌগিক স্বর ঃ যে স্বরধ্বনি ভাঙলে একাধিক অন্য স্বরধ্বনি পাওয়া যায় তাকে **যৌগিক স্বর** বলে। আসলে এগুলি দুটি স্বরবর্ণের সন্ধির ফলে গঠিত। বাংলায় **দুটি যৌগিক স্বর** আছে — ঐ, ঔ।

ঐ = অ + ই অথবা ও + ই

ঔ = অ + উ অথবা ও + উ

▲ সন্ধির ফলে গঠিত বলে এদের **সন্ধ্যক্ষর** বলা হয়।

➡ নীচের ছকটি লক্ষ করো ঃ

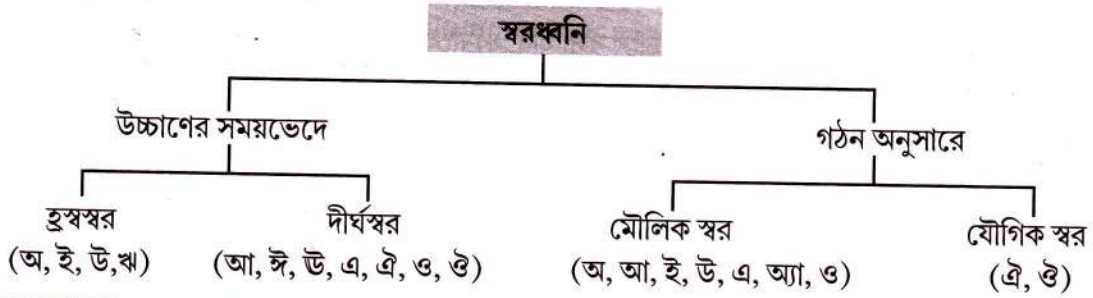

প্লুতস্বর ঃ দূরের কাউকে ডাকার সময়, গান গাওয়ার সময় বা কবিতা পাঠের সময় স্বরধ্বনিকে টেনে টেনে দীর্ঘস্বরে উচ্চারণ করা হয়। এই দীর্ঘস্বরকে **প্লুতস্বর** বলে।

যেমন — মা গো— ও-ও-ও যদু হে— এ-এ-এ জয় হে— এ-এ-এ
বাঁচাও— ও-ও-ও সোমা— আ-আ-আ দেবু— উ-উ-উ

ব্যঞ্জনবর্ণ ঃ

যে ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, তাকে **ব্যঞ্জনধ্বনি** বলে। ব্যঞ্জনধ্বনিগুলির লিখিত চিহ্ন বা সংকেতকেই ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। **যেমন**—ক্, খ্, গ্, চ্, ছ্, জ্ ইত্যাদি।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বাংলা বর্ণমালায় লিখিত ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যা ৪০টি।

ব্যঞ্জনবর্ণের শ্রেণিবিভাগ ঃ

উচ্চারণ স্থান এবং অবস্থানগত বিচারে ব্যঞ্জনবর্ণগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—
১. **স্পর্শবর্ণ**, ২. **উষ্মবর্ণ**, ৩. **অন্তঃস্থবর্ণ**, ৪. **অযোগবাহ বর্ণ**, ৫. **নাসিক্য** বা **অনুনাসিক বর্ণ** প্রভৃতি।

স্পর্শবর্ণ ঃ উচ্চারণের সময় জিভের কোনো না কোনো অংশের সঙ্গে কণ্ঠ, তালু, মূর্ধা, দন্ত, ওষ্ঠ স্পর্শ করে উচ্চারিত হয় বলে এদের **স্পর্শবর্ণ** বলে। উদাহরণ— 'ক' থেকে 'ম' পযন্ত ২৫টি বর্ণকে **স্পর্শবর্ণ** বলে।

উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী এই ২৫টি বর্ণকে ৫টি বর্গে বা ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম বর্ণের নাম দিয়ে প্রতিটি বর্গের নামকরণ করা হয়েছে।

➡ **নীচের ছকটিতে ২৫টি স্পর্শবর্ণের ভাগ ও উচ্চারণস্থান অনুযায়ী বর্ণের বিশেষ নাম দেখানো হল ঃ**

বর্গের নাম	বর্ণ	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম
ক-বর্গ	ক্, খ্, গ্, ঘ্, ঙ্	কণ্ঠ	কণ্ঠ্য বর্ণ
চ-বর্গ	চ্, ছ্, জ্, ঝ্, ঞ্	তালু	তালব্য বর্ণ
ট-বর্গ	ট্, ঠ্, ড্, ঢ্, ণ্	মূর্ধা	মূর্ধণ্য বর্ণ
ত-বর্গ	ত্, থ্, দ্, ধ্, ন্	দন্ত	দন্ত্য বর্ণ
প-বর্গ	প্, ফ্, ব্, ভ্, ম্	ওষ্ঠ	ওষ্ঠ্য বর্ণ

উষ্মবর্ণ ঃ শ্, ষ্,স্, হ্ — এই চারটি বর্ণ উচ্চারণের সময় শ্বাসবায়ুর প্রাধান্য থাকে বলে এদের **উষ্মবর্ণ** বলে। এই বর্ণগুলির উচ্চারণে শ্বাসবায়ুর বিশেষ ভূমিকা আছে। যতক্ষণ শ্বাস থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত এদের টেনে ধরে রাখা যায়। যেমন — ইশ্— শ্-শ্-শ্।

অন্তঃস্থ বর্ণ ঃ অন্তঃস্থ কথাটির অর্থ মধ্যবর্তী। য্, র্, ল্, ব্ — এই চারটি বর্ণ স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যে অবস্থিত বলে এদের **অন্তঃস্থ বর্ণ** বলে।

অযোগবাহ বর্ণ ঃ 'অযোগবাহ' কথার অর্থ যোগহীন। 'ং' এবং 'ঃ' এই দুটি বর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের কোনো যোগ নেই। এরা কখনই শব্দের শুরুতে বসে না। এইজন্য এদের **অযোগবাহ বর্ণ** বলে।

মনে রাখবে ঃ

'ঁ' বর্ণটি অন্য বর্ণের আশ্রয় ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না। তাই একে **আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ** বলে।

■ **নাসিক্য বা অনুনাসিক বর্ণ ঃ** ঙ, ঞ, ণ, ন, ম্ — এই পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণের সময় নাক দিয়ে বাতাস বাইরে আসে বলে এদের **নাসিক্য বা অনুনাসিক বর্ণ** বলে। নাক বন্ধ করলে এদের উচ্চারণ করা যায় না।

■ **অল্পপ্রাণ বর্ণ ঃ** প্রতি বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণগুলির উচ্চাণের সময় কম শ্বাসবায়ু নির্গত হয় বলে এদের **অল্পপ্রাণ বর্ণ** বলে। যেমন — ক্, গ্; চ্, জ্; ট্, ড্; ত্, দ্; প্, ব্।

■ **মহাপ্রাণ বর্ণ ঃ** প্রতি বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণগুলি উচ্চারণের সময় নিশ্বাসবায়ু বেশি নির্গত হয় বলে এদের **মহাপ্রাণ বর্ণ** বলে। যেমন — খ্, ঘ্; ছ্, ঝ্; ঠ্, ঢ্; থ্, ধ্; ফ্, ভ্।

■ **ঘোষ বর্ণ ঃ** 'ঘোষ' কথাটির অর্থ হল গাম্ভীর্য। প্রতি বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চমবর্ণ এবং অন্তঃস্থ বর্ণ ও 'হ' উচ্চারণ গাম্ভীর্যপূর্ণ বলে এদের **ঘোষ বর্ণ** বলে। যেমন — গ্, ঘ্, ঙ্; জ্, ঝ্, ঞ্; ড্, ঢ্, ণ্; দ্, ধ্, ন্; ব্, ভ্, ম্; য্, র্, ল্, ব্; হ্।

■ **অঘোষ বর্ণ ঃ** প্রতি বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ্, ষ্, স্ -এদের উচ্চারণ অনেকটাই মৃদু বা গাম্ভীর্যহীন। তাই এদের **অঘোষ বর্ণ** বলে। যেমন — ক্, খ্; চ্, ছ্; ট্, ঠ্; ত্, থ্; প্, ফ্; এবং শ্, ষ্, স্।

➡ **নীচের ছকের ব্যঞ্জনবর্ণের শ্রেণিবিভাটি লক্ষ করো ঃ**

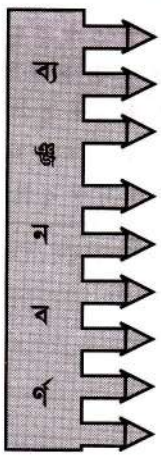

- স্পর্শবর্ণ ('ক' থেকে 'ম' পর্যন্ত ২৫টি বর্ণ)
- উষ্মবর্ণ (শ্,ষ্,স্, হ্)
- অন্তঃস্থবর্ণ (য, র্, ল্,ব্)
- অযোগবাহ বর্ণ (ং, ঃ)
- নাসিক্য বা অনুনাসিক বর্ণ (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম্ ও ঁ)
- অল্পপ্রাণ বর্ণ (বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণ)
- মহাপ্রাণ বর্ণ (বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণ)
- ঘোষ বর্ণ (বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম বর্ণ এবং অন্তঃস্থবর্ণ ও 'হ')
- অঘোষ বর্ণ (বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণ এবং শ্,ষ্,স্)

বানানে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার ঃ

শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণের যোগসাধন একান্ত অপরিহার্য। স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে বানানে বিশেষ নিয়ম প্রযোজ্য। ব্যঞ্জনবর্ণের পাশে অনেক সময় স্বরবর্ণ সরাসরি না বসে তাদের বিশেষ প্রতীক বা চিহ্ন বসে। বাংলায় ১১টি স্বরবর্ণের মধ্যে ১০টির বিশেষ চিহ্ন বানানে ব্যবহৃত হয়। শুধু 'অ'-এর বিশেষ কোনো চিহ্ন নেই।

➡ নীচের ছকে স্বরবর্ণের চিহ্নগুলি দেখানো হল ঃ

স্বরবর্ণ	প্রতীক বা চিহ্ন	ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে লিখিতরূপ
অ	নেই	দল = দ্ + অ + ল্ + অ
আ	া	কা = ক্ + আ
ই	ি	কি = ক্ + ই
ঈ	ী	কী = ক্ + ঈ
উ	ু	কু = ক্ + উ
ঊ	ূ	কূ = ক্ + ঊ
ঋ	ৃ	কৃ = ক্ + ঋ
এ	ে	কে = ক্ + এ
ঐ	ৈ	কৈ = ক্ + ঐ
ও	ো	কো = ক্ + ও
ঔ	ৌ	কৌ = ক্ + ঔ

যুক্ত ব্যঞ্জন ঃ (দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ একসঙ্গে)	দুই বর্ণের বিশেষ যুক্তাক্ষর	তিন বর্ণের যুক্তাক্ষর
ণ ঃ অপরাহ্ণ, কৃষ্ণ, তীক্ষ্ণ, বিষণ্ণ।	ক্ + ষ্ = ক্ষ	ক্ + ষ্ + ম্ = ক্ষ্ম
ন ঃ অগ্নি, স্নান, সায়াহ্ন, চিহ্ন।	ক্ + ত = ক্ত	জ্ + জ্ + ব্ = জ্জ্ব
ম ঃ পদ্ম, ভস্ম, গ্রীষ্ম, শ্মশান।	ক্ + স্ = ক্স	চ্ + ছ্ + ব্ = চ্ছ্ব
ব ঃ অম্বু, ডিম্ব, বিদ্বান, দ্বিপ।	ম + ফ = ম্ফ	ন্ + ত্ + র = ন্ত্র
য ঃ বাক্য, কাব্য, ব্যথা, ব্যাকরণ।	ম + প্ = ম্প	ন্ + ত্ + ব = ন্ত্ব
র ঃ তর্ক, নম্র, সূর্য, শিঘ্র।	ঞ + চ = ঞ্চ	ত্ + ত্ + ব্ = ত্ত্ব
ল ঃ ম্লান, বিপ্লব, গ্লানি, গ্লাস।	জ + ঞ = জ্ঞ	ন্ + দ্ + র্ = ন্দ্র
	ঞ + জ = ঞ্জ	স্ + থ্ + য = স্থ্য
	ঞ + ছ = ঞ্ছ	দ্ + দ্ + ব্ = দ্দ্ব
	চ + ঞ = ঞ্চ	

বর্ণবিশ্লেষণ ঃ কোনো শব্দকে ভেঙে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণকে পৃথক করার নাম **বর্ণ বিশ্লেষণ**। যেমন—

কলকাতা = ক্ + অ + ল্ + অ + ক্ + আ + ত্ + আ
রামায়ণ = র + আ + ম্ + আ + য়্ + অ + ণ্ + (অ)
লক্ষ্মী = ল্ + অ + ক্ + ষ্ + ম্ + ঈ
বিদ্যালয় = ব্ + ই + দ্ + য্ + আ + ল্ + অ + য়্ + (অ)
চন্দন = চ্ + অ + ন্ + দ্ + অ + ন্ + (অ)
ব্যাকরণ = ব্ + য্ + আ + ক্ + অ + র্ + অ + ণ্ + (অ)
রবীন্দ্রনাথ = র্ + অ + ব্ + ঈ + ন্ + দ + র্ + অ + ন্ + আ + থ্ + (অ)
জানকী = জ্ + আ + ন্ + অ + ক্ + ঈ
স্কুল = স্ + ক্ + উ + ল্ + (অ)
কলেজ = ক্ + অ + ল্ + এ + জ্ + (অ)

বি.দ্র. ঃ বন্ধনীর মধ্যে স্বরধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয় না। বাংলাভাষার এটা একটা বৈশিষ্ট্য।

মনে রাখবে ঃ

- বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ যে অর্থপূর্ণ আওয়াজ বা স্বর সৃষ্টি করে, তাকে **ধ্বনি** বলে।
- ধ্বনি দুই প্রকার — **স্বরধ্বনি** ও **ব্যঞ্জনধ্বনি**।
- যে ধ্বনি স্বয়ংসম্পূর্ণ, অন্য কোনো ধ্বনির সাহায্য ছাড়াই উচ্চারিত হতে পারে, তাকে **স্বরধ্বনি** বলে।
- যে ধ্বনি স্বরধ্বনির সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না, তাকে **ব্যঞ্জনধ্বনি** বলে।
- ধ্বনির লিখিত রূপকে **বর্ণ** বলে।
- স্বরধ্বনির লিখিত রূপকে **স্বরবর্ণ** বলে।
- ব্যঞ্জনধ্বনির লিখিত রূপকে **ব্যঞ্জনবর্ণ** বলে।
- বাংলায় ৭টি মৌলিক স্বরধ্বনি আছে।
- বাংলায় ২৯টি ব্যঞ্জনধ্বনি আছে।
- বাংলায় ১১টি স্বরবর্ণ আছে।
- বাংলায় ৪০টি ব্যঞ্জনবর্ণ আছে।
- সমস্ত বর্ণের সমষ্টিকে **বর্ণমালা** বলে।
- ঐ ও ঔ কে **যৌগিক স্বর** বা **সন্ধ্যক্ষর** বলে।
- 'ক' থেকে 'ম্' পর্যন্ত ২৫টি ব্যঞ্জনবর্ণকে **স্পর্শবর্ণ** বলে।
- স্পর্শবর্ণগুলিকে ৫টি বর্গে ভাগ করা হয়েছে — ক-বর্গ, চ-বর্গ, ট-বর্গ, ত-বর্গ, প-বর্গ।
- শ্, ষ্, স্, হ্ — এই চারটি বর্ণ উচ্চারণের সময় মুখের ভেতর দিয়ে গরম বাতাস নির্গত হয় বলে এদের **উষ্মবর্ণ** বলে।
- য্, র, ল্, ব্ — এই চারটি বর্ণ স্পর্শবর্ণ ও উষ্মবর্ণের মধ্যে অবস্থিত বলে এদের **অন্তঃস্থ বর্ণ** বলে।
- ং, ঃ, ঁ, — এই তিনটি বর্ণ অন্য বর্ণের সাহায্য ছাড়া উচ্চারিত হতে পারে না বলে এদের **আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ** বলে।
- ঙ্, ঞ্, ণ্, ন্, ম্ — এই পাঁচটি বর্ণ উচ্চারণ করতে গিয়ে শ্বাসবায়ু মুখের বদলে নাক দিয়ে নির্গত হয় বলে এদের **নাসিক্য বা অনুনাসিক বর্ণ** বলে।
- বর্গের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণগুলি উচ্চারণের সময় কম শ্বাসবায়ু নির্গত হয় বলে এদের **অল্পপ্রাণ বর্ণ** বলে। যেমন — ক্, গ্; চ্, জ্ ইত্যাদি।
- বর্গের দ্বিতীয় ও চতুর্থ বর্ণগুলির উচ্চারণে শ্বাসবায়ু বেশি নির্গত হয় বলে এদের **মহাপ্রাণ বর্ণ** বলে। যেমন — খ্, ঘ্; ছ্, ঝ্ ইত্যাদি।
- বর্গের তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বর্ণের উচ্চারণে একটা গাম্ভীর্য সৃষ্টি হয় বলে এদের **ঘোষ বর্ণ** বলে।
- বর্গের প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের উচ্চারণে গাম্ভীর্য সৃষ্টি হয় না বলে এদের **অঘোষ ধ্বনি** বলে।
- শব্দকে ভেঙে স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণকে আলাদা করার নাম **বর্ণ বিশ্লেষণ**।

অনুশীলনী

১। **নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ**

ক) ধ্বনি কাকে বলে, কয় প্রকার এবং কী কী ?

খ) স্বরধ্বনি কাকে বলে? স্বরধ্বনি কয় প্রকার ও কী কী?

গ) ব্যঞ্জনধ্বনি কাকে বলে? কয় প্রকার ও কী কী?

ঘ) বর্ণ কাকে বলে? বাংলা বর্ণমালা কয় ভাগে বিভক্ত ও কী কী?

ঙ) স্বরবর্ণ কাকে বলে? বাংলায় কয়টি স্বরবর্ণ?

চ) ব্যঞ্জনবর্ণ কাকে বলে? বাংলায় কয়টি ব্যঞ্জনবর্ণ?

ছ) ব্যঞ্জনবর্ণকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?

জ) স্পর্শবর্ণ কাকে বলে? স্পর্শবর্ণগুলিকে কয়টি বর্গে ভাগ করা যায় ও কী কী?

ঝ) উষ্মবর্ণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

ঞ) অন্তঃস্থ বর্ণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

ট) অযোগবাহ বর্ণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

ঠ) নাসিক্য বা অনুনাসিক বর্ণ কাকে বলে?

ড) আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ কাকে বলে?

ঢ) ধ্বনি ও বর্ণের তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করো?

ন) বর্ণবিশ্লেষণ কাকে বলে?

২। **নীচের বর্ণগুলির উচ্চারণ স্থান নির্ণয় করো এবং উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী তাদের নির্দিষ্ট ছকে বসাও ঃ**

প্, ম্, দ্, ক্, ছ্, ঙ্, থ্, গ্, ব্, ভ্, ঠ্, ণ্, ড্, ঘ্, ধ্।

বর্ণ	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম

৩। **সঠিক উত্তরটি বেছে নাও ঃ**

(ক) স্পর্শবর্ণগুলিকে —— ভাগে ভাগ করা হয়। (৪/৫ ভাগ)

(খ) অ, ই, উ, ঋ হল —— (হস্বস্বর/দীর্ঘস্বর)।

(গ) অ, ঈ, ঊ, এ, ও, ঔ হল —— (হস্বস্বর/ দীর্ঘস্বর)।

(ঘ) ট, ঠ, ড, ঢ, ণ বর্ণগুলিকে বলা হয় —— (মূর্ধন্যবর্ণ/ দন্ত্যবর্ণ)।

(ঙ) ং, ঃ কে বলে —— (অযোগবাহ বর্ণ/ নাসিক্য বর্ণ)।

(চ) য্, র্, ল্, ব্ বর্ণগুলিকে বলে —— (উষ্মবর্ণ/ অন্তঃস্থ বর্ণ)।

(ছ) ' ় ' হল —— (আশ্রয়স্থানভাগী বর্ণ/ স্পর্শবর্ণ)।

(জ) ত, থ, দ, ধ, ন বর্ণগুলির উচ্চারণ স্থান —— (দন্ত / তালু)।

SATISH CHANDRA MEMORIAL SCHOOL LIBRARY Acc. No. 5476

(ঝ) ঐ, ঔ-কে বলে ——— (মৌলিক স্বর/ যৌগিক স্বর)।

(ঞ) মা - আ- আ- আ হল ——— (প্লুতস্বর/ দীর্ঘস্বর)।

৪। **নীচের ছকে উপযুক্ত স্থানে বর্ণগুলি বসাও ঃ**

অ, আ, ওগো-ও-ও-ও, ং, ধ্, ষ্, ঐ, এ

বর্ণের পরিচয়	বর্ণ
যৌগিক স্বর মৌলিক স্বরধ্বনি উষ্ম বর্ণ দন্ত্য বর্ণ	

বর্ণের পরিচয়	বর্ণ
অযোগবাহ বর্ণ প্লুতস্বর দীর্ঘস্বর হ্রস্বস্বর	

৫। **নীচের বর্ণতালিকা থেকে অনুনাসিক বর্ণগুলি খুঁজে নিয়ে লেখো ঃ** ক্, ন্, চ্, ণ্, ভ্, ম্, ট্, ঙ্, ঞ্, শ্।

৬। **বর্ণ বিশ্লেষণ করো ঃ**

আকাশ, বিদ্যালয়, ব্যারাকপুর, রামকৃষ্ণ, ধর্মতলা, শিলিগুড়ি, জীবনানন্দ, কোকিল, গঙ্গা, হিমালয়।

৭। **শূন্যস্থানে সঠিক শব্দটি বসাও ঃ**

ক) ব্ + ই + হ্ + আ + র্ + অ = ——— । খ) ম্ + এ + ঘ্ + আ + ল্ + অ + য়্ + অ = ———

গ) ব্ + ই + দ্ + ব্ + আ + ন্ + অ = ——— । ঘ) উ + জ্ + জ্ + ব্ + অ + ল্ + অ = ———

ঙ) ক্ + অ + ল্ + অ + ক্ + আ + ত্ + আ = ———

৮। **শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ**

বর্গ	বর্ণ	উচ্চারণ স্থান	উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী নাম
ক-বর্গ	?	কণ্ঠ	?
?	চ, ছ, জ, ঝ,ঞ	?	?
?	?	?	মূর্ধন্য বর্ণ
?	প্, ফ্, ব্,ভ্,ম্,	?	ওষ্ঠ্য বর্ণ
ত-বর্গ	?	?	?

৯। **নীচের যুক্তাক্ষরগুলির সাহায্যে একটি করে শব্দ তৈরি করো ঃ**

ক্ত, জ্জ্ব, ট্ট, ঞ্জ, ত্ত, হ্ণ, হ্ন, দ্দ্ব, প্ল, দ্ধ।

১০। **শূন্যস্থানে সঠিক শব্দটি বসাও ঃ**

ক) তাকালক = ———— । খ) নন্দাআমা = ———— ।

গ) রাক্ষুমদি = ———— । ঘ) সীণরাবা = ———— ।

ঙ) টজগুরা = ———— । চ) মারাণয় = ———— ।

ছ) জকলে = ———— । জ) নন্দসুবর = ———— ।

ঝ) জাবার= ———— । ঞ) অয়শতি = ———— ।

১১। **নীচের বর্ণগুলি সাজিয়ে তোমার ইচ্ছামতো তিনটি শব্দ তৈরি করো। একই বর্ণকে দু'বার ব্যবহার করা যাবে না।**

আ, দি, স্ত, ক্র, ল্লি, ন্ধ্যা, গ, পী , জ, অ, য়।

১২। **আটটি বর্ণ আছে এমন দুটি শব্দ বিশ্লেষণ করে দেখাও।**

অধ্যায় ৩ শব্দ, পদ ও বাক্য

শব্দ

ছবিতে কতকগুলো বর্ণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এগুলি তোমাকে সাজাতে বলা হল। প্রথমে তুমি সাজালে দে|ং|শ|বা|লা। শিক্ষক মহাশয় দেখে বললেন, 'সাজানো হয়নি'। তুমি এবার অন্যভাবে সাজালে -বা|ং|লা|দে|শ।

এবার শিক্ষক মহাশয় খুশি হয়ে বললেন — 'বেশ, বেশ, ভালো হয়েছে।' তার কারণ তুমি প্রথমবারে যেটা সাজিয়ে ছিলে তার কোনো অর্থ নেই। কিন্তু দ্বিতীয়বারে 'বাংলাদেশ'-এর বিশেষ একটি অর্থ আছে। বর্ণকে পরপর এভাবে সাজিয়ে যদি মনের ভাব বা অর্থ প্রকাশ পায়, তবে তাকে **'শব্দ'** বলে।

শব্দের সংজ্ঞা ঃ

কতকগুলি বর্ণ পরপর বসে যখন একটি অর্থ বা মনের ভাব প্রকাশ করে, তখন তাকে **শব্দ** বলে।

যেমন— কলকাতা, কলম, দিল্লি, কিশলয়, রবীন্দ্রনাথ ইত্যাদি। এগুলির প্রত্যেকের একটি অর্থ আছে। তাই এরা শব্দ।

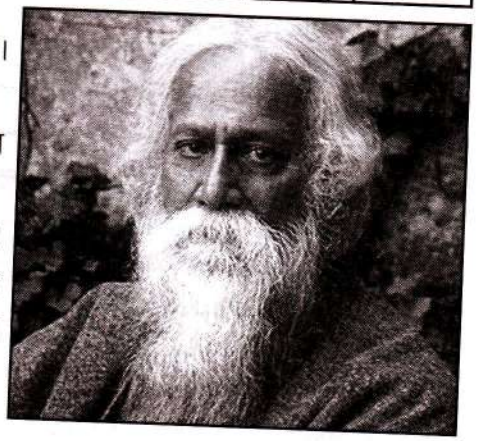

শব্দ দু'ধরনের হয় — এক ধরনের শব্দ দ্বারা ব্যক্তি বা বস্তুর নাম বোঝায়। আর এক ধরনের শব্দ দ্বারা কাজ করাকে বোঝায়।

যে শব্দের দ্বারা কাজ করা বোঝায় তাকে **ক্রিয়াপদ** বলে। ক্রিয়াপদের মূলকে বলে **'ধাতু'**। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তি যোগ করে তবে ক্রিয়াপদ তৈরি হয়। আবার শব্দের সঙ্গেও বিভক্তি যোগ করে **'পদ'** তৈরি হয়।

এখন প্রশ্ন হল, বিভক্তি কী?

শব্দ বা ক্রিয়াপদের সঙ্গে যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হয়ে তাদের বাক্যে ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলে তাকে **বিভক্তি** বলে। যেমন —

শব্দ বিভক্তি — কে, রে, র, দের ইত্যাদি।

ক্রিয়া বিভক্তি — ছি, ছ, ছে, ইল, ইলে, ইত ইত্যাদি।

শব্দের সঙ্গে বিভক্তি যোগের উদাহরণ—রামকে, তোমাদের, কলকাতার। এখানে **'কে'** **'দের'** এবং **'র'** হল বিভক্তি।

ক্রিয়ার সঙ্গে বিভক্তি যোগের উদাহরণ—করিল, খেলিতেছে, খেলিব। এখানে 'ইল', 'ইতেছে' এবং 'ইব' হল বিভক্তি।

পদ

বিভক্তি যুক্ত শব্দকেই পদ বলে। অন্যভাবে বলা যায়, শব্দ যখন বিভক্তি যুক্ত হয়ে বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী হয়, তখন তাকে **পদ** বলে। যেমন — রাম বনে ফুল পাড়ে।

এখানে প্রত্যেকটি শব্দের সঙ্গে একটি করে বিভক্তি আছে। 'রাম'-এর সঙ্গে 'অ' বিভক্তি আছে ধরতে হবে। বাংলায় একে 'শূন্য' বিভক্তি বলে। 'বনে'-এর সঙ্গে 'এ' বিভক্তি আছে। 'ফুল'-এর সঙ্গে 'শূন্য' বিভক্তি এবং 'পাড়ে'-এর সঙ্গে 'এ' বিভক্তি যুক্ত হয়েছে।

বাক্য

কতকগুলি পদ পরপর বসে যখন একটি অর্থ বা মনের ভাব প্রকাশ করে তখন তাকে **বাক্য** বলে।

মনে রাখবে, অর্থ বা মনের ভাব প্রকাশ না পেলে বাক্য হবে না।

যেমন — **বাক্য ঃ** শিশু বাটি থেকে দুধ খায়। **কিন্তু, বাক্য নয় ঃ** বাটি শিশু থেকে দুধ খায়।

আবার, কোনো অবাস্তব ঘটনা প্রকাশ পেলেও বাক্য হবে না। যেমন — 'বাঘের তাড়া খেয়ে হরিণটি আকাশে উড়ে গেল।' এটির বাস্তব অর্থ নেই বলে একে বাক্য বলা যাবে না।

আরও কিছু উদাহরণ লক্ষ করো ঃ

বাক্য ঃ (ক) ঐ যায় ভোলা মালী। (খ) বাঘ আছে আমবনে। (গ) বিদ্যাসাগর খুব দয়ালু ছিলেন। (ঘ) নেতাজি দেশপ্রেমিক ছিলেন। (ঙ) পাড়ার ছেলেরা দঙ্গল বেঁধে যাবে।

বাক্য নয় ঃ (ক) খেলা বল মাঠে ছেলেরা করে। (খ) দূর হবে সূর্য কুয়াশা উঠলে। (গ) হরিণ বাঘ শিকার করে। (ঘ) কাটে মাছ জলে সাঁতার। (ঙ) লাটাই ঘুড়ি হাতে ছেলেটি ওড়ায়।

উদ্দেশ্য এবং বিধেয়

প্রতিটি বাক্যের দুটি অংশ — **উদ্দেশ্য ও বিধেয়**।

বাক্যের মধ্যে যার সম্বন্ধে বা যাকে উদ্দেশ্য করে কিছু বলা হয় তাকে **উদ্দেশ্য** বলে। আর, উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয়, তাকে **বিধেয়** বলে। যেমন — রাজা শিকারে গেলেন।

এখানে 'রাজা' হল উদ্দেশ্য এবং '**শিকারে গেলেন**' হল বিধেয়।

মনে রাখবে ঃ

■ উদ্দেশ্যের মূল অংশ হল কর্তা, আর বিধেয়ের মূল অংশ হল সমাপিকা ক্রিয়া।

প্রত্যেক বাক্যে একটি উদ্দেশ্য এবং একটি বিধেয় থাকে। তবে প্রয়োজনে উদ্দেশ্য ও বিধেয়কে বাড়ানো যায়। যেমন — মহসীন দয়ালু ছিলেন। এই বাক্যে 'মহসীন' উদ্দেশ্য এবং 'দয়ালু ছিলেন' বিধেয়। এর সঙ্গে যদি আরও শব্দ যুক্ত করা হয় তবে বাক্যটি হয় —— **দানবীর** মহসীন **খুব** দয়ালু ছিলেন। এখানে '**দানবীর**' হল উদ্দেশ্যের **সম্প্রসারক** এবং '**খুব**' হল বিধেয়ের **সম্প্রসারক**।

➡ আরও একটি উদাহরণ লক্ষ করো ঃ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয় সম্প্রসারক
বিপ্লবী	নেতাজি	ভারতের	স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেন।
বীর বিপ্লবী	নেতাজি	জন্মভূমি ভারতের	স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেন।
মহান বীর বিপ্লবী	নেতাজি	আপন জন্মভূমি ভারতের	স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেন।

➡ **বাক্যের শ্রেণিবিভাগ ঃ**

গঠন অনুযায়ী বাক্য তিনপ্রকার — ১. **সরল বাক্য**, ২. **জটিল বাক্য** ও ৩. **যৌগিক বাক্য**। যেমন—

সরল বাক্য ঃ ক্ষুদিরাম দেশপ্রেমিক ছিলেন।

জটিল বাক্য ঃ যদি বৃষ্টি হয় তবে ছাতা নিও।

যৌগিক বাক্য ঃ লোকটি দরিদ্র, কিন্তু সৎ।

এখন দেখা যাক, কীভাবে এই বাক্যগুলি গঠিত হয়—

সরল বাক্য ঃ

যে বাক্যে একটি মাত্র উদ্দেশ্য বা কর্তা এবং একটি মাত্র সমাপিকা ক্রিয়া থাকে, তাকে **সরল বাক্য** বলে। যেমন— *'সংসারে আসিয়া এই পরম সুখে বঞ্চিত রহিলাম।'* (বঙ্কিমচন্দ্র); খবরটা শুনে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এবার পঞ্চপাল এসে বড়ো ক্ষতি করেছে।

জটিল বাক্য ঃ

যে বাক্যে একটি প্রধান অংশ (Principle Clause) এবং এক বা একাধিক অপ্রধান অংশ (Subo rdinate Clause) থাকে তাকে **জটিল বাক্য** বলে। বাক্যের প্রধান অংশ এবং অপ্রধান অংশ সাপেক্ষ সর্বনাম (যে-সে, যখন-তখন, যদি-তবে ইত্যাদি) দ্বারা যুক্ত থাকে। যেমন—

যদি সে আসে তবে আমি খাব। যিনি কাল এসেছিলেন তিনি আমার শিক্ষক। যখন সূর্য ওঠে তখন কুয়াশা দূর হয়।

যৌগিক বাক্য ঃ

যে বাক্যে দুই বা ততোধিক সরল বাক্য সমুচ্চয়ী অব্যয় দ্বারা পরস্পর যুক্ত থাকে তাকে **যৌগিক বাক্য** বলে। যেমন— আমি বাড়ি যাব এবং পড়তে বসব। কথাটা ভালো করে শোনো, তারপর উত্তর দাও। সে দরিদ্র, কিন্তু সৎ।

অর্থ অনুসারে বাক্যকে আবার পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন — ১. **নির্দেশক**, ২. **প্রশ্নবোধক**, ৩. **অনুজ্ঞাসূচক**, ৪. **বিস্ময়বোধক** ও ৫. **ইচ্ছাসূচক**।

১. নির্দেশক বাক্য ঃ

যে বাক্যে বিষয়ের বিবৃতি থাকে, তাকে **নির্দেশক বাক্য** বলে। যেমন—আজ খুব শীত। রাম বল খেলছে। তারা ছবি আঁকছে।

নির্দেশক বাক্যকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়— ১. **ইতিবাচক** ও ২. **নেতিবাচক**।

ইতিবাচক বাক্য ঃ যে বাক্যের দ্বারা 'আছে' বা 'হ্যাঁ', অর্থ বোঝায়, তাকে **ইতিবাচক বাক্য** বলে। যেমন — বনে থাকে বাঘ। আমি আজ দিল্লি যাব। তুমি নিশ্চয় শুনেছ। সে নির্ভীক। তিনি জ্ঞানী।

নেতিবাচক বাক্য ঃ যে বাক্যের দ্বারা 'নেই' বা 'না' বোঝায়, তাকে **নেতিবাচক বাক্য** বলে। যেমন — তার ভয় নেই। আমরা যাব না। আজ তেমন শীত নেই। এখনও তার খাওয়া হল না। বেশি খাওয়া ভালো নয়।

২. প্রশ্নবোধক বাক্য ঃ

যে বাক্যে কোনো কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় বা জানতে চাওয়া হয়, তাকে **প্রশ্নবোধক বাক্য** বলে। যেমন —সে কি আসবে? তুমি কি খেয়েছ? কে একাজ করবে?

৩. অনুজ্ঞাসূচক বাক্য ঃ

যে বাক্যের দ্বারা আদেশ, নির্দেশ, অনুরোধ এবং উপদেশ প্রভৃতি মনোভাবকে বোঝায়, তাকে **অনুজ্ঞাসূচক বাক্য** বলে। যেমন — সদা সত্য কথা বলবে। মন দিয়ে পড়াশুনা করো। সময় নষ্ট করো না। ঘরের ভিতরে এসো। বাজারে যাও।

৪. বিস্ময়সূচক বাক্য ঃ

যে বাক্যের দ্বারা বিস্ময়, আবেগ ইত্যাদি বোঝায়, তাকে **বিস্ময়সূচক** বাক্য বলে। যেমন — কী মজা! আজ কী শীত! সে কী যুদ্ধ! কী বিপদেই না পড়েছি!

৫. ইচ্ছাসূচক বাক্য ঃ

যে বাক্য দ্বারা বক্তার মনের বাসনা, প্রার্থনা বা মঙ্গল কামনা বোঝায়, তাকে **ইচ্ছাসূচক বাক্য** বলে। যেমন — ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। তুমি দীর্ঘজীবী হও। তোমার যাত্রা শুভ হোক।

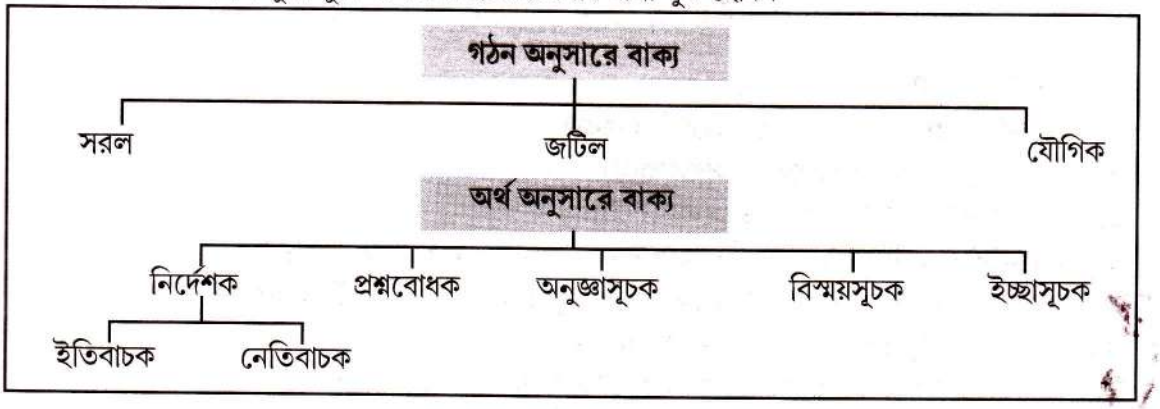

অর্থ ঠিক রেখে বাক্যপরিবর্তনের উদাহরণ ঃ

সরলবাক্য থেকে জটিলবাক্যে রূপান্তর

১. সন্ধ্যায় পাখিরা বাসায় ফেরে। (সরল বাক্য)
উঃ যখন সন্ধ্যা হয় তখন পাখিরা বাসায় ফেরে। (জটিল বাক্য)
২. শুনে তিনি রেগে গেলেন। (সরল বাক্য)
উঃ যখন তিনি শুনলেন তখন তিনি রেগে গেলেন। (জটিল বাক্য)

৩. বাপের মতোই ছেলে। (সরল বাক্য)
উঃ যেমন বাবা তেমনি ছেলে। (জটিল বাক্য)
৪. গতকালের আগন্তুক আমার বাবার বন্ধু। (সরল বাক্য)
উঃ গতকাল যিনি এসেছিলেন তিনি আমার বন্ধু। (জটিল বাক্য)
৫. সে দরিদ্র হলেও সৎ। (সরল বাক্য)
উঃ যদিও সে দরিদ্র তবুও সে সৎ। (জটিল বাক্য)

জটিলবাক্য থেকে সরলবাক্যে রূপান্তর

১. যদি সে আসে তবে আমি যাব। (জটিল বাক্য)
উঃ সে এলে আমি যাব। (সরল বাক্য)
২. যখন বর্ষা আসবে তখন এই গাছে ফুল ফুটবে। (জটিল বাক্য)
উঃ বর্ষা এলে এই গাছে ফুল ফুটবে। (সরল বাক্য)
৩. এই সেই বাড়ি, যেটা জ্যাক তৈরি করেছিল। (জটিল বাক্য)
উঃ জ্যাক এই বাড়িটি তৈরি করেছিল। (সরল বাক্য)
৪. যদি মন দিয়ে পড়াশুনা করো, তবে পাশ করবে। (জটিল বাক্য)
উঃ মন দিয়ে পড়াশুনা করলে পাশ করবে। (সরল বাক্য)
৫. যেহেতু বৃষ্টি হচ্ছে সেহেতু আমি ছাতা নিলাম। (জটিল বাক্য)
উঃ বৃষ্টি হচ্ছে বলে আমি ছাতা নিলাম। (সরল বাক্য)

সরলবাক্য থেকে যৌগিকবাক্যে রূপান্তর

১. সূর্য উঠলে কুয়াশা দূর হবে। (সরল বাক্য)
উঃ সূর্য উঠবে এবং কুয়াশা দূর হবে। (যৌগিক বাক্য)
২. খবরটা শুনে তিনি ছুটে এলেন। (সরল বাক্য)
উঃ তিনি খবরটা শুনলেন এবং ছুটে এলেন। (যৌগিক বাক্য)
৩. মন দিয়ে পড়াশুনা না করলে পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না। (সরল বাক্য)
উঃ মন দিয়ে পড়াশুনা করো, নচেৎ পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে না। (যৌগিক বাক্য)
৪. ভয় পেয়ে নীলু চিৎকার করে উঠল। (সরল বাক্য)
উঃ নীলু ভয় পেল, তাই চিৎকার করে উঠল। (যৌগিক বাক্য)
৫. দরিদ্র হওয়া সত্বেও সে সৎ। (সরল বাক্য)
উঃ সে দরিদ্র কিন্তু সৎ। (যৌগিক বাক্য)

যৌগিকবাক্য থেকে সরলবাক্যে রূপান্তর

১. সংসারে অভাব, তাই সে সারাদিন পরিশ্রম করে। (যৌগিক বাক্য)
উঃ সংসারে অভাব বলে সে দিনরাত পরিশ্রম করে। (সরল বাক্য)
২. দ্রুত হাঁটো, নচেৎ ট্রেন পাবে না। (যৌগিক বাক্য)
উঃ দ্রুত না হাঁটলে ট্রেন পাবে না। (সরল বাক্য)

৩. সে মুখে একবার বলল, কিন্তু যেতে রাজি হল না। (যৌগিক বাক্য)
উঃ সে মুখে একবার বললেও যেতে রাজি হল না। (সরল বাক্য)
৪. সবাই হাততালি দিচ্ছে, কিন্তু কিছু না বুঝে। (যৌগিক বাক্য)
উঃ কিছু না বুঝে সবাই হাত তালি দিচ্ছে। (সরল বাক্য)
৫. সে অসুস্থ, তাই স্কুলে গেল না। (যৌগিক বাক্য)
উঃ অসুস্থ বলে সে স্কুলে গেল না। (সরল বাক্য)

জটিলবাক্য থেকে যৌগিকবাক্যে রূপান্তর

১. যত মত তত পথ। (জটিল বাক্য)
উঃ মত অনেক, তাই পথও অনেক। (যৌগিক বাক্য)
২. যদি ঝড় ওঠে, তবে থেকে যেও। (জটিল বাক্য)
উঃ ঝড় উঠবে এবং থেকে যেও। (যৌগিক বাক্য)
৩. যেমন রোদ উঠল, তেমন চারিদিক উজ্জ্বল হল। (জটিল বাক্য)
উঃ রোদ উঠল এবং চারিদিক উজ্জ্বল হল। (যৌগিক বাক্য)
৪. যেহেতু আজ রবিবার, সেহেতু স্কুল ছুটি। (জটিল বাক্য)
উঃ আজ রবিবার, তাই স্কুল ছুটি। (যৌগিক বাক্য)
৫. যদিও সে দরিদ্র তবু সে সৎ। (জটিল বাক্য)
উঃ সে দরিদ্র, কিন্তু সৎ। (যৌগিক বাক্য)

যৌগিকবাক্য থেকে জটিলবাক্যে রূপান্তর

১. জঙ্গল খুব ঘন, তাই এত অন্ধকার। (যৌগিক বাক্য)
উঃ যেহেতু জঙ্গল খুব ঘন, সেহেতু খুব অন্ধকার। (জটিল বাক্য)
২. সামনে নদী, সুতরাং নৌকায় উঠতেই হবে। (যৌগিক বাক্য)
উঃ যেহেতু সামনে নদী, সেহেতু নৌকায় উঠতেই হবে। (জটিল বাক্য)
৩. বৃষ্টি হচ্ছিল; কিন্তু সে ছাতা নিল না। (যৌগিক বাক্য)
উঃ যদিও বৃষ্টি হচ্ছিল, তবুও সে ছাতা নিল না। (জটিল বাক্য)
৪. দেবে এবং নিও। (যৌগিক বাক্য)
উঃ যদি দেয় তবে নিও। (জটিল বাক্য)
৫. তাড়াতাড়ি হাঁটো, নচেৎ পৌঁছাতে পারবে না। (যৌগিক বাক্য)
উঃ যদি তাড়াতাড়ি না হাঁটো, তবে পৌঁছাতে পারবে না। (জটিল বাক্য)

অর্থ অনুসারে বাক্যের রূপান্তর

১. ইতিবাচক ঃ সে ভালো ছেলে।
নেতিবাচক ঃ সে মন্দ ছেলে নয়।

২. নির্দেশক ঃ খুব সুন্দর দৃশ্য।
বিস্ময়সূচক ঃ কী সুন্দর দৃশ্য!

৩. নির্দেশক ঃ কেউ তাকে বিশ্বাস করে না।
প্রশ্নবোধক ঃ কে তাকে বিশ্বাস করে?

৪. বিস্ময়সূচক ঃ কী মজা!
নির্দেশক ঃ খুব মজা।

৫. প্রশ্নবোধক ঃ সে কি একথা জানে না ?
নির্দেশক ঃ সে নিশ্চয় একথা জানে।

৬. নেতিবাচক ঃ এই রাস্তা মসৃণ নয়।
ইতিবাচক ঃ এই রাস্তা এবড়োখেবড়ো।

৭. অনুজ্ঞাসূচক ঃ তবে এসো।
নির্দেশক ঃ তবে আসতে বলছি।

৮. নির্দেশক ঃ আজ তোমাকে যেতে নিষেধ করছি।
অনুজ্ঞা ঃ আজ তুমি যেও না।

৯. প্রার্থনাসূচক ঃ ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।
নির্দেশক ঃ ভগবানের কাছে তোমার মঙ্গল কামনা করি।

১০. নির্দেশক ঃ নিঃসন্দেহে তিনি ভালো মানুষ।
নেতিবাচক ঃ তিনি ভালো মানুষ — এতে কোনো সন্দেহ নেই।

মনে রাখবে ঃ

- কতকগুলি বর্ণ পরপর বসে যখন একটি অর্থ বা মনের ভাব প্রকাশ করে তখন তাকে **শব্দ** বলে।
- শব্দ বা ধাতুর সঙ্গে যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হয়ে তাদের বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে; তাকে **বিভক্তি** বলে।
- বিভক্তি যুক্ত শব্দকে **পদ** বলে।
- কতকগুলি শব্দ বা পদ পরপর বসে যখন একটি অর্থ বা মনের ভাব প্রকাশ করে তখন তাকে **বাক্য** বলে।
- গঠন অনুসারে বাক্য তিন প্রকার—১. **সরল**, ২. **জটিল** ও ৩. **যৌগিক**।
- অর্থ অনুসারে বাক্য পাঁচ প্রকার—১. **নির্দেশক**, ২. **প্রশ্নবোধক**, ৩. **অনুজ্ঞাসূচক**, ৪. **বিস্ময়সূচক** এবং ৫. **প্রার্থনা** বা **ইচ্ছাসূচক**।
- নির্দেশক বাক্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়— ১. **ইতিবাচক** ও ২. **নেতিবাচক**।

অনুশীলনী

১। **নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ**

(ক) শব্দ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(খ) বিভক্তি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(গ) পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(ঘ) বাক্য কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(ঙ) গঠন অনুসারে বাক্য কয় প্রকার ও কী কী?
(চ) অর্থ অনুসারে বাক্য কয় প্রকার ও কী কী?
(ছ) বিস্ময়সূচক বাক্য কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(জ) নেতিবাচক বাক্য কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(ঝ) ইতিবাচক বাক্য কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(ঞ) প্রশ্নবোধক বাক্য কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। **নীচের বর্ণগুলো সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো ঃ**

তাজিনে, তাকলকা, নবতাল, কাআশ, নসাঅলসো, টগুরাজ, রশ্মীকা, রাংজিই, লাংবাশদে, রগসা।

৩। নীচের পদগুলো সাজিয়ে বাক্য তৈরি করো ঃ

(ক) নদী ভেসে জল পূর্ণ গেল গ্রাম হয়ে। (খ) কলকাতা আসবে থেকে বড়ো মামা আজ।

(গ) হাল ইন্দ্র ধরে বসে আছে। (ঘ) শেষে পাখিরা দিনের ফিরছে বাসায়।

(ঙ) মেলে তরী খানা মাঝে বাইতে মঝে মেলে তুফান।

৪। যেটি বাক্য তার পাশে (✓) চিহ্ন এবং যেটি বাক্য নয় তার পাশে (✗) চিহ্ন দাও ঃ

(ক) লোকটি গ্রোগ্রাসে আগুন গিলছে। (খ) আকাশে আজ মেঘ নেই।

(গ) গাড়ি ছেলেটি চালায়। (ঘ) মেয়েটি নাচছে ভালো।

(ঙ) ধান চাষিকে মাথায় নিয়ে যেতে বাড়ি দেখলাম। (চ) ঘুড়ি ছেলেটি উড়াচ্ছে আকাশে।

(ছ) বসন্তে গাছে গাছে ফুল ফোটে।

৫। উদ্দেশ্য ও বিধেয় আলাদা করে দেখাও ঃ

ক) ছেলেরা মাঠে ক্রিকেট খেলছে।

খ) রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি রচনা করেন।

গ) বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আমাদের দেশের গর্ব।

ঘ) আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বড়ো বিজ্ঞানী ছিলেন।

ঙ) সম্রাট অশোক কলিঙ্গ জয় করেন।

৬। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের একটি করে সম্প্রসারক বসাও ঃ

উদ্দেশ্য	বিধেয়	সম্প্রসারক
(ক) ছেলেরা	গান গাইছে।	
(খ) গোরুটি	ঘাস খাচ্ছে।	
(গ) ক্ষুদিরাম	স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন।	
(ঘ) রবীন্দ্রনাথ	জাপান গিয়েছিলেন।	
(ঙ) গান্ধিজি	সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন।	

৭। নীচের ছকটি পূর্ণ করো ঃ

উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক	উদ্দেশ্য	বিধেয়ের সম্প্রসারক	বিধেয়
?	কালিদাস	?	মেঘদূত রচনা করেন।
?	ঝড়ে	?	বাড়ি ভেঙে গেল।
পন্ডিত	?	কলকাতায়	?
	মেয়েটি	?	গান গাইছে।
সম্রাট	?	উড়িষ্যার	কলিঙ্গ জয় করেন।

৮। বাক্য গঠন করো ঃ

(ক) প্রশ্নবোধক ঃ _____

(খ) অনুজ্ঞাসূচক ঃ _____

(গ) বিস্ময়বোধক ঃ _____

(ঘ) নেতিবাচক বাক্য ঃ _____

(ঙ) নির্দেশক ঃ _____

(চ) প্রার্থণাসূচক ঃ _____

৯। নির্দেশ অনুসারে বাক্যের পরিবর্তন করো ঃ

(ক) আজ খুব শীত, (বিস্ময়সূচক বাক্যে)

(খ) রোদ উঠেছে, কিন্তু বৃষ্টি হচ্ছে। (জটিল বাক্যে)

(গ) এই নদীতে বর্ষার প্রচুর মাছ ওঠে। (যৌগিক বাক্যে)

(ঘ) যখন সূর্য ডোবে তখন রাখাল বালকেরা ঘরে ফেরে। (সরল বাক্যে)

(ঙ) সে তো ভালো ছেলে। (নেতিবাচক বাক্যে)

(চ) গরিব হলেও লোকটি সৎ। (যৌগিক বাক্যে)

(ছ) কী সুন্দর আজকের আকাশ! (নির্দেশক)

(জ) আজ তোমার যাওয়া উচিত হবে না। (অনুজ্ঞাসূচক)

(ঝ) সংসারে এসে সে সুখ পেল না। (জটিলবাক্যে)

(ঞ) যেতে পারি কিন্তু কেন যাব। (সরলবাক্যে)

১০। সঠিক উত্তরের মাথায় (✓) চিহ্ন দাও ঃ

(ক) দিনটা ভালো নয়। (ইতিবাচক / নেতিবাচক বাক্য)

(খ) যদি সে আসে তবে আমি যাব। (সরল বাক্য / জটিল বাক্য)

(গ) বিদ্যাসাগর পন্ডিত কিন্তু বিনয়ী ছিলেন। (জটিল বাক্য / যৌগিক বাক্য)

(ঘ) এসো, সবাই এসো। (বিস্ময়সূচক / অনুজ্ঞাসূচক বাক্য)

(ঙ) জগতে কেনা সুখী হতে চায়? (নির্দেশক / প্রশ্নবোধক)

(চ) তুমি সুখী হও। (অনুজ্ঞাসূচক / প্রার্থনাসূচক)

(ছ) এই শহর প্রাচীন, তাই বাড়িগুলো পুরনো ইঁটের তৈরি। (জটিল বাক্য / যৌগিক বাক্য)

(জ) দিনটা বড়ো বিশ্রী। (ইতিবাচক / নেতিবাচক বাক্য)

(ঝ) রামবনে ফুল পাড়ে। (সরল বাক্য / যৌগিক বাক্য)

(ঞ) যেহেতু বর্ষার প্রকোপ বেশি, সেহেতু বন্যার আশঙ্কা রয়েছে। (জটিল বাক্য / যৌগিক বাক্য)

অধ্যায় ৪ পদের শ্রেণিবিভাগ

তোমরা পূর্বেই জেনেছ, পদ দু'প্রকার — **নামপদ** ও **ক্রিয়াপদ**।
নামপদকে আবার চারভাগে ভাগ করা যায় — **বিশেষ্যপদ, সর্বনামপদ, বিশেষণপদ** ও **অব্যয়পদ**।
সব মিলিয়ে পদ পাঁচ প্রকার — **বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, অব্যয়** ও **ক্রিয়াপদ**।
পদের এই শ্রেণি বিভাগটি একটি উদাহরণের সাহায্যে স্পষ্ঠ করে দেখানো হল ঃ
কমল এবং আমি নীল আকাশ দেখছিলাম —
উপরের বাক্যটিতে দেখবে ছয়টি পদ আছে ঃ কমল, এবং, আমি, নীল, আকাশ, দেকছিলাম।
এখানে '**কমল**' এবং '**আকাশ**' পদ দুটি যথাক্রমে একজন ব্যক্তির নাম এবং একটি বস্তুর নাম বোঝানো হয়েছে। এই ধরনের পদ হল **বিশেষ্য পদ**। আবার '**আমি**' পদটি একজন ব্যক্তির নামের বা বিশেষ্য পদের পরিবর্তে বসেছে। সুতরাং '**আমি**' পদটি হল **সর্বনাম পদ**।
উপরের বাক্যে আকাশের রঙ কেমন — এই কথা বলাতে **নীল** বোঝানো হয়েছে। নীল আকাশের বৈশিষ্ট্যকে বোঝানো হয়েছে। সুতরাং এই পদটি হল **বিশেষন পদ**। আবার '**এবং**' পদটি কমল এবং আমিকে যুক্ত করেছে। তাই এটি হল **অব্যয় পদ**। এবং '**দেখছিলাম**' পদটি দিয়ে '**দেখা**' করার কথা বোঝানো হয়েছে। সুতরাং এটি হল **ক্রিয়াপদ**। নিচে বিশেষ্যপদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হল ঃ

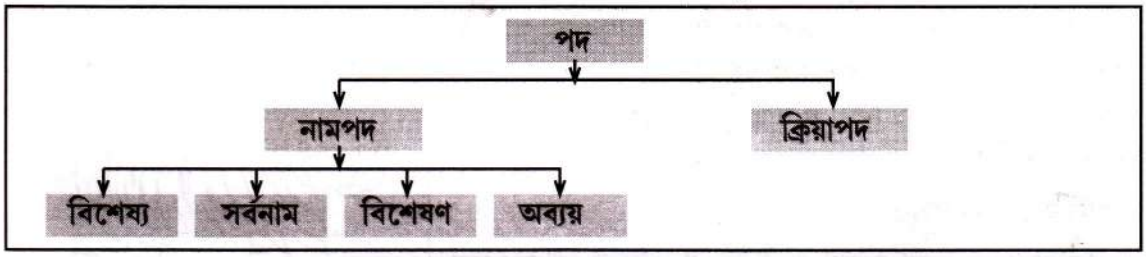

বিশেষ্য পদ

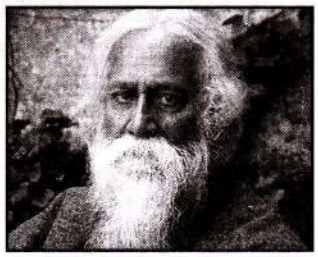

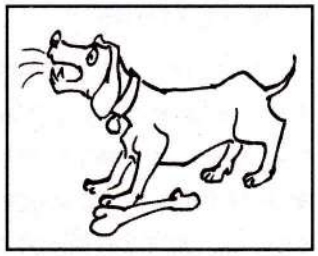

➡ **নীচের বাক্যগুলো লক্ষ করো ঃ**

■ **রবীন্দ্রনাথ** গীতাঞ্জলি রচনা করেন। ■ **গীতাঞ্জলি** গানের বই। ■ **দুধ** একটি পুষ্টিকর খাদ্য। ■ **কুকুর** প্রভুভক্ত প্রাণী। ■ **সাঁতার** একটি ভালো ব্যায়াম।

ওপরের বাক্যগুলিতে 'রবীন্দ্রনাথ' পদটির দ্বারা ব্যক্তির নাম বোঝায়। 'গীতাঞ্জলি' একটির বইয়ের নাম। 'দুধ' বস্তু বা দ্রব্যের নাম। 'কুকুর' একটি প্রাণীর নাম এবং 'সাঁতার' একটি কাজের নাম। এরকম কোনো কিছুর নাম বোঝালে **বিশেষ্য পদ** হয়। সুতরাং **রবীন্দ্রনাথ, গীতাঞ্জলি, দুধ, কুকুর, সাঁতার** — এগুলি হল বিশেষ্য পদ।

বিশেষ্য পদের সংজ্ঞা ঃ যে পদের দ্বারা কোনো কিছুর নাম বোঝায়, তাকে **বিশেষ্য পদ** বলে। বিশেষ্য পদকে ছয়ভাগে ভাগ করা হয়— ১. **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য**, ২. **বস্তুবাচক বিশেষ্য**, ৩. **জাতিবাচক বিশেষ্য**, ৪. **গুণবাচক বিশেষ্য**, ৫. **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য** ও ৬. **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য**।

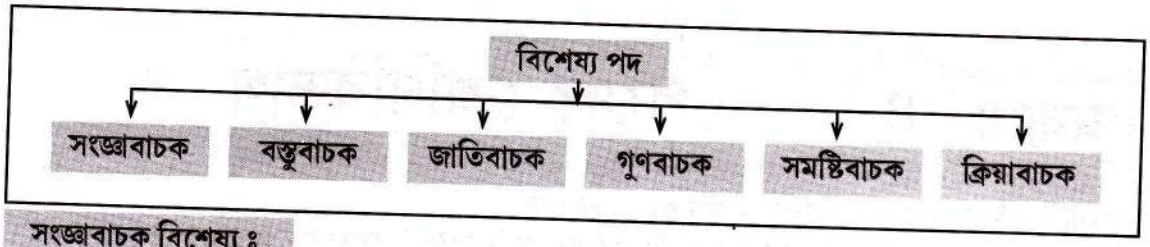

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য ঃ

যে বিশেষ্য পদের দ্বারা কোনো ব্যক্তি, স্থান, নদী, সমুদ্র, পাহাড়, পর্বত, গ্রন্থ প্রভৃতির নাম বোঝায় তাকে **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন — ■ **ঈশ্বরচন্দ্র** বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যের জনক। ■ **কলকাতা** পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী। ■ **গঙ্গা** ভারতের বৃহত্তম নদী। ■ **আরবসাগর** ভারতের পশ্চিমে অবস্থিত। ■ **হিমালয়** ভারতের উত্তরে অবস্থিত। ■ **শুশুনিয়া** পাহাড় বাঁকুড়া জেলায় অবস্থিত। ■ **কোরান** পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। ■ **তাজমহল** পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি।

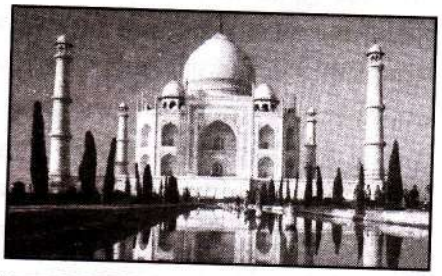

বস্তুবাচক বিশেষ্য ঃ

যে বিশেষ্য পদ কোনো বস্তু বা দ্রব্যের নাম বোঝায় তাকে **বস্তুবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন — ■ **জল** ছাড়া প্রাণ বাঁচে না। ■ **দুধ** বলকারক খাদ্য। ■ **সোনা** মূল্যবান ধাতু। ■ **লোহা** অতি প্রয়োজনীয় ধাতু। ■ **ধান** আমাদের প্রধান খাদ্যশস্য। ■ **গম** উৎপাদনে পাঞ্জাব প্রথম। ■ **চিনি** নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য। ■ **মাটি** দূষিত হলে গাছের ক্ষতি হয় ■ **আপেল** একটি সুস্বাদু ফল।

জাতিবাচক বিশেষ্য ঃ

যে বিশেষ্য পদ দ্বারা কোনো একটি বিশেষ জাতি বা শ্রেণির সমস্ত প্রাণীকে বোঝায়, তাকে **জাতিবাচক বিশেষ্য** বলে।

যেমন — ■ **মানুষ** পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। ■ **বাঙালি** ভ্রমণপ্রিয় জাতি। ■ **হিন্দুরা** মূর্তি পূজায় বিশ্বাসী। ■ **গোরু** উপকারী প্রাণী। ■ **পাখি** ফল খায়। ■ **বাঘ** বনে বাস করে। ■ **তিমি** জলে থাকে। ■ **ঘোড়া** গাড়ি টানে।

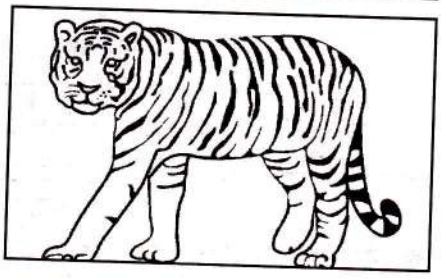

গুণবাচক বিশেষ্য ঃ

যে বিশেষ্য পদের দ্বারা দোষ, গুণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝায়, তাকে **গুণবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন—■ **দয়া** পরম ধর্ম। ■ **স্নেহ** একটি মানবিক গুণ। ■ **শৈশব** জীবনের সূচনাকাল। ■ **নিষ্ঠুরতা** বর্জন করো। ■ **ভালোবাসা** মানুষে মানুষে মিলন ঘটায়। ■ **সততা** দ্বারা বড়ো হওয়া যায়। ■ **বার্ধক্য** জীবনে জড়তা নিয়ে আসে। ■ **উদারতা** সংহতি তৈরি করে।

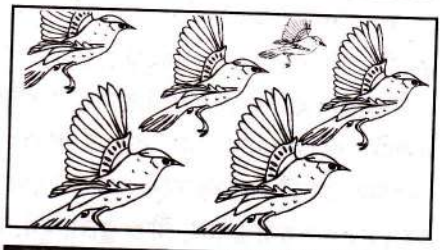

সমষ্টিবাচক বিশেষ্য ঃ

যে বিশেষ্য পদ দ্বারা একটি ব্যক্তি বা বস্তুকে না বুঝিয়ে বহু ব্যক্তি বা বস্তুর সমষ্টিকে বোঝায়, তাকে **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন —

■ **দলটি** ভালোই খেলল। ■ **সভা** শুরু হল যথাসময়ে। ■ আমরা **সমিতি** তৈরি করলাম। ■ **ঝাঁক ঝাঁক** পাখি উড়ে গেল। ■ **সংঘ** তৈরি হলে শক্তি বাড়ে।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ঃ

যে বিশেষ্য পদের দ্বারা কোনো কাজের নাম বোঝায় তাকে **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য** বলে। যেমন —

■ **সাঁতার** একটি ভালো ব্যায়াম। ■ স্বল্প **ভোজন** স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো। ■ **গমন** সমাপ্ত হল। ■ **দর্শন** তীক্ষ্ণ হলে বুদ্ধি বাড়ে। ■ **বিশ্রাম** কাজের গতি বাড়ায়।

মনে রাখবে ঃ

পদ পাঁচ প্রকার। যথা—১. **বিশেষ্য**, ২. **সর্বনাম**, ৩. **বিশেষণ**, ৪. **অব্যয়** ও ৫. **ক্রিয়া**।

যে পদের দ্বারা কোনো কিছুর নাম বোঝায় তাকে **বিশেষ্য পদ** বলে।

■ বিশেষ্য পদ ছয় প্রকার—১. **সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য**, ২. **বস্তুবাচক বিশেষ্য**, ৩. **জাতিবাচক বিশেষ্য**, ৪. **গুণবাচক বিশেষ্য**, ৫. **সমষ্টিবাচক বিশেষ্য** এবং ৬. **ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য**।

প্রতি প্রকার বিশেষ্য পদের উদাহরণ হল —

সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য ঃ

নেতাজি, রবীন্দ্রনাথ, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, হিমালয়, কোরান, গীতা, মহাভারত, কলকাতা, হলদিয়া ইত্যাদি।

বস্তুবাচক বিশেষ্য ঃ

দুধ, তেল, চা, চিনি, জল, মাটি ইত্যাদি।

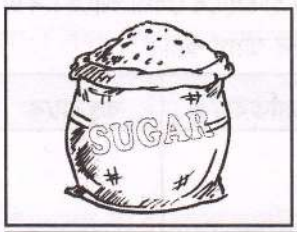

জাতিবাচক বিশেষ্য ঃ

বাঙালি, পাঞ্জাবি, মানুষ, সিংহ, গোরু, পাখি, হাতি ইত্যাদি।

গুণবাচক বিশেষ্য ঃ

দয়া, মায়া, সাধুতা, নিষ্ঠুরতা, সৌন্দর্য, সততা ইত্যাদি।

সমষ্টিবাচক বিশেষ্য ঃ

শ্রেণি, দল, সভা, সমিতি, জনতা ইত্যাদি।

ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ঃ

শয়ন, ভোজন, গমন, শ্রবণ, দর্শন, সাঁতার ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ**

ক) পদ কয় প্রকার ও কী কী? খ) বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বোঝাও। গ) বিশেষ্য পদ কয় প্রকার ও কী কী? ঘ) সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও। ঙ) বস্তুবাচক বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও। চ) জাতিবাচক বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও। ছ) গুণবাচক বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও। জ) সমষ্টিবাচক বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও। ঝ) ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য পদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। **নীচের বিশেষ্য পদগুলি কোন্‌টি কী জাতীয় বিশেষ্য পদ লেখো ঃ**

গঙ্গা, রামায়ণ, সত্যজিৎ রায়, দিঘা, তেল, বাঘ, সততা, গমন, সমিতি, দুধ, চিনি, গীতা, মহাভারত, ভোজন, সাঁতার, সভা, জনতা, রামকৃষ্ণ, সৌন্দর্য।

৩। এমন একটি বাক্য লেখো যাতে বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, অব্যয় এবং ক্রিয়াপদ আছে।

৪। **নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ছকে নির্দিষ্ট বিশেষ্য পদগুলি বসাও ঃ**

ভারতবর্ষ একসময় পরাধীন ছিল। প্রায় ২০০ বছর পর আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি; কিন্তু আমরা ভুলে গেছি সেই সব শহিদদের কথা, যাঁরা প্রাণ দিয়ে দেশের স্বাধীনতা এনেছিলেন। তাঁদের অমর স্মৃতি এবং সাহসিকতা আমাদের ইতিহাসে লেখা আছে। সভা বা সমিতি গঠন করে নয়, ভারতীয় হিসাবে আমাদের উচিত তাঁদের প্রতিদিন স্মরণ করা।

সংজ্ঞাবাচক	জাতিবাচক	বস্তুবাচক	গুণবাচক	সমষ্টিবাচক	ক্রিয়াবাচক

সর্বনাম পদ

➡ **নীচের বাক্যগুলো লক্ষ করো ঃ**

নীলু আমার বন্ধু। নীলু খুব ভালো ক্রিকেট খেলে। নীলু পড়াশুনাতেও ভালো। নীলু এবার বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। নীলু জুনিয়ার ক্রিকেটে এবার জেলার হয়ে খেলবে।

ওপরের বাক্যগুলিতে 'নীলু' নামটি বার বার ব্যবহৃত হয়েছে। এতে বাক্যগুলোর শ্রুতিমাধুর্য নষ্ট হয়েছে। যদি এই ভাবে লেখা হয় — নীলু আমার বন্ধু। সে খুব ভালো ক্রিকেট খেলে। সে পড়াশুনাতেও ভালো। সে এবার বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে। সে এবার জুনিয়ার ক্রিকেটে জেলার হয়ে খেলবে।

এবার বাক্যগুলি শুনতে বেশ ভালো লাগে। বার বার 'নীলু' ব্যবহার না করে তার বদলে '**সে**' ব্যবহার করা হয়েছে। '**সে**' **হল সর্বনাম পদ**।

সর্বনাম পদের সংজ্ঞা ঃ

বিশেষ্য পদের বদলে যে পদ ব্যবহার করা হয় তাকে সর্বনাম পদ বলে। যেমন—আমি, তুমি, সে, তিনি, ইহা, এটা, ওটা, তাকে, তার ইত্যাদি।

সর্বনাম পদকে আবার কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়—**ব্যক্তিবাচক সর্বনাম, আত্মবাচক সর্বনাম, সমষ্টিবাচক সর্বনাম, নির্দেশক সর্বনাম, অনির্দেশক সর্বনাম, প্রশ্নবাচক সর্বনাম, সাপেক্ষ সর্বনাম, পারস্পরিক সর্বনাম**।

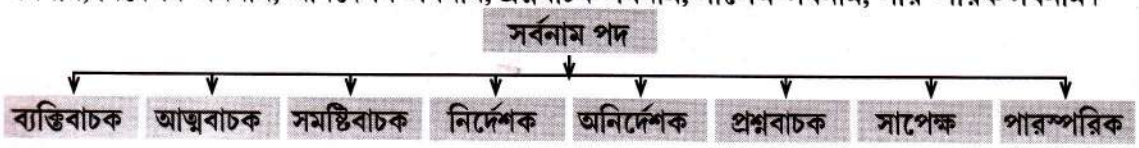

ব্যক্তিবাচক সর্বনাম ঃ

যে সর্বনাম পদ ব্যক্তিবাচক বিশেষ্যের পরিবর্তে বসে তাকে **ব্যক্তিবাচক সর্বনাম** বলে। যেমন — **আমি** পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ি। **তুমি** নিশ্চয় খবরটি শুনেছ। **তিনি** আমাদের শিক্ষক। **আপনি** কেমন আছেন? **সে** ভালো ফুটবল খেলে। '**মোরা** একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু মুসলমান।' (কাজী নজরুল ইসলাম)

আত্মবাচক সর্বনাম ঃ

যে সর্বনামের দ্বারা অপরের সহায়তা না নিয়ে কোনো বিষয় জোরের সঙ্গে ব্যক্ত হয়, তাকে **আত্মবাচক সর্বনাম** বলে। যেমন—সে **নিজেই** একাজ করবে। **স্বয়ং** দেবতারাও একাজ করতে পারেন না। **আপনি** নিশ্চয় শুনেছেন। **নিজ** জন্মভূমিকে সবাই ভালোবাসে।

সমষ্টিবাচক সর্বনাম ঃ

যে সর্বনাম পদ ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়ের সমষ্টিকে নির্দেশ করে তাকে **সমষ্টিবাচক সর্বনাম** বলে। যেমন — '**সকলের** তরে সকলে আমরা।' 'গল্পটা **সবাই** জানে।' রমা এবং কমলা **উভয়েই** আমার বন্ধু। '**সবে** মিলে করি কাজ।' '**সকল** দেশের রানি সে যে আমার জন্মভূমি।'

নির্দেশক সর্বনাম ঃ

কোনো ব্যক্তি বা বস্তুকে যে সর্বনাম দ্বারা নির্দেশ করা হয়, তাকে **নির্দেশক সর্বনাম** বলে। যেমন — **ইনি** একজন বাঙালি কবি। **উনি** বিদেশে থাকেন। **এ** দেশ আমার জন্মভূমি। **ওকে** ভেতরে আসতে বলো। **ওটা** কীসের শব্দ!

অনির্দেশক সর্বনাম ঃ

যে সর্বনাম পদের দ্বারা কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা বিষয়কে নির্দিষ্টভাবে বোঝায় না, তাকে **অনির্দেশক সর্বনাম** বলে। যেমন — **কেউ** কথা রাখে নি। **কিছু** লোক আসবে। **কাদের** সঙ্গে যাবে? **যে কেউ** ঠিকানাটা বলে দেবে। **কারা কারা** খেলবে?

প্রশ্নবাচক সর্বনাম ঃ

যে সর্বনামের দ্বারা কোনো কিছু জানার ইচ্ছা প্রকাশ পায়, তাকে **প্রশ্নবাচক সর্বনাম** বলে। যেমন — **কোথায়** যাবে? তোমরা **কী কী** খাবে? **কে** আসবে? **কোন্‌টি** তোমার বই? **কাকে** বিশ্বকবি বলা হয়?

সাপেক্ষ সর্বনাম ঃ

যে সর্বনাম পদগুলি পরস্পর নির্ভরশীল অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, তাকে **সাপেক্ষ সর্বনাম** বলে। এখানে দুটি সর্বনাম পদ বসাতেই হবে। যেমন — **যিনি** রাম, **তিনিই** কৃষ্ণ। **যা** সত্য **তাই** সুন্দর। **যেমন** কর্ম **তেমন** ফল। **যাকে** চাও **তাকেই** পাবে।

পারস্পরিক সর্বনাম ঃ

পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে যে সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়, তাকে **পারস্পরিক সর্বনাম** বা **ব্যতিহারিক সর্বনাম** বলে। যেমন — 'শিশুগণ দেয় মন **নিজ নিজ** পাঠে।' **আপনা আপনিই** গাছের পাতাগুলি নড়ছে। তারা **পরস্পরে** আলিঙ্গান করল।

মনে রাখবে ঃ

■ বিশেষ্য পদের পরিবর্তে যে পদ বসে তাকে সর্বনাম পদ বলে। যেমন- **সে, তিনি, ইহা, তাঁকে, ইনি, আপনি, স্বয়ং** ইত্যাদি।

■ সর্বনাম পদ আট প্রকার— **ব্যক্তিবাচক, আত্মবাচক, সমষ্টিবাচক, নির্দেশক, অনির্দেশক, প্রশ্নবাচক, সাপেক্ষ ও পারস্পরিক।**

■ প্রত্যেক প্রকার সর্বনামের উদাহরণ হল — ● ব্যক্তিবাচক ঃ **আমি, তুমি, তিনি, আপনি, সে, মোরা,** ইত্যাদি। ● আত্মবাচক ঃ **নিজে, স্বয়ং, আপনি, নিজ** ইত্যাদি। ● সমষ্টিবাচক ঃ **সকলে, সবাই, উভয়, সবে** ইত্যাদি। ● নির্দেশক ঃ **ইনি, উনি, এ, ওকে, ওটা** ইত্যাদি। ● অনির্দেশক ঃ **কেউ, কিছু, যে কেউ, কারা** ইত্যাদি। ● প্রশ্নবাচক ঃ **কোথায়, কে, কী, কোন্‌, কাকে** ইত্যাদি। ● সাপেক্ষ ঃ **যিনি-তিনি, যা-তাই, যাকে-তাকে, যেমন-তেমন** ইত্যাদি। ● পারস্পরিক ঃ **নিজ নিজ, আপনা আপনি, পরস্পরে** ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

ক) সর্বনাম পদ কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। খ) সর্বনাম পদ কয় প্রকার ও কী কী?
গ) ব্যক্তিবাচক সর্বনাম কাকে বলে? উদাহরণ দাও। ঘ) আত্মবাচক সর্বনাম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
ঙ) সমষ্টিবাচক সর্বনাম কাকে বলে? উদাহরণ দাও। চ) নির্দেশক সর্বনাম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
ছ) অনির্দেশক সর্বনাম কাকে বলে? উদাহরণ দাও। জ) প্রশ্নবাচক সর্বনাম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
ঝ) সাপেক্ষ সর্বনাম কাকে বলে? উদাহরণ দাও। ঞ) পারস্পরিক সর্বনাম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। **নীচের সর্বনাম পদগুলি কী ধরনের সর্বনাম লেখো ঃ**

ইনি, কেউ, আপনি, নিজ নিজ, স্বয়ং, সবাই, যেমন তেমন, কে, কোন্, পরস্পর।

৩। **উপযুক্ত সর্বনামটি বেছে নাও ঃ**

(ক) '—— একই বৃন্তে দুটি কুসুম, হিন্দু-মুসলমান।' (আমরা/মোরা)

(খ) '—— সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে।' (তোমরা/ আমরা)

(গ) —— একজন বাঙালি পুলিশ অফিসার। (ইনি/ যিনি)

(ঘ) 'যত মত, —— পথ।' (তত/ তেমন)

(ঙ) —— সব জয়ধ্বনি কর। (আপনারা/তোরা)

(চ) —— বইটি তোমার? (কোথায়/ কোন্)

(ছ) —— হয়তো একথা বলে থাকবে। (আপনি/কেউ)

(জ) —— একটি কলম। (এটা/ ইনি)।

৪। **সঠিক উত্তরের মাথায় (✓) চিহ্ন দাও ঃ**

(ক) ইনি —— (নির্দেশক/অনির্দেশক) সর্বনাম।

(খ) আমি —— (বস্তুবাচক/ব্যক্তিবাচক) সর্বনাম।

(গ) কোন্ —— (প্রশ্নবোধক/ অনির্দেশক) সর্বনাম।

(ঘ) নিজ নিজ —— (আত্মবাচক/পারস্পরিক) সর্বনাম।

(ঙ) সকলে —— (ব্যক্তিবাচক/ সমষ্টিবাচক) সর্বনাম।

৫। **নিম্নলেখ পদগুলির বদলে একটি করে সর্বনাম পদ বসাও ঃ**

(ক) কলমটি লাল। **কলমটি** আমার।

(খ) সুলেখা ভালো গান গায়। **সুলেখা** পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ে।

(গ) নিমাইবাবু আমার শিক্ষক। **নিমাইবাবু** বাংলা পড়ান।

(ঘ) বনমালী আমার বন্ধু। **বনমালী** ভালো ফুটবল খেলে।

(ঙ) ছেলেরা পড়ছে। **ছেলেরা** একই শ্রেণিতে পড়ে।

৬। **নীচের অনুচ্ছেদটি পড়ো এবং ছকে নির্দিষ্ট সর্বনাম পদগুলি বসাও ঃ**

একটি অনুচ্ছেদ লিখতে হবে

তিনি আমাদের শিক্ষক। নিজ জন্মভূমিকে তিনি ভালোবাসেন। সকলের জন্য তাঁর সমান ভালোবাসা। ইনি খাঁটি বাঙালি। তোমরা হয়ত কেউ কেউ তাঁকে দেখে থাকবে। তবে কোথায় তাঁর বাড়ি? যেমন সরল তেমনি

ব্যক্তিবাচক	আত্মবাচক	সমষ্টিবাচক	নির্দেশক	অনির্দেশক	প্রশ্নবাচক	সাপেক্ষ	পারস্পরিক

বিশেষণ পদ

➡ **নীচের বাক্যগুলো লক্ষ করো ঃ**

গাছে **লাল** ফুল ফুটেছে। কী **সুন্দর** দৃশ্য! **পঁচিশে** বৈশাখ অনুষ্ঠান হবে। **ধীরে** চলো। **অনেক** মানুষ সভায় উপস্থিত।

ওপরের বাক্যগুলিতে 'লাল', 'সুন্দর', 'পঁচিশে', 'ধীরে' ও 'অনেক' পদগুলি অন্য কোনো পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা ইত্যাদি প্রকাশ করছে। এদের **বিশেষণ পদ** বলে।

বিশেষণ পদের সংজ্ঞা ঃ

যে পদের দ্বারা অন্য কোনো পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি বোঝায় তাকে **বিশেষণ পদ** বলে। বিশেষণ পদ সাধারণত বিশেষ্যের আগে বসে। আবার কখনও বিশেষ্য পদের পরেও বসে।

বিশেষণ পদকে সাত ভাগে ভাগ করা হয়। যেমন—১. **বিশেষ্যের বিশেষণ,** ২. **সর্বনামের বিশেষণ,** ৩. **বিশেষণের বিশেষণ,** ৪. **সংখ্যা বিশেষণ,** ৫. **পূরণবাচক বিশেষণ,** ৬. **সম্বন্ধ বিশেষণ** ও ৭. **ক্রিয়া বিশেষণ।**

বিশেষ্যের বিশেষণ ঃ

যে পদের দ্বারা বিশেষ্য পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ, ধর্ম প্রভৃতি বোঝায় তাকে **বিশেষ্যের বিশেষণ** বলে। যেমন—**সুন্দর** দৃশ্য। **কনকনে** শীত। **প্রচন্ড** ঝড়। **গভীর** রাত। **অনেক** লোক। **দুরন্ত** শিশু।

সর্বনামের বিশেষণ ঃ

যে পদের দ্বারা সর্বনাম পদের দোষ, গুণ, অবস্থা ইত্যাদি বোঝায় তাকে **সর্বনামের বিশেষণ** বলে। যেমন— **অধম** আমি তোমার আর্শীবাদ চাই। **শান্ত** উনি। **অশান্ত** তুমি। **দুরন্ত** সে।

বিশেষণের বিশেষণ ঃ

যে পদের দ্বারা কোনো বিশেষণের দোষ, গুণ, অবস্থা, প্রকৃতি ইত্যাদি বোঝায়, তাকে **বিশেষণের বিশেষণ** বলে। যেমন— **তুলতুলে** নরম। **গাঢ়** নীল আকাশ। **অতি** সুন্দর দৃশ্য। **টুকটুকে** লাল জবা। **খুব** জোরে হাঁটো।

সংখ্যা বিশেষণ ঃ

যে বিশেষণ পদ গণনাযোগ্য বিশেষ্যের সংখ্যা নির্দেশ করে, তাকে **সংখ্যা বিশেষণ** বলে। যেমন— **হাজার** বছর। **শতবর্ষ** পরে। **দশটা** ছেলে। **নয়টি** গ্রহ।

পূরণবাচক বিশেষণ ঃ

যে বিশেষণ পদ বিশেষ্যের ক্রমিক সংখ্যা নির্দেশ করে, তাকে **পূরণবাচক বিশেষণ** বলে। যেমন— **পয়লা** মে। **বিংশ** শতাব্দী। **অষ্টম** অধ্যায়। **পঁচিশে** বৈশাখ।

সম্বন্ধ বিশেষণ ঃ

সম্বন্ধ পদ যদি বিশেষ্যের দোষ, গুণ, অবস্থা ইত্যাদি প্রকাশ করে, তবে তাকে **সম্বন্ধ বিশেষণ** বলে। যেমন— **কাজের** ছেলে। **সহানুভূতির** কথা। **দুঃখের** দিন। **ভোরের** আকাশ।

ক্রিয়া বিশেষণ ঃ

যে বিশেষণ পদ ক্রিয়া কী রূপে ঘটছে তা বুঝিয়ে দেয়, তাকে **ক্রিয়া বিশেষণ** বলে। যেমন— **ধীরে** চলো। **দ্রুত** ভেসে গেল। **আস্তে** হাঁটো। **জোরে** বলো।

মনে রাখবে ঃ

- যে পদের দ্বারা অন্য কোনো পদের দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা ইত্যাদি বোঝায় তাকে **বিশেষণ পদ** বলে।
- বিশেষণ পদ সাত প্রকার যেমন—১. **বিশেষ্যের বিশেষণ**, ২. **সর্বনামের বিশেষণ**, ৩. **বিশেষণের বিশেষণ**, ৪. **সংখ্যা বিশেষণ**, ৫. **পূরণবাচক বিশেষণ**, ৬. **সম্বন্ধ বিশেষণ** ও ৭. **ক্রিয়া বিশেষণ**।
- প্রত্যেক প্রকার বিশেষণের উদাহরণ হল — ● বিশেষ্যের বিশেষণ ঃ **লাল** ফুল। **ভালো** ছেলে। **সুন্দর** দিন। ● সর্বনামের বিশেষণ ঃ **অধম** তুমি। **শান্ত** সে। **অশান্ত** তারা। ● বিশেষণের বিশেষণ ঃ **খুব** দ্রুত হাঁটো। **ভীষণ** সুন্দর দৃশ্য। **অতি** মজার গল্প। ● সংখ্যা বিশেষণ ঃ **দশ** টাকা। **পঞ্চ** নদ। **হাজার** লোক। ● পূরণবাচক বিশেষণ ঃ **পয়লা** বৈশাখ। **সপ্তম** অধ্যায়। **দশম** শতাব্দী। ● সম্বন্ধ বিশেষণ ঃ **ভোরের** বাতাস। **রামের** বই। **কাজের** লোক। ● ক্রিয়া বিশেষণ ঃ **ধীরে** বহে নদী। **দ্রুত** হাঁটো। **জোরে** বলো।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

(ক) বিশেষণ পদ কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও। (খ) বিশেষণ পদ কয় প্রকার ও কী কী? (গ) বিশেষ্যের বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও। (ঘ) সর্বনামের বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও। (ঙ) বিশেষণের বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও। (চ) সংখ্যা বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও। (ছ) পূরণবাচক বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও। (জ) সম্বন্ধ বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও। (ঝ) ক্রিয়া বিশেষণ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। কোন্ ধরনের বিশেষণ লেখো ঃ

(ক) তিনি **খুব** দয়ালু লোক। (খ) **টুকটুকে** লাল ফুল। (গ) **ভীষণ** ঝড়। (ঘ) **দশম** অধ্যায়। (ঙ) **নব** গ্রহ। (চ) **হাজার** লোক। (ছ) **কাজের** মানুষ। (জ) **ধীরে** কথা বলো।

৩। সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দাও ঃ

(ক) **অতি** দরিদ্র লোক। (বিশেষ্যের বিশেষণ/ বিশেষণের বিশেষণ)

(খ) **আস্তে** হাঁটো। (ক্রিয়া বিশেষণ/ সম্বন্ধ বিশেষণ)

(গ) **পঞ্চম** শ্রেণি। (সংখ্যা বিশেষণ/ পূরণবাচক বিশেষণ)

(ঘ) হারাধনের **দশটি** ছেলে। (পূরণবাচক বিশেষণ/সংখ্যা বিশেষণ)

(ঙ) **কে. সি. পালের** ছাতা। (সম্বন্ধ বিশেষণ/ বিশেষ্যের বিশেষণ)

(চ) **ধীরে ধীরে** হাঁটো। (ক্রিয়া বিশেষণ/বিশেষণের বিশেষণ)

৪। নীচের বাক্যগুলো থেকে বিশেষণ পদ খুঁজে নিয়ে লেখো ঃ

(ক) সে ভয়ানক যুদ্ধ। (খ) এক কেজি চাল। (গ) নীল গগনে তারার মেলা। (ঘ) অতি দীন ছিলেন রাবেয়া। (ঙ) সুন্দর তুমি সুন্দর হে। (চ) 'হইল প্রভাত বিংশ শতাব্দীর।' (ছ) 'মাঠের ধান মাঠেই শুকিয়ে গেল।'

অব্যয় পদ

কিছু কিছু পদ আছে যেগুলি কোন অবস্থাতেই পরিবর্তিত হয় না। অর্থাৎ পদের কোনো ব্যয় বা পরিবর্তন নেই। নিচের বাক্যগুলি দেখলে ব্যাপারটি বোঝা যাবে ঃ লোকটি দরিদ্র; **কিন্তু** সৎ। শুনলাম **এবং** মুগ্ধ হলাম। দ্রুত হাঁটো, **নচেৎ** ট্রেন ফেল করবে। **বাঃ**! কী সুন্দর দৃশ্য!

ওপরের বাক্যগুলিতে 'কিন্তু', এবং, 'নচেৎ', 'বাঃ' পদগুলি বাক্যে অন্যান্য পদগুলির মধ্যে সংযোগ রক্ষা করেছে। এর জন্য বাক্যগুলি সুন্দর হয়েছে। এই পদগুলির লিঙ্গ, বচন, পুরুষভেদে কোনো অবস্থাতেই পরিবর্তন হয় না। এদের 'অব্যয়' বলে।

অব্যয়ের সংজ্ঞা ঃ

যে সব পদ লিঙ্গ, বচন, পুরুষভেদে ব্যয় বা কোনো পরিবর্তন হয় না, তাদের **অব্যয়** বলে। এই অব্যয় পদ নানা প্রকারের হয়। যেমন —

সংযোজক অব্যয় ঃ

যে অব্যয় একাধিক পদ বা বাক্যকে সংযুক্ত করে, তাকে **সংযোজক অব্যয়** বলে।

যেমন— রাম **এবং** শ্যাম দুই বন্ধু। তোমাকে গল্পটি শোনাব **এবং** বাড়ি যাব। সূর্য **ও** চাঁদ একই সময়ে ওঠে না। তুমি **আর** আমি খেলব।

বিয়োজক অব্যয় ঃ

যে অব্যয় দুই বা ততোধিক পদ বা বাক্যকে বিযুক্ত করে, তাকে **বিয়োজক অব্যয়** বলে।

যেমন— দ্রুত হাঁটো **নতুবা** ট্রেন ফেল করবে। রহিম **কিংবা** অমল যে কোনো একজন এলেই হবে। তুমি **নইলে** এ জীবন যে মিথ্যা হত। মন দিয়ে পড়ো **অথবা** অন্য কাজ করো। ঈশ্বর **যদি না** সহায় হোন, মানুষ আর কী করতে পারে।

সংকোচক অব্যয় ঃ

যে অব্যয় প্রত্যাশিত ফল বুঝিয়ে বিপরীত ফলটি নির্দেশ করে, তাকে **সংকোচক অব্যয়** বলে।

যেমন— সে আসবে বলেছিল **কিন্তু** আসেনি। প্রাণ দেব **তবু** অন্যায়ের কাছে মাথা নত করব না। তুমি এস না, **বরং** রামকে পাঠিয়ে দিও। শচিন সেঞ্চুরি করল, **তথাপি** ভারত হেরে গেল। টাকা তো দিলই না **উপরন্তু** শাসিয়ে গেল।

বিস্ময়সূচক অব্যয় ঃ

যে অব্যয় দ্বারা মনের আবেগ বা বিস্ময় প্রকাশিত হয়, তাকে **বিস্ময়সূচক অব্যয়** বলে।

যেমন— **বাঃ**! কী সুন্দর দৃশ্য! **আহা**! লোকটির কী দুর্দশা! **ওরে বাবা**! সে কী ভয়ংকর ঘটনা! **উঃ**! কী শীত!

ঘৃণা বা বিরক্তিসূচক অব্যয় ঃ

যে অব্যয় পদের দ্বারা ঘৃণা বা বিরক্তি প্রকাশিত হয়, তাকে **ঘৃণা** বা **বিরক্তি সূচক অব্যয়** বলে। যেমন— **দূর! দূর!** একেবারে অপদার্থ! **ধিক্ ধিক্!** কী বাজে লোক! **ছি, ছি!** এমন কাজ করলে!

প্রশংসা, হর্ষসূচক অব্যয় ঃ

যে অব্যয় দ্বারা কারো প্রশংসা অথবা আনন্দ প্রকাশ করাকে বোঝায় তাকে **প্রশংসা** বা **হর্ষসূচক অব্যয়** বলে। যেমন— **বেশ, বেশ**! চমৎকার খেলেছ। **শাবাশ, শাবাশ**! বেশ ভালো রেজাল্ট করেছ। **ধন্য, ধন্য**! বাছা তোমার কেরামতি। **বাঃ**! কী মজার গল্প!

খেদ, শোক, বিস্মৃতিসূচক অব্যয় ঃ

যে অব্যয় মনের খেদ, শোক এবং বিস্মৃতিকে নির্দেশ করে তাকে **বিস্মৃতি সূচক অব্যয়** বলে।

যেমন— **আহা**! কী বিপদেই না সে পড়েছে! **ওই যা**! বইটা আনতে ভুলে গেছি! বাবা তোকে খুব বকেছে, **না রে**! **মরি মরি**! এত যাতনা সইব কী করে!

সম্বোধনসূচক অব্যয় ঃ

যে অব্যয় পদের দ্বারা কাউকে সম্বোধন করা হয়, তাকে **সম্বোধনসূচক অব্যয়** বলে।

যেমন— '**ওরে**, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাইরে।' '**ওহে**, বালক! তুমি কেন তপোবন বিরুদ্ধ আচরণ করিতেছ?' **ওগো**, আমাকে একটু সাহায্য করো। **ওলো**, সই, জলকে চল।

প্রশ্নসূচক অব্যয় ঃ

যে অব্যয় প্রশ্ন বোঝাবার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাকে **প্রশ্নসূচক** অব্যয় বলে।

যেমন— সে আসবে **কি**? তোরা **নাকি** এবার পুজোয় দিল্লি যাচ্ছিস? **কেন** চেয়ে আছ গো মা? ছেলেটি **কোথায়** গেল?

উপমাসূচক অব্যয় ঃ

যে অব্যয় উপমা হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাকে **উপমাসূচক অব্যয়** বলে।

যেমন— ভূমিকম্প **সম** দুর্যোগ আর নেই। মায়ের **মতো** আপন কেউ নেই। 'দেখে **যেন** মনে হয় চিনি উহারে।' 'তোমা **হেন** নিষ্ঠুর আর কে আছে?'

আলংকারিক অব্যয় ঃ

যে অব্যয় বাক্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, তাকে **আলংকারিক অব্যয়** বলে।

যেমন— **কী** সুন্দর দৃশ্য! গল্পটা **তো** সবাই জানে। এ **তো** সেকেলে মুদ্রা।

অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় ঃ

যে অব্যয় ধ্বনির অনুকরণে সৃষ্টি অথবা অনুভূতিগ্রাহ্য কোনো ভাবের ইঙ্গিত দেয় তাকে **অনুকার** বা **ধ্বন্যাত্মক অব্যয়** বলে। যেমন—'বৃষ্টি পড়ে **টাপুর টুপুর**।' '**ঝক্‌ঝক্** কলসির **বক্‌বক্** শোন গো।' দুপুরের রোদে মাঠ **খাঁ খাঁ** করছে। মেয়েটি **খিলখিল** হাসছে।

নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয় ঃ

যে অব্যয় পরস্পর নির্ভরশীল হয়ে বাক্যের সংযোগ ঘটায় তাকে **নিত্য সম্বন্ধীয় অব্যয়** বলে।

যেমন— **যিনি** রাম **তিনিই** কৃষ্ণ। **যত** মত **তত** পথ। **যেমন** কর্ম **তেমন** ফল। জোর **যার** মুলুক **তার**। **হয়** করব, **না হয়** মরব।

মনে রাখবে ঃ

■ লিঙ্গ, বচন, পুরুষ ও বিভক্তিভেদে যে পদের কোনো পরিবর্তন হয় না এবং বাক্যের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে তাকে **অব্যয়** বলে।

■ **বিভিন্ন প্রকার অব্যয় ও তাদের উদাহরণ ঃ**

- সংযোজক অব্যয় ঃ **এবং, ও, আর, তথা** ইত্যাদি।
- বিয়োজক অব্যয় ঃ **অথবা, কিংবা, যদি না, নইলে** ইত্যাদি।
- সংকোচক অব্যয় ঃ **তবু, বরং, তথাপি, উপরন্তু** ইত্যাদি।
- বিস্ময়সূচক অব্যয় ঃ **বাঃ, আহা, বাপরে, ওরে বাবা** ইত্যাদি।
- ঘৃণা বা বিরক্তিসূচক অব্যয় ঃ **ধিক্ ধিক্, ছি-ছিঃ, দুর্ দুর্** ইত্যাদি।
- প্রশংসা বা হর্ষসূচক অব্যয় ঃ **বেশ বেশ, শাবাশ, ধন্য ধন্য, বাঃ** ইত্যাদি।
- খেদ, শোক, বিস্মৃতসূচক অব্যয় ঃ **আহা!, ওই যা! মরি মরি!** ইত্যাদি।
- সম্বোধনসূচক অব্যয় ঃ **হে, ওহে, ওরে, ওগো** ইত্যাদি।
- প্রশ্নসূচক অব্যয় ঃ **নাকি, কেন, কি, কোথায়, কোন্** ইত্যাদি।
- উপমাসূচক অব্যয় ঃ **সম, হেন, মতো, যেন** ইত্যাদি।
- আলংকারিক অব্যয় ঃ **কী, তো, এতো** ইত্যাদি।
- অনুকার বা ধ্বন্যাত্মক অব্যয় ঃ **খাঁ খাঁ, টাপুর টুপুর, ঝক্‌ঝক্, খিলখিল, চিক্‌চিক্** ইত্যাদি।
- নিত্যসম্বন্ধীয় অব্যয় ঃ **যিনি-তিনি, যত-তত, যেমন-তেমন, হয়-না হয়** ইত্যাদি।

অনুশীলনী

১। **শূন্যস্থানে সঠিক অব্যয় বসাও ঃ**

(ক) সে আসবে বলেছিল —— আসেনি। (কিন্তু/অথবা)

(খ) তোমা —— নিষ্ঠুর আর কে আছে? (পর্যন্ত/হেন)

(গ) পরিশ্রমী হও —— কষ্ট পাবে। (নচেৎ/এবং)

(ঘ) নদীর তীরে বালি —— করছে। (খাঁ খাঁ/ চিক্‌চিক্)

(ঙ) এ —— বাঘ নয়, মানুষ। (কিন্তু/তো)

(চ) —— তুমি এত ভালো নম্বর পেয়েছ! (শাবাশ/হায় হায়)

(ছ) সাহায্য তো করলেই না —— আমার বদনাম করলে। (সুতরাং/উপরন্তু)

(জ) —— কী আনন্দ! (উঃ/আহা)

(ঝ) ——মত —— পথ। (যত-তত/ যেমন-তেমন)

(ঞ) দুধের স্বাদ —— ঘোলে মেটে? (তবু/কি)

২। কোন্‌টি কী ধরনের অব্যয় লেখো ঃ

কিন্তু, এবং, বিনা, উপরন্তু, আহা, উঃ, ঝম্‌ঝম্‌, তো, হরিহরি, ধিক্‌ধিক, সম, নাকি, তথাপি, হয়-নয়।

৩। নীচের অব্যয়গুলি দ্বারা একটি করে বাক্য রচনা করো ঃ

নচেৎ, নাইবা, যেমন-তেমন, তো, ওরে, উপরন্তু, কিংবা, নতুবা, বরং, আবার।

৪। সঠিক উত্তরের মাথায় (✓) চিহ্ন দাও ঃ

(ক) কিন্তু —(বিয়োজক অব্যয়/সংকোচক অব্যয়)।

(খ) ওরে — (বিস্ময়সূচক/সম্বোধনসূচক অব্যয়)।

(গ) ধিক্‌ ধিক্‌ — (ঘৃণাসূচক/প্রশংসাসূচক অব্যয়)।

(ঘ) ঝির্‌ ঝির্‌ — (ধ্বন্যাত্মক/আলংকারিক অব্যয়)।

(ঙ) নতুবা — (বিয়োজক/উপমাবাচক অব্যয়)।

৫। নীচের অব্যয়গুলি বাক্যের সাহায্যে একটি করে উদাহরণ দাও ঃ

প্রশ্নসূচক অব্যয়, বিয়োজক অব্যয়, আলংকারিক অব্যয়, ঘৃণাসূচক অব্যয়, সম্বোধনসূচক অব্যয়, উপমাসূচক অব্যয়, ধ্বন্যাত্মক অব্যয়, সংযোজক অব্যয়, সংকোচক অব্যয়, নিত্যসম্বন্ধীয় অব্যয়।

৬। নীচের বাক্যগুলি থেকে অব্যয় বের করো এবং সেগুলো কী ধরনের অব্যয় লেখো ঃ

(ক) জল বিনা মাছ বাঁচে না।

(খ) সাবধানে যেও, নইলে বিপদ হতে পারে।

(গ) শাবাশ! এবারও পরীক্ষায় প্রথম হয়েছ।

(ঘ) ওগো, তোমরা আমাকে সাহায্য করো।

(ঙ) তুমি আজ দিল্লি যাচ্ছ নাকি?

(চ) মেঘ জমেছিল ভালো, তথাপি বৃষ্টি হল না।

(ছ) যত পড়বে তত জ্ঞান বাড়বে।

(জ) মন দিয়ে পড়ো নচেৎ পাশ করতে পারবে না।

ক্রিয়াপদ

ক্রিয়াপদ হল বাক্যের অপরিহার্য অংশ। ক্রিয়া ছাড়া কোন বাক্য গঠিত হতে পারে না। যেমন—আমাদের বিদ্যালয় (হয়) আমাদের বাড়ির কাছেই। সুনীলবাবু (হণ) বড় লোক। এখানে দুটি বাক্যে 'হয়' এবং 'হণ' ক্রিয়াপদ দুটি উহ্য রয়েছে।

নীচের বাক্যগুলো লক্ষ করো ঃ

আমি **পড়ছি**। প্রচন্ড বেগে ঝড় **হচ্ছে**। আমাদের বাড়িতে কুকুর **আছে**।

ওপরের বাক্যগুলিতে 'পড়ছি' 'হচ্ছে', 'আছে' পদগুলো দ্বারা কোনো কিছু করা, হওয়া এবং আছে অর্থ বোঝাচ্ছে। এগুলিকে **ক্রিয়াপদ** বলে। কোন কোন বাক্যে ক্রিয়াপদ দেখা যায় না ঠিকই কিন্তু ইহা বাক্যের ভেতরের উহ্য অবস্থায় থাকে।

ক্রিয়াপদের সংজ্ঞা ঃ

যে পদের দ্বারা কোনো কিছু করা, হওয়া এবং আছে অর্থ বোঝায় তাকে **ক্রিয়াপদ** বলে।

ক্রিয়াপদের শ্রেণিবিভাগ

বাক্যের অবস্থানগত দিক থেকে ক্রিয়াপদ দুই প্রকার — ১. **সমাপিকা ক্রিয়া** ও ২. **অসমাপিকা ক্রিয়া**।

সমাপিকা ক্রিয়া ঃ

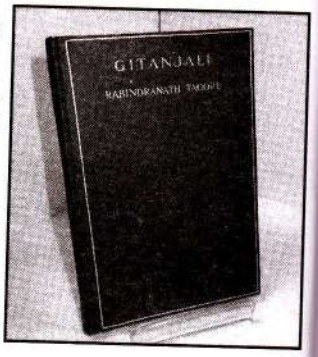

যে ক্রিয়া বাক্যের অর্থকে সম্পূর্ণ করে এবং বলার পর আর কিছুই বাকি থাকে না, তাকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে।

যাব। মেয়েটি **নাচল** ভালো। রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি **লেখেন**। বনে **থাকে** বাঘ। পাখি ফল **খায়**। মাছ জলে **খেলা করে**।

অসমাপিকা ক্রিয়া ঃ

যে ক্রিয়াপদ দ্বারা বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হয় না, বাক্যটিকে পূর্ণ করতে হলে অন্য একটি সমাপিকা ক্রিয়ার জন্য অপেক্ষা করতে হয়, তাকে **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে।

যেমন— আমি বাড়ি **গিয়ে**.....। সে খবরটি **শুনে**.....। **বলেই** সে....। সংসারে **এসে**....। সূর্য **উঠলে**....।

কর্মের অস্তিত্ব অনুসারে ক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ

অন্বয়গত দিক থেকে বা কর্মের অস্তিত্বের বিচারে ক্রিয়াপদকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায় — ১. **সকর্মক ক্রিয়া** ও ২. **অকর্মক ক্রিয়া**।

সকর্মক ক্রিয়া ঃ

যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাকে সকর্মক ক্রিয়া বলে। ক্রিয়াপদকে 'কী' বা 'কাহাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে 'কর্ম' পাওয়া যায়। যেমন— আমি **ভাত** খাই। তোমাকে **খেলনা** দেব। ছেলেরা **বল** খেলছে। রমা **চাঁদ** দেখে। মা আমাকে একটি **বই** দিলেন।

সকর্মক ক্রিয়া যদি দুটি কর্মবিশিষ্ট হয়, তবে তাকে **দ্বিকর্মক ক্রিয়া** বলে। যেমন — দিদিমণি **আমাকে একটি বই** দিলেন।

এখানে 'আমাকে' এবং 'বই' হল কর্ম। 'দিলেন' ক্রিয়াপদের দুটি কর্ম আছে বলে একে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে।

মনে রাখবে, দ্বিকর্মক ক্রিয়ার ব্যক্তিবাচক কর্মকে **গৌণকর্ম** এবং বস্তুবাচক কর্মকে **মুখ্যকর্ম** বলে। ওপরের উদাহরণটিতে 'আমাকে' গৌণকর্ম এবং 'বই' মুখ্য কর্ম।

অকর্মক ক্রিয়া ঃ

যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে না, বাক্যে কর্তাকে অবলম্বন করে ক্রিয়া সংঘটিত হয় তকে **অকর্মক ক্রিয়া** বলে।

যেমন— আমি **আছি**। মেয়েটি **নাচে**। শিশুটি **হাসে**। গাছটি **বাড়ছে**। আমি সাঁতার **কাটব**। এখানে ক্রিয়াপদকে 'কী/কাহাকে' দিয়ে প্রশ্ন করলে কোনো উত্তর পাওয়া যায় না। তাই এগুলি সব **অকর্মক ক্রিয়া**।

➡ **নীচের ছকটি লক্ষ করো ঃ**

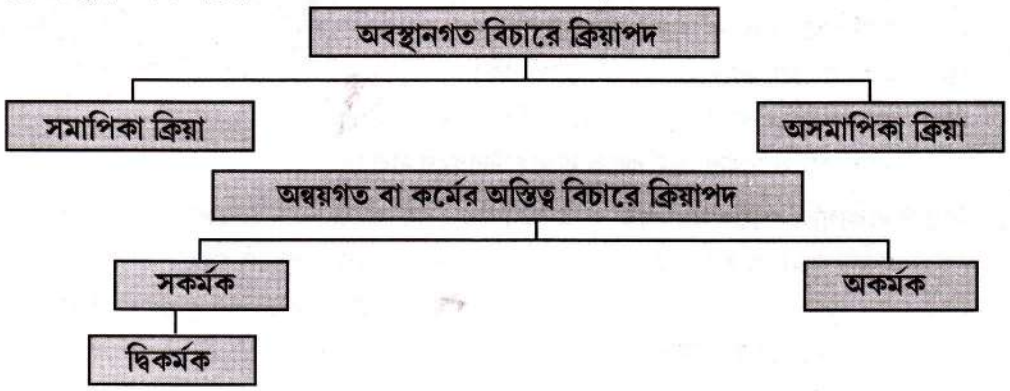

মনে রাখবে ঃ

- যে পদের দ্বারা কোনো কিছু করা, হওয়া এবং আছে অর্থ বোঝায় তাকে **ক্রিয়াপদ** বলে। যেমন — সে মাছ **ধরছে**। আমার একটি কুকুর **আছে**। বৃষ্টি **হচ্ছে** মুষলধারে।
- অবস্থানগত দিক থেকে ক্রিয়াপদ দুই প্রকার — **সমাপিকা ক্রিয়া** ও **অসমাপিকা ক্রিয়া**।
- যে ক্রিয়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করে তাকে **সমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যেমন — ছেলেরা মাঠে বল **খেলছে**।
- যে ক্রিয়া বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণ করে না, সম্পূর্ণ অর্থ পেতে গেলে অন্য একটি সমাপিকা ক্রিয়ার ওপর নির্ভর করতে হয়, তাকে **অসমাপিকা ক্রিয়া** বলে। যেমন— একথা **শুনে**.....। আমি বাড়ি **গিয়ে**.....।
- কর্মের অস্তিত্বের বিচারে ক্রিয়াপদ আবার দু'প্রকার — **সকর্মক ক্রিয়া** এবং **অকর্মক ক্রিয়া** ।
- যে ক্রিয়ার কর্ম থাকে তাকে **সকর্মক ক্রিয়া** বলে। যেমন— রাম বনে **ফুল** পাড়ে। ('ফুল' কর্ম)। মা আমাকে **সন্দেশ** দিলেন। ('আমাকে', 'সন্দেশ' কর্ম)
- যে ক্রিয়ার দুটি কর্ম থাকে তাকে দ্বিকর্মক ক্রিয়া বলে। ব্যক্তিবাচক কর্মকে বলে '**গৌণ**' কর্ম এবং বস্তুবাচক কর্মকে '**মুখ্য**' কর্ম বলে।
- যে ক্রিয়ার কোনো কর্ম থাকে না তাকে **অকর্মক ক্রিয়া** বলে। যেমন— মেয়েটি **নাচে**। মধুমিতা **হাসছে**। শিশুটি **কাঁদছে**।

অনুশীলনী

১। **নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ**

(ক) ক্রিয়াপদ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(খ) অবস্থানগত বিচারে ক্রিয়াপদ কয় প্রকার ও কী কী?
(গ) কর্মের অস্তিত্বের বিচারে ক্রিয়াপদ কয় প্রকার ও কী কী?
(ঘ) সমাপিকা ক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(ঙ) অসমাপিকা ক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(চ) সকর্মক ক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(ছ) অকর্মক ক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(জ) দ্বিকর্মক ক্রিয়া কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
(ঝ) 'মুখ্য' কর্ম ও 'গৌণ' কর্ম কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। **নীচের বাক্যগুলি থেকে সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়া খুঁজে নিয়ে লেখো ঃ**

(ক) একথা শুনে যে অবাক হল।
(খ) বলেই সে চলে গেল।
(গ) যাব, তুমি এলে।
(ঘ) সংসারে এসে শুধু দুঃখই পেলাম।
(ঙ) আমি গিয়ে নিয়ে আসব।

৩। **নীচের বাক্যগুলিকে সকর্মক এবং অকর্মক তালিকায় সাজাও ঃ**

(ক) ছেলেরা বল খেলছে।
(খ) নেচেছিল ইন্দ্রের সভায়।
(গ) মেঘের কোলে রোদ হেসেছে।
(ঘ) মেয়েটি কাঁদছে।
(ঙ) ওরাই ভালো বাসতে জানে।
(চ) কমলবাবু বিমলকে একশো টাকা দিলেন।

সকর্মক ক্রিয়া	অকর্মক ক্রিয়া

৪। **একটি করে সমাপিকা ক্রিয়া বসিয়ে বাক্যগুলিপূর্ণ করো ঃ**

(ক) সে বাড়ি গিয়ে ভাত ——।
(খ) শব্দ শুনে আমরা ——।
(গ) শুনে নিয়ে তবে ——।
(ঘ) দিলে ——।
(ঙ) সত্য কথা বললে তোমাকে একটি পুরস্কার ——।

৫। দুটি দ্বিকর্মক ক্রিয়া যুক্ত বাক্য লেখো এবং মুখ্য কর্ম ও গৌণ কর্ম নির্দেশ করো।

৬। শুধু মুখ্য কর্ম আছে এমন একটি বাক্য লেখো।

৭। শুধু গৌণ কর্ম আছে এমন একটি বাক্য লেখো।

অধ্যায় ৫ ক্রিয়ার কাল

বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' লিখেছিলেন

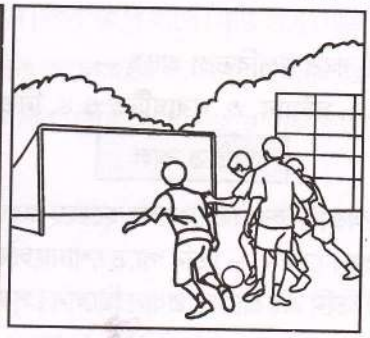

ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলছে

একটু পরেই সূর্য ডুবে যাবে

ওপরের তিনটি ছবিতে তিন রকমের ঘটনা দেখানো হয়েছে। 'বিদ্যাসাগর 'বর্ণপরিচয়' লিখেছিলেন' — অর্থাৎ তাঁর লেখার কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে। 'ছেলেরা মাঠে ফুটবল খেলছে' — অর্থাৎ এখন ছেলেদের খেলা চলছে। 'একটু পরেই সূর্য ডুবে যাবে' — অর্থাৎ সূর্যের ডুবে যাওয়া কাজটি এখনও হয়নি, একটু পরে হবে। তিনটি ক্ষেত্রেই ক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার সময়কে বোঝাচ্ছে। একেই বলে **ক্রিয়ার কাল**।

সংজ্ঞা ঃ ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময়কে **ক্রিয়ার কাল** বলে।

ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার তারতম্য অনুসারে ক্রিয়ার কালকে **তিনভাগে** ভাগ করা হয় ঃ ১. **বর্তমান কাল** ২. **অতীত কাল** এবং ৩. **ভবিষ্যৎ কাল**।

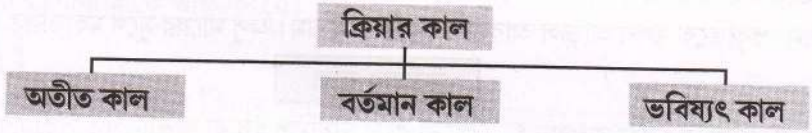

অতীত কাল ঃ

যে ক্রিয়ার কাজ আগেই শেষ হয়েছে তাকে **অতীত কাল** বলে।

যেমন— এক যে ছিল রাজা। আমি স্কুলে গিয়েছিলাম। তিনি গতকাল এসেছিলেন। মেয়েটি গান গেয়েছিল।

বর্তমান কাল ঃ

যে ক্রিয়া চিরকালই ঘটে এবং এখনও ঘটছে সেই ক্রিয়ার কালকে **বর্তমান কাল** বলে।

যেমন — সূর্য ওঠে। পাখি গান গায়। মেয়েটি নাচছে। আমি খেয়েছি। মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছে।

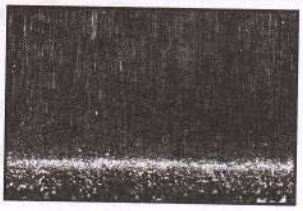

ভবিষ্যৎ কাল ঃ

যে কাজ এখনও হয় নি, ভবিষ্যতে হবে তাকে **ভবিষ্যৎ কাল** বলে।

যেমন — আমি পড়ব। সে আসবে। আগামী কাল রবিবার হবে। এই ছেলেই একদিন বড়ো হবে।

প্রত্যেক ক্রিয়ার কালের আবার চারটি করে উপবিভাগ আছে —

১. **সামান্য বা সাধারণ বা নিত্য,** ২. **ঘটমান,** ৩. **পুরাঘটিত** ও ৪. **নিত্যবৃত্ত**।

অতীত কাল

সামান্য/সাধারণ/নিত্য অতীত ঃ কাজটি সম্পূর্ণভাবে শেষ হয়েছে এবং যার ফল বর্তমানে নেই, তা বোঝাতে ক্রিয়ার **সামান্য বা নিত্য অতীত কাল** হয়। যেমন — তিনি পড়ে শোনালেন। আমরা মন দিয়ে শুনলাম। গতকাল স্কুলে গিয়েছিলাম। এক যে ছিল রাজা। তিনি এই গ্রামের প্রধান ছিলেন। সুনন্দা গান গেয়েছিল।

ঘটমান অতীত ঃ অতীত কালে কিছু সময় ধরে কাজটি চলেছিল বোঝাতে **ঘটমান বর্তমান** কাল হয়।

যেমন — আমি পড়িতেছিলাম। তিনি আমাদের বাংলা বোঝাচ্ছিলেন। আমরা তখন খেলছিলাম। তারা সাঁতার কাটছিল। শীতল বাতাস বইছিল। ছেলেটি লিখিতেছিল।

পুরাঘটিত অতীত ঃ অতীতে কাজটি শেষ হয়েছিল, তার কোনো ফলই বর্তমানে নেই বোঝাতে **পুরাঘটিত অতীত** কাল হয়।

যেমন — সে নেচেছিল। আমি দেখেছিলাম। তুমি একথা বলেছিলে। তারা খেয়েছিল। তারা বলে গেল। আমি গান গেয়েছিলাম।

নিত্যবৃত্ত অতীত ঃ অতীতে যে কাজটি নিয়মিত হত, তার ক্রিয়ার কালকে **নিত্যবৃত্ত অতীত** কাল বলে।

যেমন—আমি মায়ের কোলে বসে গল্প শুনতাম। বাবা রোজ প্রাতঃভ্রমণ করতেন। রবীন্দ্রনাথ মংপুতে ঘরে বসে পাহাড় দেখতেন। প্রকৃতিকে তখন আড়াল আবডাল থেকে দেখতাম। অপু মায়ের মুখে মহাভারত শুনত।

বর্তমান কাল

সামান্য বা সাধারণ বা নিত্য বর্তমান ঃ কোনো কাজ নিয়মিত হয় বা অভ্যাসগত সত্য বোঝালে তাকে **নিত্য বর্তমান** কাল বলে।

যেমন — সে ভাত খায়। আমি রোজ সকালে উঠি। সূর্য পশ্চিমদিকে অস্ত যায়। গোরু আমাদের দুধ দেয়। পাখি ফল খায়। বাঘ বনে থাকে।

ঘটমান বর্তমান ঃ যে কাজ এখন হচ্ছে, তার কালকে **ঘটমান বর্তমান** কাল বলে। এই কাল চেনার উপায় হল ক্রিয়াপদের শেষে 'ছি', 'ছে', 'ছ', 'তেছি', 'তেছে', 'তেছ', 'তেছেন', থাকে।

যেমন— আমি পড়ছি। তাহারা খেলিতেছে। তিনি কাগজ পড়িতেছেন। বৃষ্টি হচ্ছে। সুনীতা গান গাহিতেছে। সূর্য উঠিতেছে।

পুরাঘটিত বর্তমান ঃ কোনো কাজ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু তার ফল এখনও বর্তমান রয়েছে বোঝালে **পুরাঘটিত বর্তমান কাল** হয়। এই কাল চেনার উপায় হল ক্রিয়ার শেষে, 'আছি', 'আছ', 'আছে', 'আছেন', থাকে।

যেমন— আমি ভাত খেয়েছি। তাহারা কলকাতায় গিয়াছে। তিনি পড়িয়াছেন। সুবল খবরটি শুনেছে। সে চাকরি পেয়েছে। আমি গীতা পড়েছি।

ভবিষ্যৎ কাল

সামান্য/সাধারণ/নিত্য ভবিষ্যৎ ঃ যে ক্রিয়া ভবিষ্যতে ঘটবে তাকে **সামান্য বা সাধারণ বা নিত্য ভবিষ্যৎ** কাল বলে।

যেমন—আমি খেলব। তারা আসবে। দীপু স্কুলে যাবে। বৃষ্টি হবে। ঝড় উঠবে। এবার পুজোয় মজা হবে।

ঘটমান ভবিষ্যৎ ঃ কাজটি ভবিষ্যৎ কালে হতে থাকবে বোঝালে ক্রিয়ার **ঘটমান ভবিষ্যৎ** কাল হয়।

যেমন— আমি বিকালে খেলতে থাকব। তুমি রাতে পড়তে থাকবে। সে লিখতে থাকবে। আমি শুনতে থাকব। নির্মাল্য আসতে থাকবে।

পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ঃ অতীত কালে কোনো কাজ হয়তো ঘটতে থাকবে বা বর্তমানে হয়তো হয়েছে, এরূপ সন্দেহ বোঝালে ক্রিয়ার **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ** কাল হয়।

যেমন— তারা এতক্ষণে পৌঁছিয়ে থাকবে। বাবা আসার আগে কাজটি সেরে রাখব। সে হয়তো একথা বলে থাকবে। গ্লাসটা তুমিই হয়তো ভেঙে থাকবে।

মনে রাখবে, পুরাঘটিত ভবিষ্যৎকে সন্দিগ্ধ অতীত কালও বলা হয়।

ক্রিয়ার অনুজ্ঞাভাব বলেও একটা বিষয় আছে। এই বিষয়টি শুধু বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কালেই হয়। এই অনুজ্ঞা ভাব দুই প্রকার — ১. **বর্তমান কালের অনুজ্ঞা** এবং ২. **ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা**।

বর্তমান কালের অনুজ্ঞা ঃ বর্তমান কালে অনুরোধ, আদেশ, নির্দেশ, অনুরোধ প্রভৃতি বোঝাতে **বর্তমান কালের অনুজ্ঞা** হয়। যেমন— অঙ্কটি করো। বাড়ি যাও। খেয়ে নাও। তাড়াতাড়ি এসো। উঠে দাঁড়াও। আমাকে সাহায্য করুন।

ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা ঃ ভবিষ্যৎ কালের জন্য কোনো আদেশ, অনুরোধ, উপদেশ ইত্যাদি বোঝালে **ভবিষ্যৎ কালের অনুজ্ঞা** হয়। যেমন — সদা সত্য কথা বলবে। গুরুজনদের কথা শুনবে। কাল দেখা করবে। মন দিয়ে পড়াশুনা করবে। বাবা মাকে ভক্তি করবে।

মনে রাখবে ঃ

- ক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সময়কে **ক্রিয়ার কাল** বলে।
- ক্রিয়ার কাল তিন প্রকার— ১. **বর্তমান কাল**, ২. **অতীত কাল** ও ৩. **ভবিষ্যৎ কাল**।
- প্রত্যেক কালের আবার চারটি ভাগ—১. **সাধারণ বা নিত্য**, ২. **ঘটমান** ৩. **পুরাঘটিত** ও ৪. **নিত্যবৃত্ত**।
- বর্তমান কালের তিনটি ভাগ—
  - (ক) **সাধারণ বা নিত্য বর্তমান ঃ** সে যায়। তারা খেলে। গোরু দুধ দেয়। সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে।
  - (খ) **ঘটমান বর্তমান ঃ** আমি পড়ছি। তারা খেলছে। পাখিরা গান গাইছে। শিশুটি কাঁদছে।
  - (গ) **পুরাঘটিত বর্তমান ঃ** আমি শুনেছি । তুমি খেয়েছ। সে গিয়েছে। আপনি বলেছেন।
- অতীত কালের চারটি ভাগ —
  - (ক) **সাধারণ বা নিত্য অতীত ঃ** আমি লিখেছিলাম। তুমি বলেছিলে। সে গিয়েছিল।
  - (খ) **ঘটমান অতীত ঃ** তুমি খেলছিলে। তারা দৌড়াচ্ছিল। তিনি বলছিলেন।
  - (গ) **পুরাঘটিত অতীত ঃ** বেহুলা নেচেছিল । তিনি বললেন। রাম লিখল।
  - (ঘ) **নিত্যবৃত্ত অতীত ঃ** আমি রোজ সাঁতার কাটতাম। বাবা রোজ প্রাতঃভ্রমণ করতেন। বাড়ি থেকে দূরের আকাশ দেখতাম।

■ ভবিষ্যৎ কালের তিনটি ভাগ —

(ক) **নিত্য বা সাধারণ ভবিষ্যৎ ঃ** আমি খেলব। তিনি আসবেন। সূর্য উঠবে।

(খ) **ঘটমান ভবিষ্যৎ ঃ** আমি খেলতে থাকব। তিনি শুনতে থাকবেন। তারা আসতে থাকবে।

(গ) **পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ ঃ** সে এতক্ষণে পৌঁছে থাকবে। রামই হয়ত একাজ করে থাকবে। তুমি হয়ত একথা বলে থাকবে।

■ **বর্তমান অনুজ্ঞা ঃ** আমার সঙ্গে এসো। মন দিয়ে পড়ো। বইটি দাও।

■ **ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা ঃ** সদা সত্য কথা বলবে। গুরুজনদের কথা মন দিয়ে শুনবে। সময়ের কাজ সময়ে করবে।

অনুশীলনী

১। **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ**

ক) ক্রিয়ার কাল কয়প্রকার ও কী কী? খ) প্রত্যেক প্রকার ক্রিয়ার কালের একটি করে উদাহরণ দাও। গ) প্রত্যেক ক্রিয়ার কালকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী? ঘ) ঘটমান বর্তমান কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও। ঙ) সাধারণ অতীত কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও। চ) পুরাঘটিত বর্তমান কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও। ছ) পুরাঘটিত ভবিষ্যৎ কাল কাকে বলে? উদাহরণ দাও। জ) বর্তমান অনুজ্ঞা কাকে বলে? উদাহরণ দাও। ঝ) ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা কাকে বলে। উদাহরণ দাও। ঞ) পুরাঘটিত অতীত ও পুরাঘটিত বর্তমান কালের পার্থক্য কী?

২। **সাধারণ বা নিত্য, ঘটমান এবং পুরাঘটিত — এই তিন প্রকার ভাগ উল্লেখ করে নীচের বাক্যগুলির ক্রিয়ার কাল নির্ণয় করো ঃ**

ক) তারা খেলতে থাকবে। খ) তুমিই একথা বলেছিলে। গ) ছেলেরা খেলতে যাবে।
ঘ) সূর্য অস্ত গেল। ঙ) বৃষ্টি হচ্ছে। চ) সে নেচেছিল।
ছ) তিনি পড়ছিলেন। জ) 'আবার আসিব ফিরে।' ঝ) 'বনে থাকে বাঘ'।
ঞ) আমি চিড়িয়াখানা দেখেছি।

৩। **কেবলমাত্র বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যৎ কাল উল্লেখ করো ঃ**

বাক্য	ক্রিয়ার কাল
(ক) মাছ জলে খেলা করে।	(ক)
(খ) পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে।	(খ)
(গ) একথা হয়ত তুমিই বলেছিলে।	(গ)
(ঘ) গল্পটা সবাই জানে।	(ঘ)
(ঙ) তিনি আবার দিল্লি যাবেন।	(ঙ)
(চ) সূর্য আলো ও তাপ দেয়।	(চ)

৪। **কেবলমাত্র নিত্য বা সাধারণ, ঘটমান, পুরাঘটিত, নিত্যবৃত্ত এবং অনুজ্ঞা লেখো ঃ (বর্তমান, অতীত, ভবিষ্যৎ লেখার প্রয়োজন নেই)।**

ক) শুনেছি তিনি ভালো গান করেন। ঘ) বড়োর কথা মান্য করবে। ছ) আমি তখন খেলছিলাম।
খ) আজ বৃষ্টি হবে। ঙ) বইটি দাও। জ) শরতে পদ্মফুল ফোটে।
গ) তুমিই হয়ত একাজ করে থাকবে। চ) তুমি গেয়েছিলে ভালো। ঝ) তুমি নিশ্চয় নেতাজির নাম শুনেছ।
ঞ) বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ স্কুল পালাতেন।

অধ্যায় ৬ বচন

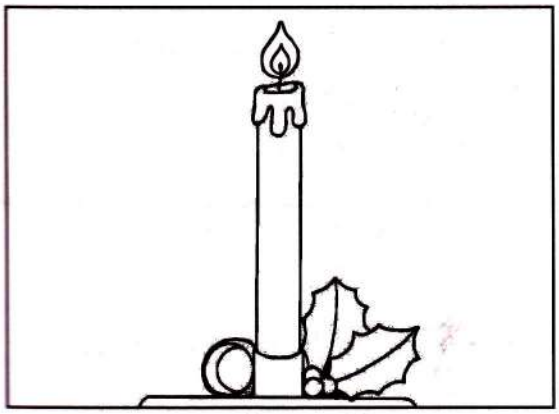

একটি মোমবাতি

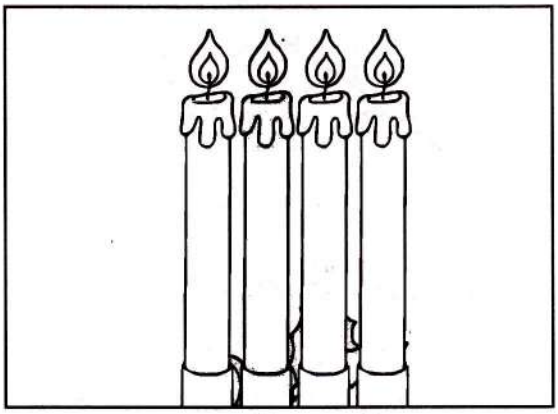

অনেকগুলি মোমবাতি

ওপরের প্রথম ছবিতে একটি মোমবাতি দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় ছবিতে অনেকগুলি মোমবাতি দেখানো হয়েছে। ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বোঝাতে **বচন** শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

বচনের সংজ্ঞা ঃ

কোন জায়গায় কটি ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণী আছে, সেই সম্বন্ধে অনেক সময়েই আমাদের ধারনা নেবার প্রয়োজন হয়। যার দ্বারা ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বোঝায় তাকে **বচন** বলে।

এই সংখ্যা এক থেকে শুরু করে দুই, তিন, হাজার , লক্ষ বা অসংখ্য হতে পারে। তার অর্থ এই নয় যে, বচনও অসংখ্য হয়।

বচন দু'প্রকার —১. **একবচন** ও ২. **বহুবচন**।

প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় বচন তিন প্রকার। যেমন— ১. **একবচন**, ২. **দ্বিবচন** ও ৩. **বহুবচন**। কিন্তু আধুনিক বাংলা ভাষায় বচন দুই প্রকার।

■ ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা একটি বোঝালে **একবচন** হয়।

■ ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা একের বেশি বোঝালে **বহুবচন** হয়।

পাশের ছবিতে 'একটি পাখি' হল একবচন, আর 'অনেকগুলো পাখি' হল বহুবচন।

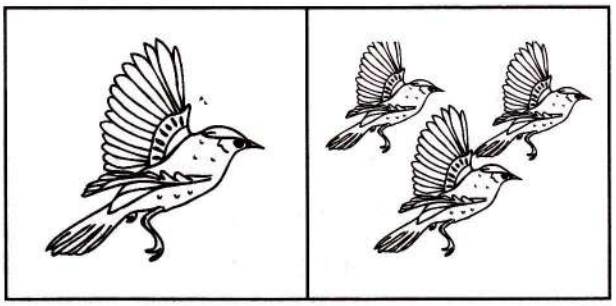

মনে রাখবে ঃ

বিশেষ্য এবং সর্বনাম পদেরই কেবল মাত্র বচন হয়, অন্য কোনো পদের হয় না।

একটি পাতা — একবচন

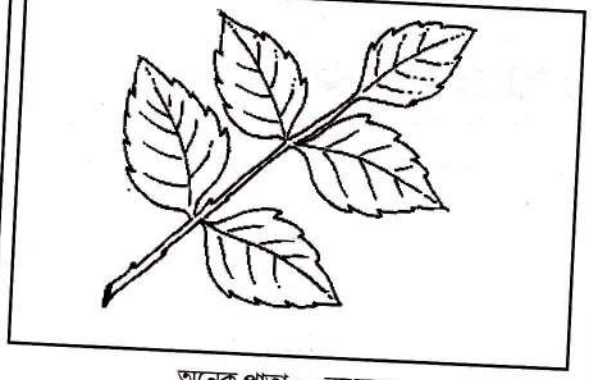

অনেক পাতা — বহুবচন

বাংলায় একবচন বোঝানোর নিয়ম ঃ

১। 'এক' শব্দটি দ্বারা একবচনকে বোঝায়। তাই পদের আগে **এক, একটি, একটা, একখানি, একখানা, একগাছি, একগাছা** ইত্যাদি বসিয়ে **একবচন** বোঝানো হয়।

যেমন — **এক** রাজা ছিলেন। **একটা** পাখি ডালে বসে আছে। **একটি** বালক লিখিতেছে। **একখানা** রুটি দাও। **একগাছা** লাঠি সঙ্গে নিও।

২। বিশেষ্য পদের পরে **টি, টা, খানি, খানা, গাছি, গাছা** বসিয়ে **একবচন** বোঝানো হয়।

যেমন— **পাখিটি** গান গাইছে। **কলমটা** কোথায় গেল? **চিঠিখানা** বাক্সে ফেলে দিও। **লাঠিগাছা** দাও তো দেখি। **লোকটা** দাদু জানে।

৩। পদের আগে বা পরে কিছু না বসিয়েও **একবচন** বোঝানো হয়।

যেমন — **পৃথিবী** সূর্যের চারিদিকে ঘোরে। **চাঁদ** একটি উপগ্রহ। **সূর্য** আলো ও উত্তাপ দেয়। **একথা** কেউ বিশ্বাস করবে না। **ইনি** আমার শিক্ষক। **তিনি** একজন কবি। **সে** আমার বন্ধু।

বাংলায় বহুবচন বোঝানোর নিয়ম ঃ

১। পদের শেষে **রা, এরা, দের, দিগের, গুলি, গুলা** ইত্যাদি যোগ করে বহুবচন বোঝানো হয়।

যেমন— **আমরা** ছাত্রদল। '**তোমরা** আমাকে রক্ত দাও...।' **ছেলেরা** মাঠে খেলছে। **দেবতারা** একাজ পারেন না। ফটিক ছিল **বালকদের** সর্দার। বেচারা **গোরুগুলো** গরমে বড্ড কষ্ট পাচ্ছে।

২। পদের শেষে **গণ, কুল, বৃন্দ, আদি, সকল, বর্গ, রাশি, সমূহ, সমুদয়, মালা, মণ্ডল, মণ্ডলী, রাজি** ইত্যাদি বসিয়ে বহুবচন বোঝানো হয়।

যেমন — **ঋষিকুল** তপোবনে বাস করতেন। **শিক্ষকগণ** আমাদের প্রণম্য। **অভিভাবকবৃন্দ** সভায় উপস্থিত হলেন। **বন্ধুমহলে** সে খুব জনপ্রিয়। সারি সারি **বৃক্ষরাজি** শোভা পাচ্ছে। **মেঘমালা** ভেসে চলেছে। **শ্রোতৃমন্ডলী** সভায় বসে আছেন। দেশ বিদেশের **রাজন্যবর্গ** সমবেত হলেন।

৩। অনেক সময় বিশেষ্য পদকে পরপর দু'বার ব্যবহার করেও **বহুবচন** বোঝানো হয়।
যেমন — **জন জনে** মেলায় চলেছে। **গাছে গাছে** ফুল ফুটেছে। **বাড়ি বাড়ি** এখন সর্দি কাশি। **পাতায় পাতায়** ডাল ভরে গেল।

৪। অনেক সময় বিশেষণ পদকে পরপর দু'বার বসিয়েও **বহুবচন** বোঝানো হয়।
যেমন—**ছোটো ছোটো** গ্রাম। **বড়ো বড়ো** বাড়ি। **উচুঁ উচুঁ** পাহাড়। **কচি কচি** পাতা।

কিছু সর্বনাম পদের একবচন ও বহুবচনের রূপ দেখান হল ঃ

একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন	একবচন	বহুবচন
আমি	আমরা	আমাকে	আমাদিগকে	তোমার	তোমাদের
তুমি	তোমরা	তুই	তোরা	তোমাকে	তোমাদিগকে
সে	তারা	আপনার	আপনাদের	ওকে	ওদেরকে
আপনি	আপনারা	তার	তাদের	তাকে	তাদেরকে
তিনি	তাঁরা	তাঁর	তাঁদের	ওটি	ওগুলি
ইহা	ইহারা	উহা	উহারা	ওর	ওদের
ঐ	ঐগুলি	ও	ওরা	যিনি	যাঁরা
মোর	মোদের	আমার	আমাদের	কে	কারা
কার	কাদের	এই	এইগুলি	আপনাকে	আপনাদিগকে

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ

- পদের আগে যদি সংখ্যা বাচক বিশেষণ বসে তাহলে বহুবচনের চিহ্ন যোগ করতে হয় না।
  যেমন — **দশজন** মানুষ (মানুষেরা নয়)।
- শব্দকে দু'বার পাশাপাশি ব্যবহার করে বহুবচন করা হলে বহুবচনের চিহ্ন যোগ করতে হয় না।
  যেমন — **ছোটো ছোটো** ছেলে (ছেলেরা নয়)।
- বচন অনুসারে ক্রিয়াপদের কোনো পরিবর্তন হয় না।
  যেমন —**সে** খেলে। **তারা** খেলে।**পাখিটি** গান গায়।**পাখিরা** গান গায়।

মনে রাখবে ঃ

- যার দ্বারা কোন ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণীর সংখ্যা বিষয়ে আমাদের বোধ জন্মায় তাকে **বচন** বলে।
- বচন দুই প্রকার — **একবচন** ও **বহুবচন**।
- একবচনের চিহ্ন হল — **এক, একটা, একটি, একখানা, একখানি, গাছা, গাছি, টি, টা, খানা** প্রভৃতি।
- বহুবচনের চিহ্ন হল — **রা, এরা, দের, দিগের, বৃন্দ, গণ, সভা, মহল, রাজি, রাশি, সমূহ, গুলি, গুলি** ইত্যাদি।
- বিশেষ্য ও সর্বনাম পদেরই কেবল বচন হয়।

অনুশীলনী

১। **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ**

(ক) বচন কাকে বলে? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

(খ) বচন কয় প্রকার ও কী কী? উদাহরণ দাও।

(গ) একবচন কাকে বলে? একবচনের বিভক্তিগুলি লেখো।

(ঘ) বহুবচন ককে বলে? বহুবচনের বিভক্তিগুলি লেখো।

(ঙ) পাঁচটি সর্বনাম পদের একবচন ও বহুবচনের উদাহরণ দাও।

২। **নীচের বিভক্তি যোগে একবচনের শব্দ তৈরি করো এবং তার দ্বারা বাক্যরচনা করো ঃ**

টি, খানা, এক, গাছা, একখানা, টা, একগাছি।

৩। **নীচের বিভক্তি যোগে বহুবচনের শব্দ তৈরি করো এবং তার দ্বারা বাক্যরচনা করো ঃ**

রা, দের, সমূহ, গণ, রাজি, সমূহ, বর্গ, বৃন্দ, কুল, মালা।

৪। **স্থূলাক্ষর পদগুলি কোন্ বচন লেখো ঃ**

(ক) **নদীসমূহ** ফুলে উঠেছে।

(খ) **পক্ষীকুল** বাসায় ফিরিতেছে।

(গ) অদূরে শ্রেণিবদ্ধ **বৃক্ষরাজি** দৃশ্যমান হল।

(ঘ) **শ্রোতৃমন্ডলী** হাততালি দিল।

(ঙ) **একখানা** বই নিয়ে এসো।

(চ) **লাঠিগাছাটা** দাও তো।

(ছ) **গুণিজনকে** সর্বদা সম্মান দেবে।

(জ) রাজার সঙ্গে চললেন তার **পরিষদবর্গ**।

(ঝ) **বাড়িটা** ভেঙে পড়বে।

(ঞ) **তারা** ফিরে গেল।

৫। **নীচের শব্দগুলো দ্বিত্ব (দু'বার) করে বহুবচনের রূপ দেখাও ঃ**

বাড়ি, ভালো, টাকা, কে, ফুলে, পাতায়, জনে, গাছে।

৬। **নীচের সর্বনাম পদ গুলির বহুবচনের রূপ লেখো ঃ**

যে, তিনি, সে, আমি, আপনি, এটা, ওটা, মোর, তুই, তোর, তোমার, তাঁর, তোমাকে।

৭। **বাক্যে প্রয়োগ দেখাও ঃ**

কেশদাম, সভ্যমন্ডলী, গুণিগণ, বন্ধুমহল, মেঘমালা, বৃক্ষরাজি, বালকবৃন্দ, ছাতাখানা, লাঠিগাছা, আসবাবপত্রসমূহ।

৮। **বহুবচনের রূপ লেখো ঃ**

একবচন	বহুবচন
মেঘ	
তারকা	
অতিথি	
কেশ	

একবচন	বহুবচন
সে	
তিনি	
আপনি	
বৃক্ষ	

একবচন	বহুবচন
ওটা	
তাকে	
তোর	
মেঘ	

অধ্যায় ৭ পুরুষ

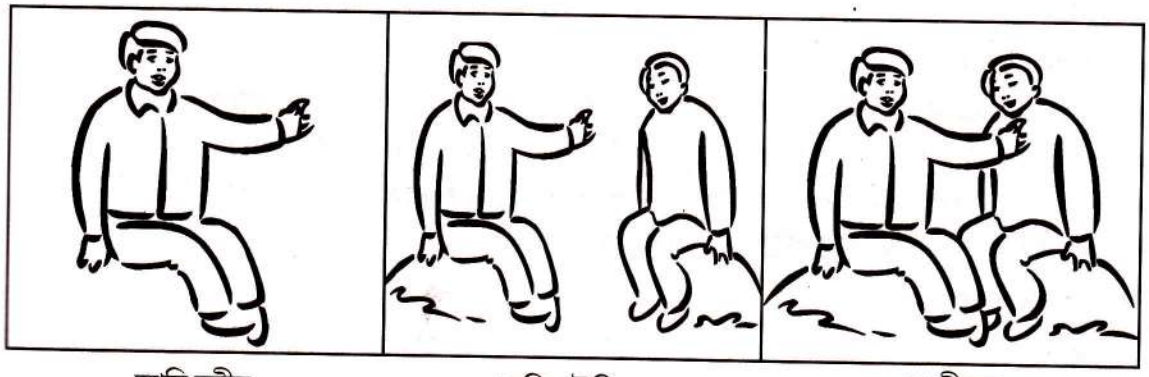

আমি নবীন | তুমি কৌশিক | সে হীরক

প্রথম ছবিতে বক্তা নিজের সম্বন্ধে বলছে। সেই জন্য '**আমি**' পদটি ব্যবহার করেছে। দ্বিতীয় ছবিতে বক্তা তার সামনে উপস্থিত ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলছে; তাই '**তুমি**' পদটি ব্যবহার করেছে। আর তৃতীয় ছবিতে বক্তা এমন একজনের সম্বন্ধে বলছে যে সামনে উপস্থিত নেই। তাই '**সে**' পদটি ব্যবহার করেছে। '**আমি**', '**তুমি**' ও '**সে**' — এই পদগুলি হল পুরুষ। মনে রাখবে, ব্যাকরণে পুরুষ বলতে কোনো পুরুষ মানুষকে বোঝায় না।

সংজ্ঞা ঃ শব্দের যে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বক্তাকে, শ্রোতাকে বা এই দু'জন ছাড়া অন্য কাউকে নির্দেশ করা হয়, তাকেই বলা হয় **পুরুষ**। এরজন্য বাক্যে ক্রিয়ার রূপের পরিবর্তন ঘটে। অর্থাৎ বক্তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রিয়ার রূপও পাল্টে যায়।

বাংলা ব্যাকরণে পুরুষ তিন প্রকার—১. **উত্তম পুরুষ**, ২. **মধ্যম পুরুষ** ও ৩. **প্রথম পুরুষ**।

উত্তম পুরুষ ঃ

বক্তা যখন নিজের পক্ষ নিয়ে বলে তখন বাক্যের উদ্দেশ্য (Subject) হয় '**উত্তম পুরুষ**'।

যেমন — **আমি** বই পড়ি। '**আমরা** ছাত্রদল।' '**মোরা** একই বৃন্তে দুটি কুসুম...।' '**মোদের** গরব, মোদের আশা।'

এখানে '**আমি**', '**আমরা**', '**মোরা**', '**মোদের**' হল উত্তম পুরুষ। এছাড়াও উত্তম পুরুষের উদাহরণ হল **আমাকে**, **আমাদের**, **আমারে**, **মম**, **মোর** ইত্যাদি।

মধ্যম পুরুষ ঃ

বক্তা যখন শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলে তখন বাক্যের (Subject) হয় **মধ্যম পুরুষ**।

যেমন — **তুমি** খেলছ। **তুই** কেমন আছিস? **আপনি** আমার প্রণাম নেবেন। **তোমরা** কী করছ? **আপনারা** বসুন।

এখানে 'তুমি', 'তুই', 'আপনি', 'তোমরা', 'আপনারা' হল মধ্যম পুরুষ। এছাড়াও মধ্যম পুরুষের উদাহরণ হল — তোমাকে, তোমার, তোমাদের, তোমা, তোমাতে, আপনাকে, আপনার, আপনাদের, তোকে, তোদের, তোর ইত্যাদি।

প্রথম পুরুষ ঃ

বক্তা যখন অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তির উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলে, তখন তাকে **প্রথম পুরুষ** বলে।

যেমন — **সে** বল খেলছে। **তারা** গান শুনছে। **উনি** বই পড়ছেন। **সুমন** অঙ্ক কষছে।

এখানে সে, তারা, ইনি, উনি, সুমন হল প্রথম পুরুষ। এছাড়াও প্রথম পুরুষের উদাহরণ হল—তিনি, তাঁরা, তাকে, তাঁকে, তার, তাঁর, রাম, রহিম, সূর্য, চাঁদ, গোরু ইত্যাদি।

মনে রাখবে ঃ

■ সর্বনাম ছাড়াও প্রথম পুরুষে **বিশেষ্য পদও** ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উত্তম ও মধ্যম পুরুষে কেবলমাত্র **সর্বনাম পদই** ব্যবহৃত হয়। তাই বলা হয়, উত্তম ও মধ্যম পুরুষ ছাড়া পৃথিবীর যাবতীয় ব্যক্তি বা বস্তু হল প্রথম পুরুষ। পুরুষের সঙ্গে ক্রিয়ার যোগ থাকায় পুরুষের রূপভেদে ক্রিয়ার রূপও পৃথক হয়।

বিভিন্ন পুরুষের একবচন ও বহুবচনের রূপ

	পুরুষ	ক্রিয়ার রূপ
উত্তম পুরুষ	আমি	পড়ি।
	আমরা	পড়ি।
	আমাকে	পড়তে হবে।
মধ্যম পুরুষ	তুমি	পড়।
	তোমরা	পড়।
	আপনি	পড়েন।
প্রথম পুরুষ	সে	পড়ে।
	তিনি	পড়েন।
	রাম	পড়ে।

মনে রাখবে ঃ

■ শব্দের যে বৈশিষ্ট্যের দ্বারা বক্তাকে, শ্রোতাকে বা এই দু'জন ছাড়া অন্য কাউকে নির্দেশ করা হয়, তাকে **পুরুষ** বলা হয়।

■ পুরুষ তিন প্রকার—১. **উত্তম পুরুষ**, ২. **মধ্যম পুরুষ** ও ৩. **প্রথম পুরুষ**।

■ বক্তা যখন নিজের পক্ষ নিয়ে কিছু বলে তখন বাক্যে উদ্দেশ্য (Subject) হয় উত্তম পুরুষ।
যেমন—আমি, আমরা, আমাদের, মোরা, মোদের, মম ইত্যাদি।

- বক্তা যখন শ্রোতাকে উদ্দেশ্য করে কিছু কথা বলে তখন বাক্যের উদ্দেশ্য (Subject) হয় মধ্যম পুরুষ। যেমন—তুমি, তোমরা, আপনি, তুই, আপনারা, তোরা, তোমাদের ইত্যাদি।
- বক্তা যখন অনুপস্থিত কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর নাম এবং সেই নামের পরিবর্তে যে সর্বনামটি ব্যবহার করে, তখন তাকে **প্রথম পুরুষ** বলে।

  যেমন—সে, তারা, উনি, সুমন, রাম, তাকে, তাদের ইত্যাদি।
- উত্তম ও মধ্যম পুরুষে কেবল সর্বনাম পদই ব্যবহৃত হয়। প্রথম পুরুষে সর্বনাম পদ ছাড়াও বিশেষ্য পদ ব্যবহৃত হয়।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

(ক) পুরুষ কাকে বলে?
(খ) পুরুষ কয় প্রকার ও কী কী?
(গ) উত্তম পুরুষ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(ঘ) মধ্যম পুরুষ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(ঙ) প্রথম পুরুষ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। নীচের পদগুলি কোন্ পুরুষ লেখো ঃ

সে, তিনি, আমরা, তারা, আপনি, আপনাকে, সুরেশ, রহিম, ছেলেরা, মম, মোরা, মোদের, সূর্য, চাঁদ।

৩। অপ্রয়োজনীয় পদটি বাদ দাও ঃ

(ক) উত্তম পুরুষ—মোরা, আমরা, তুই, আমাদিগকে।
(খ) মধ্যম পুরুষ—তোমরা, আপনি, তিনি, তোমাদের।
(গ) প্রথম পুরুষ—রাম, সে, চাঁদ, মম।

৪। নীচের পুরুষগুলির বহুবচন করো ঃ

মোরা, তিনি, তুই, রহিম, আমাকে, তাকে, তাঁকে, ওকে, তুমি, তোর।

৫। নীচের বাক্যগুলো থেকে পুরুষ খুঁজে নিয়ে ছকের নির্দিষ্ট ঘরে বসাও ঃ

(ক) 'মোদের গরব, মোদের আশা'।
(খ) 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম।'
(গ) তাঁহার খ্যাতি বিশ্বব্যাপী।
(ঘ) রমেশ ফুটবল খেলে।
(ঙ) তোমরা আমার বন্ধু।

উত্তম পুরুষ	মধ্যম পুরুষ	প্রথম পুরুষ

অধ্যায় ৮ লিঙ্গ

ছেলেটি পড়ছে। মেয়েটি নাচছে। শিশুটি হাসছে। গাছটি বেশ লম্বা।

লিঙ্গ শব্দটির অর্থ হল চিহ্ন। প্রকৃতিতে আমরা যত রকমের ব্যক্তি, বস্তু বা প্রাণী দেখি, তাদের পুরুষ, স্ত্রী অথবা ক্লীব-এই তিনটি শ্রেণিতেই ভাগ করা যায়। ওপরের চারটি ছবি লক্ষ করো। প্রথম ছবিতে **ছেলেটি পড়ছে।** 'ছেলেটি' পদটির দ্বারা পুরুষ জাতীয় কোনো ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে। দ্বিতীয় ছবিটিতে **মেয়েটি নাচছে।** 'মেয়েটি' পদটি দ্বারা স্ত্রী-জাতীয় কোনো ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে। তৃতীয় ছবিতে **শিশুটি হাসছে।** 'শিশুটি' পদটির দ্বারা নারী-পুরুষ উভয় জাতীয় কোনো ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে। চতুর্থ ছবিতে **'গাছটি'** পদের দ্বারা নারী-পুরুষ কোনোটিই নয়-এমন একটি জিনিসকে বোঝানো হচ্ছে। যে পদের দ্বারা পুরুষ, নারী অথবা এদের কোনোটিকেই না বুঝিয়ে অন্য কোনো জিনিসকে নির্দেশ করে তাকে **লিঙ্গ** বলে।

লিঙ্গের সংজ্ঞা ঃ

যে পদের দ্বারা পুরুষ, স্ত্রী বা পুরুষ-স্ত্রী কাউকেই বোঝায় না তাকে **লিঙ্গ** বলে।

ওপরের ছবির তারতম্য অনুযায়ী লিঙ্গ চার প্রকার—১. **পুংলিঙ্গ**, ২. **স্ত্রীলিঙ্গ**, ৩. **উভয়লিঙ্গ** এবং ৪. **ক্লীবলিঙ্গ**।

পুংলিঙ্গ ঃ প্রাণীবাচক যে বিশেষ্য পদের দ্বারা কেবলমাত্র পুরুষ জাতিকে বোঝায়, তাকে **পুংলিঙ্গ** বলে।
যেমন — বালক, বাবা, শিক্ষক, ছেলে, দাদা, ভাই, গায়ক, পাঠক, সিংহ, বাঘ ইত্যাদি।

স্ত্রীলিঙ্গ ঃ প্রাণীবাচক যে বিশেষ্য পদের দ্বারা কেবলমাত্র স্ত্রী জাতিকে বোঝায়, তাকে **স্ত্রীলিঙ্গ** বলে।
যেমন— বালিকা, মা, শিক্ষিকা, মেয়ে, দিদি, বোন, গায়িকা, পাঠিকা, সিংহী, বাঘিনী ইত্যাদি।

উভয়লিঙ্গ ঃ প্রাণীবাচক যে বিশেষ্য পদের দ্বারা পুরুষ-স্ত্রী উভয়কেই বোঝায় তাকে **উভয়লিঙ্গ** বলে।
যেমন — শিশু, সন্তান, প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মানুষ, বাদুর, কবি ইত্যাদি।

ক্লীবলিঙ্গ ঃ অপ্রাণীবাচক যে শব্দের দ্বারা পুরুষ বা স্ত্রী কাউকেই বোঝায় না তাকে **ক্লীবলিঙ্গ** বলে।
যেমন — টেবিল, চেয়ার, গাছ, আকাশ, চাঁদ, সূর্য, পাহাড় ইত্যাদি।

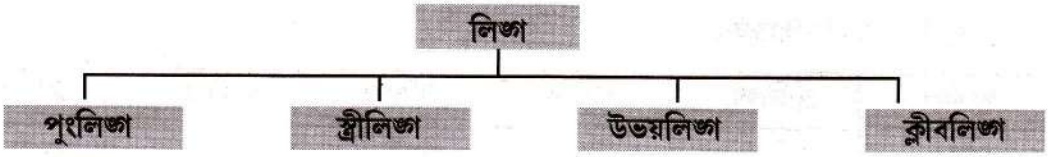

মনে রাখবে ঃ

■ কতকগুলি শব্দ আছে যাদের স্ত্রীলিঙ্গ হয় না, তারা সবসময়ই পুংলিঙ্গবাচক শব্দ, এদের বলা হয় **নিত্য পুংলিঙ্গ** শব্দ।

যেমন— সভাপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, বিপত্নীক, কবি ইত্যাদি।

■ আবার কতকগুলি শব্দ আছে যাদের কখনও পুংলিঙ্গ হয় না, তারা সবসময়ই স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দ, এদের বলা হয় **নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ** শব্দ।

যেমন— বিধবা, অঙ্গনা, সধবা ইত্যাদি।

লিঙ্গ পরিবর্তন ঃ

পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গে এবং স্ত্রীলিঙ্গ থেকে পুংলিঙ্গবাচক শব্দে রূপান্তরকে **লিঙ্গ পরিবর্তন** বলে। ক্লীবলিঙ্গ শব্দের কখনও লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না।

বাংলা ভাষায় লিঙ্গ পরিবর্তনের কিছু নিয়ম আছে। এগুলি হল—

১। পুংলিঙ্গবাচক শব্দের শেষে **'আ', 'ই', 'ঈ','নী','নি', আনী** ইত্যাদি প্রত্যয় যোগ করে।

২। স্ত্রীবাচক শব্দ যোগ করে।

৩। পৃথক শব্দ বসিয়ে।

লিঙ্গ পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ লক্ষ করো ঃ

১. 'আ' যোগে লিঙ্গান্তর ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অনাথ	অনাথা	প্রাচীন	প্রাচীনা	সভ্য	সভ্যা
প্রথম	প্রথমা	প্রিয়	প্রিয়া	শিষ্য	শিষ্যা
চপল	চপলা	প্রবীণ	প্রবীণা	চঞ্চল	চঞ্চলা
বৃদ্ধ	বৃদ্ধা	নিপুণ	নিপুণা	কান্ত	কান্তা
কৃশ	কৃশা	মহাশয়	মহাশয়া	অসহায়	অসহায়া
কোকিল	কোকিলা	মৃত	মৃতা	ভীত	ভীতা
কৃপণ	কৃপণা	মাননীয়	মাননীয়া	চতুর	চতুরা
শ্রেষ্ঠ	শ্রেষ্ঠা	নবীন	নবীনা	পূজনীয়	পূজনীয়া
জ্যেষ্ঠ	জ্যেষ্ঠা	সরল	সরলা	কল্যাণীয়	কল্যাণীয়া
আর্য	আর্যা	দ্বিতীয়	দ্বিতীয়া	অজ	অজা

২. ই, ঈ যোগে লিঙ্গান্তর ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ছাত্র	ছাত্রী	সুন্দর	সুন্দরী	তরুণ	তরুণী
পাত্র	পাত্রী	কুমার	কুমারী	মানব	মানবী
দূত	দূতী	কিশোর	কিশোরী	চাতক	চাতকী
সিংহ	সিংহী	ময়ূর	ময়ূরী	কপোত	কপোতী
মামা	মামি	হরিণ	হরিণী	রাক্ষস	রাক্ষসী
কাকা	কাকি	তাপস	তাপসী	বৈষ্ণব	বৈষ্ণবী
চাচা	চাচি	নর্তক	নর্তকী	মোরগ	মুরগী
নানা	নানি	হংস	হংসী	নারায়ণ	নারায়ণী
বানর	বানরী	কিন্নর	কিন্নরী	ব্রাহ্মণ	ব্রাহ্মণী
ভেড়া	ভেড়ী	পাগল	পাগলি	পিতামহ	পিতামহী
খোকা	খুকি	দেব	দেবী	নদ	নদী
ষোড়শ	ষোড়শী	দাস	দাসী	শঙ্কর	শঙ্করী
নট	নটী	গোপ	গোপী	কিঙ্কর	কিঙ্করী

৩. 'নী', 'নি', 'আনী' যোগে লিঙ্গান্তর ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ধোপা	ধোপানি	চৌধুরি	চৌধুরানি	জেলে	জেলেনি
চাকর	চাকরানি	কামার	কামারনি	ডোম	ডোমনি
শিব	শিবানী	পণ্ডিত	পণ্ডিতানী	মালী	মালিনী
কৃষাণ	কৃষাণি	ঠাকুর	ঠাকুরানি	মাতুল	মাতুলানী
রুদ্র	রুদ্রানী	ভব	ভবানী	শয়তান	শয়তানী
মাষ্টার	মাষ্টারনি	মজুর	মজুরানি	নাপিত	নাপিতানি
দুঃখী	দুঃখীনি	বেদে	বেদেনি	মাস্টার	মাস্টারনি

৪. 'ইনি' ও 'ইনী' যোগে লিঙ্গান্তর ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ডাক	ডাকিনী	হস্তি	হস্তিনী	ভিখারী	ভিখারিনী
বাঘ	বাঘিনী	পদ্ম	পদ্মিনী	কাঙাল	কাঙালিনী
সাপ	সাপিনী	রজক	রজকিনী	গয়লা	গয়লানি
পাগল	পাগলিনী	বিলাসী	বিলাসীনি	সন্ন্যাসী	সন্ন্যাসিনী

৫. শব্দের শেষে 'অক' থাকলে 'অক' স্থানে 'ইকা' যোগ করে লিঙ্গান্তর ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গায়ক	গায়িকা	পরিচালক	পরিচালিকা	অধ্যাপক	অধ্যাপিকা
চালক	চালিকা	শিক্ষক	শিক্ষিকা	সেবক	সেবিকা
পালক	পালিকা	গ্রাহক	গ্রাহিকা	বালক	বালিকা
নায়ক	নায়িকা	পাচক	পাচিকা	লেখক	লেখিকা
বাহক	বাহিকা	পাঠক	পাঠিকা	প্রচারক	প্রচারিকা
সম্পাদক	সম্পাদিকা	সাধক	সাধিকা	ঘোষক	ঘোষিকা

৬. স্ত্রীবাচক শব্দের দ্বারা লিঙ্গান্তর ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
গয়লা	গয়লা-বউ	এঁড়ে বাছুর	বক্না বাছুর	রায়	রায় গিন্নি
বেনে	বেনে-বউ	ঘোষ	ঘোষ জায়া	শ্রমিক	নারী শ্রমিক
কবি	মহিলা কবি	মাঝি	মাঝি বউ	বেটা ছেলে	মেয়ে ছেলে
ডাক্তার	লেডি ডাক্তার	চাষি	চাষি বউ	হুলো বেড়াল	মেনি বেড়াল
ঠাকুর	ঠাকুরঝি	গোঁসাই	মা গোঁসাই	পুরুষ মানুষ	মেয়ে মানুষ

৭. স্ত্রীবাচক আলাদা শব্দ দ্বারা লিঙ্গান্তর ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
পিতা	মাতা	শুক	সারী	ছেলে	মেয়ে
বাবা	মা	খানসামা	আয়া	বলদ/ষাঁড়	গাই
গোলাম	বাঁদী	কর্তা	গিন্নি/গৃহিণী	চাকর	ঝি
শ্বশুর	শাশুড়ি	নর	নারী	বিদ্বান	বিদুষী
পুত্র	কন্যা	সহেব	বিবি, মেম	দাদা	বৌদি/দিদি
দাদু	দিদা	রাজা	রানি	ভাই	বোন
মিঞা	বিবি	দেওর	জা	যুবক	যুবতী
জামাই	মেয়ে	বর	বউ/কনে	জনক	জননী

৮. ঋ-কারান্ত শব্দে 'ঈ' যোগে লিঙ্গান্তর ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
দাতা	দাত্রী	ক্রেতা	ক্রেত্রী	ধাতা	ধাত্রী
অভিনেতা	অভিনেত্রী	হোতা	হোত্রী	কর্তা	কর্ত্রী
নেতা	নেত্রী	ভর্তা	ভর্ত্রী		

৯. 'বতী', 'মতী' যোগে লিঙ্গান্তর ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ভগবান	ভগবতী	রুচিমান	রুচিমতী	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমতী
দয়াবান	দয়াবতী	শক্তিমান	শক্তিমতী	শ্রীমান	শ্রীমতী
পুত্রবান	পুত্রবতী	আয়ুষ্মান	আয়ুষ্মতী		

১০. 'ইন্' প্রত্যয়ান্ত শব্দের সঙ্গে 'ইনী' যোগে লিঙ্গান্তর ঃ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
অনুগামী	অনুগামিনী	সন্ন্যাসী	সন্ন্যাসিনী	দুঃখী	দুঃখিনী
তেজস্বী	তেজস্বিনী	মালী	মালিনী	মায়াবী	মায়াবিনী
পক্ষী	পক্ষিণী	উদাসী	উদাসিনী	মানী	মানিনী
বিলাসী	বিলাসিনী	মেধাবী	মেধাবিনী	হস্তি	হস্তিনী
রোগী	রোগিণী	প্রতিযোগী	প্রতিযোগিনী	সহযোগী	সহযোগিনী

মনে রাখবে ঃ

- যে শব্দের দ্বারা পুরুষ, স্ত্রী বা এদের কেউ নয় এমন কিছু বোঝায় তাকে **লিঙ্গ** বলে।
- লিঙ্গ চার প্রকার— **পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, উভয়লিঙ্গ, ক্লীবলিঙ্গ।**
- **পুংলিঙ্গ ঃ** প্রাণীবাচক যে শব্দের দ্বারা পুরুষ জাতিকে বোঝায় তাকে পুংলিঙ্গ বলে। যেমন—শিক্ষক, ছাত্র, নেতা, বাবা, দাদা, ভাই, মামা ইত্যাদি।
- **স্ত্রীলিঙ্গ ঃ** প্রাণীবাচক যে শব্দের দ্বারা স্ত্রী-জাতিকে বোঝায় তাকে স্ত্রীলিঙ্গ বলে। যেমন—শিক্ষিকা, মা, ছাত্রী, নেত্রী, দিদি, মামী, বোন, হংসী, গাভী ইত্যাদি।
- **উভয়লিঙ্গ ঃ** প্রাণীবাচক যে শব্দের দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই বোঝায় তাকে উভয় লিঙ্গ বলে। যেমন— শিশু, সন্তান, সভাপতি, মন্ত্রী ইত্যাদি।
- **ক্লীবলিঙ্গ ঃ** অপ্রাণীবাচক যে শব্দের দ্বারা স্ত্রী-পুরুষ কাউকেই বোঝায় না তাকে ক্লীবলিঙ্গ বলে। যেমন— পাহাড়, পর্বত, নদী, মাছ, ঘর, বাড়ি ইত্যাদি।
- পুরুষবাচক যে শব্দের কখনও লিঙ্গ পরিবর্তন হয় না তাকে **নিত্য পুংলিঙ্গ শব্দ** বলে। যেমন—কবি, সভাপতি, মন্ত্রী, বিপত্নীক, রাষ্ট্রপতি ইত্যাদি।
- স্ত্রীবাচক যে শব্দের কখনও পুংলিঙ্গ হয় না, তাকে **নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ** বলে। যেমন—বিধবা, সধবা, অজ্ঞানা ইত্যাদি।

	স্ত্রীলিঙ্গ
	বুদ্ধিমতী
	শ্রীমতী

	স্ত্রীলিঙ্গ
	দুঃখিনী
	মায়াবিনী
	মানিনী
	হস্তিনী
	সহযোগিনী

ল।

। যেমন—শিক্ষক, ছাত্র,

মন—শিক্ষিকা, মা, ছাত্রী,

য় লিঙ্গ বলে। যেমন—

ীবলিঙ্গ বলে। যেমন—

ঙ্গ বলে। যেমন—কবি,

—বিধবা, সধবা, অজ্ঞানা

অনুশীলনী

১। **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ**

(ক) লিঙ্গ কাকে বলে? লিঙ্গ কয় প্রকার ও কী কী?

(খ) পুংলিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(গ) স্ত্রীলিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(ঘ) ক্লীবলিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(ঙ) উভয়লিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(চ) নিত্য পুংলিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

(ছ) নিত্য স্ত্রীলিঙ্গ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।

২। **নীচের পুংলিঙ্গবাচক শব্দগুলিকে স্ত্রীলিঙ্গে রূপান্তর করো ঃ**

তনয়, শিষ্য, নবীন, আর্য, কিঙ্কর, মানব, বিদ্বান, মাতুল, কপোত, খানসামা, বামুন, গায়ক।

৩। **নীচের স্ত্রীলিঙ্গবাচক শব্দগুলিকে পুংলিঙ্গ বাচক শব্দে রূপান্তর করো ঃ**

কনিষ্ঠা, দেবী, পাত্রী, শঙ্করী, বিবি, সাধিকা, পাচিকা, পাগলিনী, ডাহুকী, জননী, সারী।

৪। **লিঙ্গ অনুযায়ী নীচের শব্দগুলিকে প্রদত্ত ছকে সাজাও ঃ**

কাঙাল, সাপিনী, সাহেব, মিঞা, অজ, মহাশয়া, গায়ক, ইন্দ্রাণী, যোগী, নটী।

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ

পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ

৫। **শূন্যস্থানে ঠিক আগের বা পরের শব্দটির বিপরীত লিঙ্গের শব্দ বসাও ঃ**

(ক) স্বামী____মিলে তাঁরা ভ্রমণে বেরিয়েছেন।

(খ) সভায়____সদস্যা উপস্থিত হল।

(গ) আমাদের পুরাণে তেত্রিশকোটি দেব____।

(ঘ) এই অফিসে বিবাহের পাত্র____'র সংবাদ দেওয়া হয়।

(ঙ) জমিদার বাড়িতে ঝি____কম নেই।

(চ) ____বধূকে বরণ করে ঘরে আনা হল।

(ছ) পাতালে____নাগিনীর বাস।

(জ) আজও গ্রামের মানুষ ভূত____বিশ্বাস করে।

(ঝ) বর্ষায় ময়ূর____নেচে ওঠে।

(ঞ)____তরুণীরাই দেশের প্রাণশক্তি।

অধ্যায় ৯ সন্ধি

বনাঞ্চল

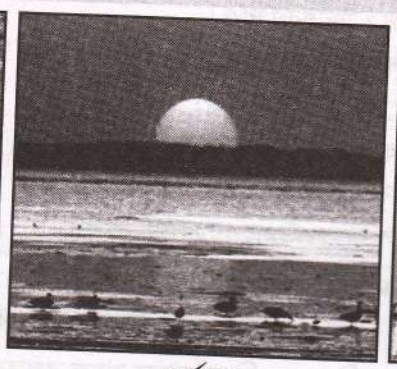
সূর্যাস্ত

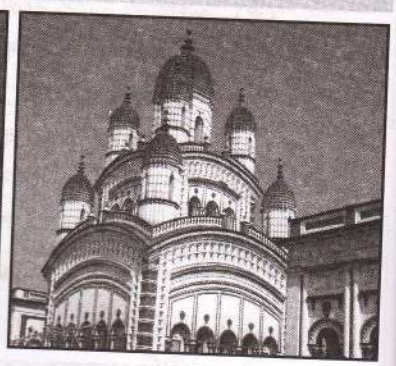
দেবালয়

দুটি ধ্বনি একই শব্দে বা দুটি বিভিন্ন শব্দে পাশাপাশি থাকলে দ্রুত উচ্চারণের সময় তাদের মধ্যে কিছু পরিবর্তন ঘটে। তখন তাদের আংশিক বা পূর্ণ মিলন হয়, কিংবা একটির লোপ পায়, কিংবা একটি অন্যটির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়। এই মিলন, লোপ বা পরিবর্তনকে বলা হয় **সন্ধি**।

ওপরের বাক্যে 'বনাঞ্চল' শব্দটিকে ভাঙলে পাওয়া যায় বন + অঞ্চল। 'বন' এবং 'অঞ্চল' মিলে তৈরি হয়েছে 'বনাঞ্চল'। কীভাবে তৈরি হল দেখো— বন = ব্ + অ + ন্ + অ; অঞ্চল = অ + ঞ্ + চ্ + অ + ল্ + অ।

'বন' পদটির শেষ বর্ণ 'অ' এবং 'অঞ্চল' পদটির প্রথম বর্ণ 'অ' মিলে আ-কার (া) তৈরি হয়েছে। এই আ-কার (া) পূর্বপদের 'ন' বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয়ে 'না' হয়েছে। এর ফলে সম্পূর্ণ নতুন পদটি হয়েছে— বনাঞ্চল। অনুরূপে, সূর্যাস্ত = সূর্য + অস্ত [অ + অ = া হয়েছে]। এই আ-কার (া) 'র্য' এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আবার দেবালয় = দেব + আলয় [অ + আ = া হয়েছে]। এই আ-কার (া) 'ব' এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। অতএব, সন্ধিকে বলা যায় ঃ পাশাপাশি অবস্থিত দুটি বর্ণের বা ধ্বনির মিলন।

সন্ধির সংজ্ঞা ঃ

পাশাপাশি বা খুব কাছাকাছি অবস্থিত দুটি ধ্বনির উচ্চারণগত মিলন বা পরিবর্তনকে **সন্ধি** বলে।

সন্ধি তিন প্রকার— ১. **স্বরসন্ধি**, ২. **ব্যঞ্জনসন্ধি** ও ৩. **বিসর্গসন্ধি**।

এই শ্রেণিতে তোমরা কেবল স্বরসন্ধি ও ব্যঞ্জনসন্ধি সম্পর্কে বিস্তারিত জানবে।

স্বরসন্ধি ঃ

স্বরধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনির মিলনকে **স্বরসন্ধি** বলে। যেমন— দেব + আলয় = দেবালয় (অ + আ = া) নির্দিষ্ট কিছু সূত্র মেনে এই সন্ধি ঘটে। এই সব সূত্র অনুসারে স্বরসন্ধির উদাহরণ ঃ

১ অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আকার থাকলে উভয় মিলে আ-কার (া) হয়। ওই আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ + অ = আ, (া)

হিম + অচল = হিমাচল সূর্য + অস্ত = সূর্যাস্ত স্ব + অধীনতা = স্বাধীনতা

পর	+ অধীন	= পরাধীন	অদ্য	+ অপি	= অদ্যাপি	নব	+ অন্ন	= নবান্ন
সর্ব	+ অপেক্ষা	= সর্বাপেক্ষা	দিন	+ অন্ত	= দিনান্ত	নর	+ অধম	= নরাধম
ধর্ম	+ অধর্ম	= ধর্মাধর্ম	শত	+ অব্দ	= শতাব্দ	স্ব	+ অধীন	= স্বাধীন
মুর	+ অরি	= মুরারি	রোষ	+ অনল	= রোষানল	পদ	+ অঙ্ক	= পদাঙ্ক

অ + আ = আ, (া)

হিম	+ আলয়	= হিমালয়	জল	+ আশয়	= জলাশয়	গ্রন্থ	+ আগার	= গ্রন্থাগার
চরণ	+ আশ্রিত	= চরণাশ্রিত	পদ্ম	+ আসন	= পদ্মাসন	হত	+ আশা	= হতাশা
শোক	+ আকুল	= শোকাকুল	রত্ন	+ আকর	= রত্নাকর	শরণ	+ আপন্ন	= শরণাপন্ন
দেব	+ আশিস	= দেবাশিষ	শুভ	+ আশিস	= শুভাশিস	বিবেক	+ আনন্দ	= বিবেকানন্দ

২ **ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয় মিলে ঈ-কার (ী) হয়। ওই ঈ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।**

আ + আ = আ, (া)

বিদ্যা	+ আলয়	= বিদ্যালয়	মহা	+ আশয়	= মহাশয়	মহা	+ আকাশ	= মহাকাশ
সদা	+ আনন্দ	= সদানন্দ	কারা	+ আগার	= কারাগার	ক্ষুধা	+ আতুর	= ক্ষুধাতুর
মহা	+ আত্মা	= মহাত্মা	সুধা	+ আকর	= সুধাকর	শিক্ষা	+ আয়তন	= শিক্ষায়তন
মহা	+ আকার	= মহাকার	আশা	+ আনন্দ	= আশানন্দ	ছায়া	+ আবৃত	= ছায়াবৃত

আ + অ = আ, (া)

বিদ্যা	+ অর্জন	= বিদ্যার্জন	যথা	+ অর্থ	= যথার্থ	পূজা	+ অর্চনা	= পূজার্চনা
তথা	+ অপি	= তথাপি	ভিক্ষা	+ অন্ন	= ভিক্ষান্ন	কথা	+ অমৃত	= কথামৃত
দিবা	+ অবসান	= দিবাবসান	চূড়া	+ অন্ত	= চূড়ান্ত	সুধা	+ অংশু	= সুধাংশু

ই + ই = ঈ, (ী)

রবি	+ ইন্দ্র	= রবীন্দ্র	অতি	+ ইত	= অতীত	কবি	+ ইন্দ্র	= কবীন্দ্র
অতি	+ ইব	= অতীব	অভি	+ ইষ্ট	= অভীষ্ট	মুনি	+ ইন্দ্র	= মুনীন্দ্র
মনি	+ ইন্দ্র	= মনীন্দ্র	গিরি	+ ইন্দ্র	= গিরীন্দ্র	ক্ষিতি	+ ইন্দ্র	= ক্ষিতীন্দ্র

ই + ঈ = ঈ, (ী)

পরি	+ ঈক্ষা	= পরীক্ষা	গিরি	+ ঈশ	= গিরীশ	প্রতি	+ ঈক্ষা	= প্রতীক্ষা
অধি	+ ঈশ্বর	= অধীশ্বর	ক্ষিতি	+ ঈশ	= ক্ষিতীশ	কবি	+ ঈশ	= কবীশ
অগ্নি	+ ঈশ্বর	= অগ্নীশ্বর	নীতি	+ ঈশ	= নীতীশ	মণি	+ ঈশ	= মণীশ

ঈ + ঈ = ঈ, (ী)

সতী	+ ঈশ	= সতীশ	মহী	+ ঈশ্বর	= মহীশ্বর	কালী	+ ঈশ্বর	= কালীশ্বর
শ্রী	+ ঈশ	= শ্রীশ	সুধী	+ ঈশ	= সুধীশ	শচী	+ ঈশ	= শচীশ
পুরী	+ ঈশ্বর	= পুরীশ্বর	পৃথ্বী	+ ঈশ	= পৃথ্বীশ	রজনী	+ ঈশ	= রজনীশ

ঈ + ই = ঈ, (ী)

শচী + ইন্দ্র = শচীন্দ্র
রথী + ইন্দ্র = রথীন্দ্র
সুধী + ইন্দ্র = সুধীন্দ্র
অবনী + ইন্দ্র = অবনীন্দ্র
মহী + ইন্দ্র = মহীন্দ্র
যতী + ইন্দ্র = যতীন্দ্র

৩ উ-কার কিংবা ঊ-কারের পরে উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয় মিলে ঊ-কার (ূ) হয়। ওই ঊ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

উ + উ = ঊ, (ু)

মরু + উদ্যান = মরূদ্যান
অনু + উদিত = অনূদিত
কটু + উক্তি = কটূক্তি

উ + ঊ = ঊ, (ূ)

লঘু + ঊর্মি = লঘূর্মি
সিন্ধু + ঊর্মি = সিন্ধূর্মি
তনু + ঊর্ধ্ব = তনূর্ধ্ব

উ + ঊ = ঊ, (ূ)

ভূ + ঊর্ধ্ব = ভূর্ধ্ব
সরযূ + ঊর্মি = সরযূর্মি

৪ অ-কার কিংবা আ-কারের পর ই-কার কিংবা ঈ-কার থাকলে উভয়মিলে এ-কার (ে) হয়। এই এ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ + ই = এ, (ে)

নর + ইন্দ্র = নরেন্দ্র
পূর্ণ + ইন্দু = পূর্ণেন্দু
দেব + ইন্দ্র = দেবেন্দ্র
যোগ + ইন্দ্র = যোগেন্দ্র
সুর + ইন্দ্র = সুরেন্দ্র
শিব + ইন্দ্র = শিবেন্দ্র

অ + ঈ = এ, (ে)

গণ + ঈশ = গণেশ
দেব + ঈশ = দেবেশ
ভব + ঈশ = ভবেশ
অপ + ঈক্ষা = অপেক্ষা
কমল + ঈশ = কমলেশ
সুর + ঈশ = সুরেশ
নর + ঈশ = নরেশ
দীন + ঈশ = দীনেশ
ভুবন + ঈশ্বর = ভুবনেশ্বর

আ + ই = এ, (ে)

যথা + ইষ্ট = যথেষ্ট
রসনা + ইন্দ্রিয় = রসনেন্দ্রিয়
রমা + ইন্দ্র = রমেন্দ্র
রাজা + ইন্দ্র = রাজেন্দ্র
মহা + ইন্দ্র = মহেন্দ্র
যথা + ইচ্ছা = যথেচ্ছা

আ + ঈ = এ, (ে)

রমা + ঈশ = রমেশ
মহা + ঈশ্বরী = মহেশ্বরী
উমা + ঈশ = উমেশ
সারদা + ঈশ্বরী = সারদেশ্বরী
দ্বারকা + ঈশ্বর = দ্বারকেশ্বর
মহা + ঈশ = মহেশ

৫ অ-কার কিংবা আ-কারের পর উ-কার কিংবা ঊ-কার থাকলে উভয় মিলে ও-কার (ো) হয়। ওই ও-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ + উ = ও, (ো)

সূর্য + উদয় = সূর্যোদয়
বোধ + উদয় = বোধোদয়
জ্ঞান + উদয় = জ্ঞানোদয়
পর + উপকার = পরোপকার
উত্তর + উত্তর = উত্তরোত্তর
জল + উচ্ছ্বাস = জলোচ্ছ্বাস
চন্দ্র + উদয় = চন্দ্রোদয়
তীর্থ + উদক = তীর্থোদক
নীল + উৎপল = নীলোৎপল

অ + উ = ও, (ো)

চল + ঊর্মি = চলোর্মি সাগর + ঊর্মি =সাগরোর্মি চঞ্চল + ঊর্মি = চঞ্চলোর্মি
নব + ঊঢ়া = নবোঢ়া গৃহ + ঊর্ধ্ব =গৃহোর্ধ্ব এক + ঊন = একোন

আ + উ = ও, (ো)

মহা + উৎসব = মহোৎসব বিদ্যা + উপার্জন = বিদ্যোপার্জন মহা + উপকার = মহোপকার
যথা + উচিত = যথোচিত দুর্গা + উৎসব = দুর্গোৎসব গঙ্গা + উদক = গঙ্গোদক

আ + ঊ = ও, (ো)

গঙ্গা + ঊর্মি = গঙ্গোর্মি মহা + ঊর্মি = মহোর্মি

৬ অ-কার কিংবা আ-কারের পর 'ঋ' কার থাকলে সেই ঋ 'আর' হয়ে যায়। 'অর' এর 'অ' পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং 'র্' রেফ্ হয়ে পরের বর্ণের মাথায় বসে।

রাজা + ঋষি = রাজর্ষি মহা + ঋষি = মহর্ষি মহা + ঋষভ = মহর্ষভ

ব্যতিক্রম ঃ কিন্তু ঋত শব্দের ঋ-কার পরে থাকলে উভয়ে মিলে 'আর' হয়। 'আ' পূর্ববর্ণে যুক্ত হয় এবং 'র' রেফ্ হয়ে পরবর্ণের মাথায় বসে। যেমন—

শীত + ঋত = শীতার্ত অ + ঋত = আর্ত স্নেহ + ঋত = স্নেহার্ত
ভয় + ঋত = ভয়ার্ত বন্যা + ঋত = বন্যার্ত ক্ষুধা + ঋত = ক্ষুধার্ত

৭ অ-কার কিংবা আ-কারের পর এ-কার কিংবা ঐ-কার থাকলে উভয়মিলে ঐ-কার (ৈ) হয়। ওই ঐ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ + এ = ঐ, (ৈ)

জন + এক = জনৈক সর্ব + এব = সর্বৈব হিত + এষী = হিতৈষী

অ + ঐ = ঐ, (ৈ)

মত + ঐক্য = মতৈক্য ধন + ঐশ্বর্য = ধনৈশ্বর্য রাজ + ঐশ্বর্য = রাজৈশ্বর্য

আ + এ = ঐ, (ৈ)

তথা + এব = তথৈব সদা + এব = সদৈব বিদ্যা + এব = বিদ্যৈব

আ + ঐ = ঐ, (ৈ)

মহা + ঐশ্বর্য = মহৈশ্বর্য মহা + ঐরাবত = মহৈরাবত

৮ অ-কার কিংবা আ-কারের পর ও-কার কিংবা ঔ-কার থাকলে উভয় মিলে ঔ-কার (ৌ) হয়। সেই ঔ কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

অ + ও = ঔ, (ৌ)

বন + ওষধি = বনৌষধি বিম্ব + ওষ্ঠ = বিম্বৌষ্ঠ জল + ওকা = জলৌকা

অ + ঔ = ঔ, (ৌ)

পরম + ঔষধ = পরমৌষধ চিত্ত + ঔদার্য = চিত্তৌদার্য পরম + ঔদাস্য = পরমৌদাস্য

আ + ও = ঔ, (ৌ)

মহা + ওষধি = মহৌষধি

মহা + ওদন = মহৌদন

আ + ঔ = ঔ, (ৌ)

মহা + ঔদার্য = মহৌদার্য

মহা + ঔৎসুক= মহৌৎসুক

মহা + ঔষধ = মহৌষধ

৯ ই-কার কিংবা ঈ-কারের পর ই, ঈ ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকলে ই বা ঈ স্থানে য-ফলা (্য) হয়। সেই য-ফলা পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

ই + অ = য-ফলা, (্য)

আদি + অন্ত = আদ্যন্ত

অধি + অয়ন = অধ্যয়ন

যদি + অপি = যদ্যপি

ই + আ = য-ফলা + া, (্যা)

প্রতি + আশা = প্রত্যাশা

ইতি + আদি = ইত্যাদি

প্রতি + আগমন = প্রত্যাগমন

প্রতি + আবর্তন = প্রত্যাবর্তন

অতি + আচার = অত্যাচার

বি + আঘাত = ব্যাঘাত

ই + উ = য-ফলা + উ, (্যু)

অতি + উক্তি = অত্যুক্তি

অতি + উচ্চ = অত্যুচ্চ

প্রতি + উত্তর = প্রত্যুত্তর

বি + উৎপত্তি = ব্যুৎপত্তি

অভি + উদয় = অভ্যুদয়।

অতি + উৎসাহ = অত্যুৎসাহ

ই + ঊ = য-ফলা + ঊ (্যূ)

প্রতি + ঊষ = প্রত্যূষ

ই + এ = য-ফলা + এ, (্যে)

প্রতি + এক = প্রত্যেক

ঈ + অ = য-ফলা, (্য)

নদী + অম্বু = নদ্যম্বু

মঈ + আ = য-ফলা + আ, (্যা)

মসী + আধার = মস্যাধার

নদী + আদি = নদ্যাদি

১০ উ-কার কিংবা ঊ-কারের পর উ, ঊ ছাড়া ভিন্ন স্বরবর্ণ থাকলে, উ, ঊ স্থানে 'ব্' হয়। ওই 'ব' 'ব'-ফলা হয়ে পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

উ + অ = ব্ (ফলা)

সু + অল্প = স্বল্প

অনু + অয় = অন্বয়

মনু + অন্তর = মন্বন্তর

উ + আ = ব্ (বা)

সু + আগত = স্বাগত

পশু + আচার = পশ্বাচার

পশু + আদি = পশ্বাদি

উ + ই = ব্ (বি)

অনু + ইত = অন্বিত

উ + ঈ = ব্ (বী)

সাধু + ঈ = সাধ্বী

উ + এ = ব্ (বে)

অনু + এষণ = অন্বেষণ

উ + আ = ব্ (বা)

বধূ + আনয়ন = বধ্বানয়ন

১১ ঋ-কারের পর ঋ ভিন্ন অন্য স্বরবর্ণ থাকলে ঋ স্থানে 'র' হয়। সেই 'র্' র-ফলা হয়ে পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়।

ঋ + অ = র্ (ফলা)

মাতৃ + অনুমতি = মাত্রনুমতি

পিতৃ + অনুমতি = পিত্রনুমতি

ঋ + আ = র্ (রা)
পিতৃ + আলয় = পিত্রালয়
মাতৃ +আদেশ = মাত্রাদেশ

ঋ + ই = র + ই (রি)
পিতৃ + ইচ্ছা = পিত্রিচ্ছা
মাতৃ + ইচ্ছা = মাত্রিচ্ছা

ঋ + ঈ = র + ঈ (রী)
কর্তৃ + ঈ = কর্ত্রী

ঋ + উ = র্ + উ (রু)
ভ্রাতৃ + উপদেশ = ভ্রাত্রুপদেশ

ঋ + ঐ = র + ঐ (রৈ)
পিতৃ + ঐশ্বর্য = পিত্রৈশ্বর্য

১২ **এ-এর পর অন্য কোন স্বরবর্ণ থাকলে 'এ'-স্থানে অয়্, 'ঐ'-এরপর অন্য কোনো স্বরবর্ণ থাকলে 'ঐ'-স্থানে 'আয়্', ও-এর পর অন্য কোনো স্বরবর্ণ থাকলে 'ও'-স্থানে 'অব্' এবং ঔ-এর পর অন্য কোনো স্বরবর্ণ থাকলে ঔ-স্থানে 'আব্' হয়। যেমন —**

এ	+	অ	=	অয়্	ঃ	নে	+	অন	=	নয়ন,	শে + অন	= শয়ন
ঐ	+	অ	=	আয়্	ঃ	গৈ	+	অক	=	গায়ক,	নৈ + অক	= নায়ক
ও	+	অ	=	অব্	ঃ	পো	+	অন	=	পবন		
ও	+	ই	=	অব্	ঃ	পো	+	ইত্র	=	পবিত্র,	ভো + অন	= ভবন
ও	+	এ	=	অব্	ঃ	গো	+	এষণা	=	গবেষণা		
ঔ	+	অ	=	আব্	ঃ	পৌ	+	অক	=	পাবক		
ঔ	+	ই	=	আব্	ঃ	নৌ	+	ইক	=	নাবিক		
ঔ	+	উ	=	আব্	ঃ	ভৌ	+	উক	=	ভাবুক		

নিপাতনে সিদ্ধ স্বরসন্ধি

অনেক সময় দেখা যায় সন্ধির সাধারণ সূত্রগুলি না মেনে অন্যভাবে স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলন ঘটেছে। এক্ষেত্রে সিদ্ধ সন্ধিকে নিপাতনে স্বরসন্ধি বলে। যেমন—

কুল + অটা	= কুলটা	প্র + ঊঢ়	= প্রৌঢ়	গো + অক্ষ	= গবাক্ষ
অন্য + অন্য	= অন্যান্য	সার + অঙ্গ	= সারঙ্গ	শুদ্ধ + ওদন	= শুদ্ধোদন
স্ব + ঈর	= স্বৈর	মনস্ + ঈষা	= মনীষা	সীমন্ + অন্ত	= সীমন্ত

খাঁটি বাংলা স্বরসন্ধি

অ + অ = আ (া) ঃ	অপর + অপর = অপরাপর	বাপ + অন্ত = বাপান্ত
অ + আ = আ (া) ঃ	হিসাব + আদি = হিসাবাদি	পাগল + আমি = পাগলামি
	ঘর + আমি = ঘরামি	ঠাকুর + আলি = ঠাকুরালি
আ + আ = আ (া) ঃ	পাকা + আমি = পাকামি	সোনা + আলি = সোনালি
	জেঠা + আমি = জেঠামি	শাঁখা + আরি = শাঁখারি
ই + ঈ = ঈ (ী) ঃ	দিল্লি + ঈশ্বরী = দিল্লীশ্বরী	
অ + ঈ = এ ঃ	যশোর + ঈশ্বরী = যশোরেশ্বরী	
আ + ঈ = এ ঃ	ঢাকা + ঈশ্বরী = ঢাকেশ্বরী	

ব্যঞ্জনসন্ধি

স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের, ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের অথবা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে **ব্যঞ্জনসন্ধি** বলে।

উদাহরণ ঃ অণু + ছেদ [স্বরবর্ণ + ব্যঞ্জনবর্ণ]
ব্যঞ্জনসন্ধি দিক্ + অন্ত [ব্যঞ্জনবর্ণ + স্বরবর্ণ]
সম্ + কার [ব্যঞ্জনবর্ণ + ব্যঞ্জনবর্ণ]

ব্যঞ্জনসন্ধির সূত্রগুলি বুঝতে হলে নীচের ছকটি মনে রাখা একান্ত আবশ্যক। কারণ সূত্রগুলি বলার সময় 'বর্গ' এবং 'বর্গের বর্ণ' কথাগুলি ব্যবহার করতে হয়।

বর্গ

বর্ণ	ক-বর্গ	চ-বর্গ	ট-বর্গ	ত-বর্গ	প-বর্গ
প্রথম বর্ণ	ক	চ	ট	ত	প
দ্বিতীয় বর্ণ	খ	ছ	ঠ	থ	ফ
তৃতীয় বর্ণ	গ	জ	ড	দ	ব
চতুর্থ বর্ণ	ঘ	ঝ	ঢ	ধ	ভ
পঞ্চম বর্ণ	ঙ	ঞ	ণ	ন	ম

ব্যঞ্জনসন্ধির সূত্রাবলি

স্বরবর্ণ + ব্যঞ্জনবর্ণ

১ স্বরবর্ণের পরে 'ছ' থাকলে 'ছ' এর স্থানে 'চ্ছ' হয় ঃ

বি + ছেদ = বিচ্ছেদ
অব + ছেদ = অবচ্ছেদ
পূর্ণ + ছেদ = পূর্ণচ্ছেদ
মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি
অনু + ছেদ = অনুচ্ছেদ
বৃক্ষ + ছায়া = বৃক্ষচ্ছায়া
রবি + ছায়া = রবিচ্ছায়া
তরু + ছায়া = তরুচ্ছায়া
মূল + ছেদ = মূলচ্ছেদ
পরি + ছদ = পরিচ্ছদ
রাজ + ছত্র = রাজচ্ছত্র
বি + ছিন্ন = বিচ্ছিন্ন

ব্যতিক্রম ঃ আ-কার ভিন্ন দীর্ঘস্বরের পর 'ছ' থাকলে 'ছ্' এর স্থানে 'ছ্' বা 'চ্ছ্' উভয়ই হতে পারে। যেমন— গায়ত্রী + ছন্দ = গায়ত্রীছন্দ, গায়ত্রীচ্ছন্দ।

ব্যঞ্জনবর্ণ + স্বরবর্ণ

২ স্বরবর্ণ পরে থাকলে পূর্বপদের শেষে অবস্থিত বর্গের প্রথম বর্ণের জায়গায় সেই বর্গের তৃতীয় বর্ণ হয়। অর্থাৎ ক্, চ্, ট্, ত্, প্ এর বদলে গ্, জ্, ড্, দ্, ব্ হয়। যেমন—

বাক্ + দেবী = বাগ্‌দেবী
ঋক্ + বেদ = ঋগ্বেদ
দিক্ + গজ = দিগ্‌গজ
দিক্ + ভ্রম = দিগভ্রম্
বাক্ + ঈশ্বরী = বাগীশ্বরী
জগৎ + ঈশ = জগদীশ
দিক্ + বিজয়ী = দিগ্বিজয়ী
সৎ + উপায় = সদুপায়
সৎ + আচার = সদাচার
ষট্ + যন্ত্র = ষড়যন্ত্র
তৎ + অন্ত = তদন্ত
ষট্ + দর্শন = ষড়দর্শন
কৃৎ + অন্ত = কৃদন্ত
ষট্ + ঋতু = ষড়ঋতু
ষট্ + আনন = ষড়ানন

ব্যতিক্রম ঃ বাক্ + ময় = বাঙ্ময়, তৎ + ময় = তন্ময়, কিঞ্চিৎ + মাত্র = কিঞ্চিন্মাত্র

ব্যঞ্জন + ব্যঞ্জন

৩ 'ত' কিংবা 'দ' এর পর চ্ বা ছ্ থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থানে 'চ্' হয়। যেমন—

উৎ + ছল = উচ্ছল
উৎ + ছেদ = উচ্ছেদ
সৎ + চরিত্র = সচ্চরিত্র
চলৎ + চিত্র = চলচ্চিত্র
শরৎ + চন্দ্র = শরচ্চন্দ্র
উৎ + চারণ = উচ্চারণ

৪ ত্ কিংবা দ্ এর পর জ্ বা ঝ্ থাকলে ত্ ও দ্ এর স্থানে 'জ্' হয়। যেমন—

সৎ + জন = সজ্জন বিপদ্ + জনক = বিপজ্জনক জগৎ + জননী = জগজ্জননী
তৎ + জন্য = তজ্জন্য উৎ + জ্বল = উজ্জ্বল কুৎ + ঝটিকা = কুজ্ঝটিকা
যাবৎ + জীবন = যাবজ্জীবন বিদ্বৎ + জন = বিদ্বজ্জন উৎ + জীবিত = উজ্জীবিত

৫ ত্ কিংবা দ্-এর পর ট্ বা ঠ্ থাকলে ত্ বা দ্-এর স্থানে 'ট্' হয়। যেমন—

তৎ + টীকা = তট্টীকা বৃহৎ + টীকা = বৃহট্টীকা

৬ ত্ কিংবা দ্-এর পর ড্ বা ঢ্ থাকলে ত্ বা দ্-এর স্থানে 'ড' হয়। যেমন—

উৎ + ডীন = উড্ডীন উৎ + ডয়ন = উড্ডয়ন বৃহৎ + ডমরু = বৃহড্ডমরু

৭ ত্ কিংবা দ্-এর পর ল্ থাকলে ত্ ও দ্-এর স্থানে 'ল' হয়। যেমন—

উৎ + লেখ = উল্লেখ উৎ + লাস = উল্লাস উৎ + লিখিত = উল্লিখিত
তদ্ + লিখিত = তল্লিখিত উৎ + লম্ব = উল্লম্ব বিদ্যুৎ + লতা = বিদ্যুল্লতা

৮ ত্ কিংবা দ্-এর পর শ্ থাকলে ত্ ও দ্ স্থানে চ্ এবং শ্ স্থানে ছ হয়। যেমন—

উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস উৎ + শ্বসিত = উচ্ছ্বসিত চলৎ + শক্তি = চলচ্ছক্তি
উৎ + শৃঙ্খল = উচ্ছৃঙ্খল উৎ + শিষ্ট = উচ্ছিষ্ট

৯ ত্ কিংবা দ্-এর পর 'হ্' থাকলে ত্ বা দ্ এর স্থানে দ্ এবং হ্-এর স্থানে 'ধ্' হয়। যেমন—

তৎ + হিত = তদ্ধিত উৎ + হত = উদ্ধত উৎ + হার = উদ্ধার
পদ্ + হতি = পদ্ধতি উৎ + ধৃত = উদ্ধৃত জগৎ + হিত = জগদ্ধিত

১০ চ্ কিংবা জ্-এর পর ন্ থাকলে ন্ স্থানে 'ঞ' হয়। যেমন—

রাজ্ + নী = রাজ্ঞী যাচ্ + না = যাচ্ঞা যজ্ + ন = যজ্ঞ
সম্রাজ্ + নী = সম্রাজ্ঞী

১১ ষ্-এর পর ত্ কিংবা থ্ থাকলে ত্ স্থানে ট্ এবং থ্ স্থানে ঠ্ হয়। যেমন—

বৃষ্ + তি = বৃষ্টি কৃষ্ + তি = কৃষ্টি ইষ্ + ত = ইষ্ট
উৎকৃষ্ + ত = উৎকৃষ্ট ষষ্ + থ = ষষ্ঠ আকৃষ + ত = আকৃষ্ট
তুষ্ + ত = তুষ্ট শিষ্ + ত = শিষ্ট যষ্ + থী = ষষ্ঠী

১২ 'ন্'-এর পর শ্, ষ্, স্, হ্ থাকলে ন্-এর স্থানে 'ং' হয়। যেমন—

দন্ + শন্ = দংশন হিন্ + সা = হিংসা বৃন্ + হতি = বৃংহতি
জিঘান্ + সা = জিঘাংসা প্রশন্ + সা = প্রশংসা

১৩ স্পর্শ বর্ণ (ক থেকে ম পর্যন্ত) পরে থাকলে পূর্বপদের অন্তস্থিত 'ম' স্থানে যে বর্গের পরে থাকে তার পঞ্চম বর্ণ হয় এবং বিকল্পে 'ং' হয়। যেমন—

শম্ + কর = শংকর সম্ + কট = সংকট অহম্ + কার = অহংকার
সম্ + কল্প = সংকল্প সম্ + গীত = সংগীত সম্ + গতি = সংগতি
পতম্ + গ = পতংগ সম্ + ঘ = সংঘ সম্ + ঘাত = সংঘাত

● অনান্য ক্ষেত্রে পঞ্চম বর্ণ হয় ঃ

বরম্	+ চ	= বরঞ্চ	বসুম্	+ ধরা	= বসুন্ধরা	সম্	+ চয়	= সঞ্চয়
সম্	+ মতি	= সম্মতি	সম্	+ ধান	= সন্ধান	সম্	+ পূর্ণ	= সম্পূর্ণ
কিম্	+ চিৎ	= কিঞ্চিৎ	সম্	+ দেশ	= সন্দেশ			

১৪ অন্তঃস্থ বর্ণ (য, র, ল, ব) অথবা উষ্মবর্ণ (শ, ষ, স, হ) পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত 'ম্' স্থানে 'ং' হয়। যেমন—

সম্	+ যোগ	= সংযোগ	সম্	+ হার	= সংহার	সম্	+ বাদ	= সংবাদ
সম্	+ শয়	= সংশয়	কিম্	+ বদন্তি	= কিংবদন্তি	কিম্	+ বা	= কিংবা
সম্	+ লগ্ন	= সংলগ্ন	সম্	+ হতি	= সংহতি			

১৫ 'সম' এবং 'পরি' উপসর্গের পর 'কৃ' ধাতু থাকলে ধাতুর পূর্বে স্-এর আগমন হয় এবং 'ম' অনুস্বার (ং) হয়ে যায়। পরি উপসর্গের ক্ষেত্রে 'স', 'ষ' হয়। যেমন—

সং	+ কার	= সংস্কার	সম্	+ কৃতি	= সংস্কৃতি	পরি	+ কার	= পরিষ্কার

১৬ উদ্ (উৎ) উপসর্গের পরবর্তী 'স্থা' ধাতুর 'স' লোপ পায়। যেমন—

উৎ	+ স্থান	= উত্থান	উৎ	+ স্থাপন	= উত্থাপন	উৎ	+ স্থিত	= উত্থিত

১৭ পদমধ্যস্থিত ত্-এর পূর্বে অবস্থিত 'ম্' স্থানে 'ন্' হয়। যেমন—

কিম্	+ তু	= কিন্তু	গম্	+ তব্য	= গন্তব্য	শাম্	+ ত	= শান্ত

১৮ 'ত্'-এর পরে হ্ ধ্ বা ভ্ থাকলে 'হ্ত' হয় 'গ্ধ', ধ্ব হয় দ্ধ এবং ভ্ত হয় ব্ধ। যেমন—

দুহ্	+ ত	= দুগ্ধ	দহ্	+ ত	= দগ্ধ	লভ্	+ ত	= লব্ধ
রুধ্	+ ত	= রুদ্ধ	মুহ্	+ ত	= মুগ্ধ	বুধ্	+ ত	= বুদ্ধ

নিপাতনে সিদ্ধ ব্যঞ্জনসন্ধি ঃ

যেসব ব্যঞ্জনসন্ধি কোনো নিয়মই মানে না, অথচ সেগুলি যে সঠিকভাবেই সন্ধিবদ্ধ হয়েছে, এটা আমরা মেনে নিই, তাদের বলে **নিপাতনে সিদ্ধ**। নিয়মের আওতায় না থেকেও তারা সিদ্ধ, এই কারণেই এরকম সন্ধিগুলি আমাদের একেবারে মুখস্থ থাকা উচিত। এরকম কিছু সন্ধির তালিকা দেওয়া হল—

স্বর ও ব্যঞ্জনের সন্ধি ঃ

বন	+ পতি	= বনস্পতি	এক	+ দশ	= একাদশ	গো	+ পদ	= গোষ্পদ
আ	+ চর্য	= আশ্চর্য	আ	+ পদ	= আস্পদ	হরি	+ চন্দ্র	= হরিশ্চন্দ্র
প্রায়	+ চিত্ত	= প্রায়শ্চিত্ত	পর	+ পর	= পরস্পর	বিশ্ব	+ মিত্র	= বিশ্বামিত্র

ব্যঞ্জন ও স্বরের সন্ধি ঃ

হিন্স্	+ অ	= হিংসা	বৃহৎ	+ পতি	= বৃহস্পতি	পতৎ	+ অঞ্জলি	= পতঞ্জলি
সীমন্	+ অন্ত	= সীমন্ত	মনস্	+ ঈষা	= মনীষা	যাবৎ	+ ঈয়	= যাবতীয়
পশ্চাৎ	+ অর্ধ	= পশ্চার্ধ				যাচ্	+ অক	= যাচক

ব্যঞ্জনে ও ব্যঞ্জনে সন্ধি ঃ

তদ্ + কর = তস্কর
সম্ + রাট = সম্রাট

ষট্ + দশ = ষোড়শ
পুমস্ + লিঙ্গ = পুংলিঙ্গ

মনে রাখবে ঃ

- দ্রুত উচ্চারণের ফলে পরস্পর সন্নিহিত দুটি বর্ণের মিলনকে **সন্ধি** বলে।
- সন্ধি তিন প্রকার—**স্বরসন্ধি, ব্যঞ্জনসন্ধি** ও **বিসর্গসন্ধি**।
- স্বরবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয়, তার নাম **স্বরসন্ধি**।
  যেমন—বিদ্যা + আলয় = বিদ্যালয়।
- ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের, স্বরবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের, কিংবা ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে স্বরবর্ণের মিলনে যে সন্ধি হয়, তাকে **ব্যঞ্জনসন্ধি** বলে। যেমন— মুখ + ছবি = মুখচ্ছবি, ষট্ + আনন = ষড়ানন, সৎ + জন = সজ্জন।
- যে সন্ধি নির্দিষ্ট সূত্র না মেনে হয় তাকে **নিপাতনে সিদ্ধ** সন্ধি বলে।

অনুশীলনী

১। **নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ**

(ক) সন্ধি কাকে বলে? দুটি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।
(খ) সন্ধি কয় প্রকার ও কী কী?
(গ) স্বরসন্ধি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(ঘ) ব্যঞ্জনসন্ধি কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(ঙ) নিপাতনে সিদ্ধ সন্ধি কাকে বলে?

২। **নীচের শব্দগুলোর সন্ধি বিচ্ছেদ করো ঃ**

নরাধম, হতাশা, শোকাকুল, বিদ্যালয়, প্রতীক্ষা, শুভাশিস, যথার্থ, নীতীশ, সতীশ, গণেশ, রথীন্দ্র, বোধোদয়, তীর্থোদক, দুর্গোৎসব, শীতার্ত, হিতৈষণা, স্বল্প, স্বাগত, বিচ্ছেদ, বাগীশ্বরী, উচ্ছ্বাস, বনস্পতি, সংযোগ, ষোড়শ, দ্যুলোক, উদ্ধার, তস্কর, আবিষ্কার, পুরস্কার।

৩। **সন্ধি যুক্ত করো ঃ**

গিরি + ঈশ = _____
গো + অক্ষ = _____
সম্ + ন্যাসী = _____
মনু + অন্তর = _____
নে + অন = _____
বি + ছেদ = _____
প্রতি + এক = _____
স্ব + অর্থ = _____

সম্ + নিবেশ = _____
তিরঃ + কার = _____
জগৎ + ঈশ = _____
অতি + আচার = _____
বাক্ + ধারা = _____
পরি + ঈক্ষা = _____
ক্ষিতি + ঈশ = _____
মহা + উৎসব = _____

দেব + ইন্দ্র =_____
অতি + ইত =_____
তীর্থ + উদক =_____
নৌ + ইক =_____

৪। **শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ**

(ক) বি + অবধান =_____
(গ) গণ + _____ = গণেশ
(ঙ) তনু + _____ = তন্বী
(ছ) _____ + উক্তি = সুক্তি
(ঝ) _____ + বাদ = সংবাদ
(খ) _____ + ধরা = বসুন্ধরা
(ঘ) _____ + আগতম = স্বাগতম
(চ) মনু + অন্তর = _____
(জ) উৎ + _____ = উচ্ছ্বাস
(ঞ) বৃহৎ + পতি = _____

৫। **নীচের বাক্যগুলো থেকে সন্ধিযুক্ত পদ খুঁজে নিয়ে সন্ধিবিচ্ছেদ করো ঃ**

(ক) রামবাবুর বাড়িতে মহোৎসব চলছে।
(খ) তিনি প্রত্যহ প্রাতঃভ্রমণ করেন।
(গ) আগস্ট মাসে আমাদের ষান্মাসিক পরীক্ষা।
(ঘ) তারা খুব তৃষ্ণার্ত।
(ঙ) রমেশ আমার বন্ধু।
(চ) তোমার জন্য অপেক্ষা করব।
(ছ) এই গল্পের সে নায়ক।
(জ) বস্তি উচ্ছেদ হল।
(ঝ) তিনি একজন সজ্জন ব্যক্তি।
(ঞ) বারেক ভিড়াও তরী।

৬। **শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ**

(ক) অ + আ =_____
(খ) ই + ই =_____
(গ) অ + এ =_____
(ঘ) উ + অ =_____
(ঙ) ই + অ =_____
(চ) আ + ও =_____
(ছ) অ + ই =_____
(জ) ই + এ =_____
(ঝ) ঋ + অ =_____
(ঞ) আ + ই =_____
(ট) উ + ঈ =_____
(ঠ) ঋ + ঐ =_____

৭। **কোন্ কোন্ বর্ণের সন্ধি হয়েছে লেখো ঃ**

(ক) জন + এক = জনৈক
(গ) রমা + ইশ = রমেশ
(ঙ) উৎ + শ্বাস = উচ্ছ্বাস
(ছ) ইতি + আদি = ইত্যাদি
(খ) পরি + ঈক্ষা = পরীক্ষা
(ঘ) অগ্নি + ঈশ্বর = অগ্নীশ্বর
(চ) বন + পতি = বনস্পতি
(জ) অতি + ইত = অতীত

=_____
=_____

ধরা = বসুন্ধরা
আগতম = স্বাগতম
অন্তর = _____
_____ = উচ্ছ্বাস
তি = _____

অধ্যায় ১০ কারক ও বিভক্তি

একটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক যেমন সম্পর্ক থাকে, তেমনি একটি বাক্যের পদগুলির মধ্যেও পারস্পরিক একটা সম্বন্ধ থাকে। এই সম্বন্ধকে ব্যাকরণের ভাষায় বলা হয় অন্বয়। ক্রিয়ার সঙ্গে বাক্যের অন্যান্য পদের অন্বয় বা সম্বন্ধ থাকে। এই সম্বন্ধটি থাকার জন্যই বাক্যটি মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে।

কারকের সংজ্ঞা ঃ

বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে বিশেষ্য ও সর্বনাম পদের যে সম্বন্ধ (অন্বয়) থাকে তাকে **কারক** বলে।

কারকের শ্রেণিবিভাগ ঃ একটি ক্রিয়াপদের সঙ্গে বাক্যের অন্যান্য পদের ছয় ধরণের সম্পর্ক থাকে। সেই অনুসারে কারকও ছয় প্রকার—১. **কর্তৃকারক**, ২. **কর্মকারক**, ৩. **করণকারক**, ৪. **নিমিত্ত কারক**, ৫. **অপাদান কারক** ও ৬. **অধিকরণ কারক**।

কারক

কর্তৃকারক	কর্মকারক	করণ কারক	নিমিত্ত কারক	অপাদান কারক	অধিকরণ কারক

ক্রিয়াপদকে ধরে ছটি ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্ন করে সম্পর্কের কথা জানা যায়।

ক্রিয়াপদ		
	কে	কর্তৃকারক
	কী/কাহাকে	কর্মকারক
	কী দ্বারা	করণকারক
	কীজন্য/কাদের জন্য	নিমিত্ত কারক
	কোথা থেকে	অপাদান কারক
	কোথায়/কখন	অধিকরণ কারক

➡ **নীচের বাক্যটি লক্ষ করো ঃ**

হর্ষবর্ধন প্রয়াগে রাজভান্ডার থেকে নিজ হাতে প্রজাদের ধন দান করতেন।

ক্রিয়াপদ	প্রশ্ন	কারক সম্বন্ধ	কারকের নাম
দান করতেন	কে দান করতেন?	হর্ষবর্ধন	= কর্তৃকারক
	কী দান করতেন?	ধন	= কর্মকারক
	কী দ্বারা দান করতেন?	নিজ হাতে	= করণ কারক
	কাদের জন্য দান করতেন?	প্রজাদের	= নিমিত্ত কারক
	কোথা থেকে দান করতেন?	রাজভান্ডার থেকে	= অপাদান কারক
	কোথায় দান করতেন?	প্রয়াগে	= অধিকরণ কারক

বিভক্তি ঃ

মূল পদের সঙ্গে যে বর্ণ বা বর্ণগুচ্ছ যুক্ত হয়ে তাকে বাক্যে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলে, তাকে **বিভক্তি** বলে। যেমন— অ, এ, য়, কে , এর, দের, তে প্রভৃতি। উদাহরণ ঃ রামকে — 'কে' বিভক্তি। গল্পটা — 'টা' বিভক্তি। পন্ডিতে — 'এ' বিভক্তি। রামের — 'এর' বিভক্তি।

অনেক সময় বিভক্তির বদলে 'হইতে' 'থেকে' 'চেয়ে', 'জন্য', 'মাঝে' ইত্যাদি অনুসর্গ বসে। অনুসর্গ অবশ্য শব্দের সঙ্গে না মিশে আলাদা ভাবে বসে।

কর্তৃকারক ঃ

যে পদ বাক্যের ক্রিয়া সম্পাদন করে, তাকে **কর্তৃকারক** বলে। ক্রিয়াকে **কে** বা **কারা** দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায়, সেটিই হল কতৃকারক।

যেমন— **রাম** বনে ফুল পাড়ে। ('শূন্য' বিভক্তি) ঘরেতে **ভ্রমর** এল। ('শূন্য' বিভক্তি) **বুলবুলিতে** ধান খেয়েছ। ('তে' বিভক্তি) **ছাগলে** কীনা খায়। ('এ' বিভক্তি) **পাগলে** কী না বলে। ('এ' বিভক্তি) **দশে** মিলে করি কাজ। ('এ' বিভক্তি)

কর্মকারক ঃ

ক্রিয়ার আধার বা বিষয়কে কর্ম বলে। যে পদের দ্বারা ক্রিয়ার বিষয়কে বোঝায় তাকে **কর্মকারক** বলে। ক্রিয়াকে **কি** বা **কাকে** দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায় সেটিই কর্মকারক। যেমন— শিশুটি **চাঁদ** দেখে। ('শূন্য' বিভক্তি) **আমাকে** সাহায্য করো। ('কে' বিভক্তি) রাবন **সীতাকে** হরণ করল। ('কে' বিভক্তি) **কলমটি** আমাকে দাও। ('টি' বিভক্তি) রবীন্দ্রনাথ **গীতাঞ্জলি** রচনা করেন। ('শূন্য' বিভক্তি) মেয়েটি **টি.ভি** দেখছে। ('শূন্য' বিভক্তি')

করণকারক ঃ

কর্তা যার দ্বারা কাজটি সম্পন্ন করে তাকে **করণকারক** বলে। ক্রিয়াকে কি দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায়, সেটিই করণকারক।

যেমন— তারা **বল** খেলে। ('শূন্য' বিভক্তি) **ছুরিতে** মাংস কাটল। ('তে' বিভক্তি) তুমি কি **চোখে** কম দেখ? ('এ' বিভক্তি) **পাথরে** পা কাটা গেল। ('এ' বিভক্তি) আকাশ **মেঘে** ঢেকে গেল। ('এ' বিভক্তি) নৌকা **স্রোতে** ভেসে গেল। ('এ' বিভক্তি)

নিমিত্ত কারক ঃ

একে আগে বলা হত সম্প্রদাণ কারক। যাকে কোন কিছুদান করা হতো, পর সম্প্রদান কারক হতো। অর্থাৎ সম্প্রদান কারক পেতে হলে ক্রিয়াকে **কাকে** দিয়ে প্রশ্ন করা হতো। ক্রিয়াপদকে **কে, কীজন্য, কাকে, কাদের** দিয়ে

কারকের নাম
কর্তৃকারক
কর্মকারক
করণ কারক
নিমিত্ত কারক
অপাদান কারক
অধিকরণ কারক

প্রশ্ন করলে **নিমিত্ত কারক** পাওয়া যায়।

যেমন— রাজা গেলেন **শিকারে**। ('এ' বিভক্তি) **অন্ধজনে** দেহ আলো। ('এ' বিভক্তি) **গবেষণার জন্য** সে বিদেশে গেল। ('জন্য' অনুসর্গ) তিনি **ভ্রমণে** গেলেন। ('এ' বিভক্তি) দিব **তোমা** শ্রদ্ধা বিভক্তি। ('শূন্য' বিভক্তি), ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, তৃষ্ণার্তদের জল দাও, বন্যার্তকে ত্রানসামগ্রী দান করা হল।

অপাদান কারক ঃ

যা থেকে কোনো ব্যক্তি বা বস্তুর পতিত, ভীত, গৃহীত, রক্ষিত, উৎপন্ন, মুক্ত, বঞ্চিত, বিরত হওয়া ইত্যাদি বোঝায় তাকে **অপাদান কারক** বলে। ক্রিয়াপদকে কি থেকে দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায়, সেটিই অপাদান কারক।

যেমন— **তিলে** তেল হয়। ('এ' বিভক্তি) **দুধে** ছানা হয়। ('এ' বিভক্তি) **মেঘে** বৃষ্টি হয়। ('এ' বিভক্তি) তার **ভূতে** ভয় নেই। ('এ' বিভক্তি) **চোখ দিয়ে** জল পড়ছে। ('দিয়ে' অনুসর্গ) **বিপদে** মোরে রক্ষা করো। ('এ' বিভক্তি)

অধিকরণ কারক ঃ

অধিকরণ কারকের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ক্রিয়ার আধার। যে স্থানে, যে কালে বা যে ভাবে ক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, সেই স্থান, কাল, অবস্থাকে বলা হয় ক্রিয়ার আধার। অর্থাৎ যে স্থানে বা যে সময়ে কোনো ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, তাকে **অধিকরণ কারক** বলে। ক্রিয়াপদকে **কখন, কোথায়, কিসে** দিয়ে প্রশ্ন করলে যে উত্তরটি পাওয়া যায়, সেটিই অধিকরণ কারক।

যেমন— **বনে** থাকে বাঘ। ('এ' বিভক্তি) সে **দিল্লি** যাবে। ('শূন্য' বিভক্তি) সে কথা **ইতিহাসে** আছে। ('এ' বিভক্তি) সে **অঙ্কে** কাঁচা। ('শূন্য' বিভক্তি)। **আজ** মঙ্গলবার। ('শূন্য' বিভক্তি)। **ঘরেতে** ভ্রমর এল। ('এতে' বিভক্তি)।

অ-কারক সম্বন্ধ

বাক্যে ক্রিয়াপদের সঙ্গে যে সব পদের কোনো সম্বন্ধ থাকে না, তাকে **অ-কারক সম্বন্ধ** বলে। এই অ-কারক সম্বন্ধ দুই প্রকার—১. **সম্বন্ধপদ** ও ২. **সম্বোধন পদ**।

সম্বন্ধ পদ ঃ

বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সঙ্গে অন্য বিশেষ্য বা সর্বনাম পদের সম্বন্ধ থাকলে পূর্ববর্তী বিশেষ্য বা সর্বনাম পদটিকে **সম্বন্ধ পদ** বলে। সম্বন্ধ পদের সঙ্গে বাক্যের ক্রিয়ার কোন যোগ থাকে না। তাই সম্বন্ধ পদ কারক নয়, পদ। সম্বন্ধ পদের সঙ্গে র, এর প্রভৃতি বিভক্তি-চিহ্ন যুক্ত হয়। যেমন-**চোখের** জল বাগ মানল না। **মাঠের** ধান মাঠে শুকিয়ে গেল। **বনের** মধু এনে দিল। **নদীর** জল খুব ঘোলাটে।

সম্বোধন পদ ঃ

ওপরের বাক্যগুলিতে ওহে, ওমা, ওবে, ওগো - এই পদগুলির দ্বারা কাউকে সম্বোধন করে বা ডেকে কিছু বলা হয়েছে। এগুলিকে বলা হয় **সম্বোধন পদ**। এই পদগুলির সঙ্গে ক্রিয়াপদের কোন সম্পর্ক থাকে না। তাই এগুলি কারক নয়, পদ। যাকে সম্বোধন বা আহ্বান করে কিছু বলা হয়, তা হল সম্বোধন পদ। যেমন - **ওহে**, তুমি চুপ করে আছ কেন? **ওমা** কি সর্বনাশ হল। একটু জল দে তো, **আমিনা**। 'ওগো, আজ তোরা যাস নে ঘরের বাহিরে!' **ওরে**, সব তাড়াতাড়ি কর।

মনে রাখবে ঃ

- বাক্যে ক্রিয়াপদের সাথে অন্যান্য পদের যে সম্পর্ক তাকে **কারক** বলে।

- কারক ছয় প্রকার—**কর্তৃকারক, কর্মকারক, করণকারক, নিমিত্ত কারক, অপাদান কারক ও অধিকরণ কারক।**
- বাক্যে ক্রিয়াপদের সাথে যেসব পদের কোনো সম্পর্ক থাকে না তাকে **অ-কারক সম্বন্ধ** বলে।
- অ-কারক সম্বন্ধ দুই প্রকার—**সম্বন্ধ পদ ও সম্বোধন পদ।**
- প্রত্যেক প্রকার কারকের একটি করে উদাহরণ হল—

কর্তৃকারক : **মাছ** জলে খেলা করে।
কর্মকারক : **পাখি** ফল খায়।
করণকারক : **লাঠি** দিয়ে সে সাপ মেরেছে।
নিমিত্ত কারক : **দীনজনে** দয়া করো।
অপাদান কারক : **মেঘে** বৃষ্টি হয়।
অধিকরণ কারক : **জলে** মাছ খেলা করে।

- **সম্বন্ধ পদ ঃ পথের** বন্ধু আপন হল।
- **সম্বোধন পদ ঃ ওহে,** তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন?

অনুশীলনী

১। **নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ**
(ক) কারক কাকে বলে? কারক কয় প্রকার ও কী কী?
(খ) প্রত্যেক প্রকার কারকের একটি করে উদাহরণ দাও?
(গ) অ-কারক সম্বন্ধ কাকে বলে? উদাহরণ দাও।
(ঘ) সম্বন্ধ পদকে কারক বলা হয় না কেন?
(ঙ) ক্রিয়ার আধার বলতে কি বোঝায়?

২। **স্থূলাক্ষর পদগুলির কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করো ঃ**
(ক) **সকলে** এসে উপস্থিত হল।
(খ) রহিম **বল** খেলছে।
(গ) তার **বাঘের** ভয় নেই।
(ঘ) কালো **মেঘে** বৃষ্টি হয়।
(ঙ) সে **কলকাতায়** যাবে।
(চ) **পাথরে** পা কাটা গেল।
(ছ) **ভয়ে** সে আধমরা হয়ে গেল।
(জ) **স্রোতে** নৌকা ভেসে গেল।
(ঝ) রাম বনে **ফুল** পাড়ে।
(ঞ) রাজা গেলেন **শিকারে।**

৩। **প্রত্যেক প্রকার কারকের 'এ' বিভক্তির উদাহরণ দাও।**

৪। **সম্বন্ধ ও সম্বোধন পদগুলি খুঁজে বের করো ঃ**
(ক) মাগো, আমায় ছুটি দিতে বল।
(খ) নদীর জল বড়ো ঠান্ডা।
(গ) দাদা, একটু সাহায্য করবেন?
(ঘ) গাছের আম গাছেই পেকে গেল।
(ঙ) ওরে, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।
(চ) 'হে দারিদ্র, তুমি মোরে করেছ মহান।'

৫। **একটি করে উদাহরণ দাও ঃ**
(ক) অপাদান কারকে 'শূন্য' বিভক্তি।
(খ) অধিকরণ কারকে 'এ' বিভক্তি।
(গ) কর্মকারকে 'কে' বিভক্তি।
(ঘ) নিমিত্ত কারকে 'এ' বিভক্তি।
(ঙ) করণ কারকে 'এ' বিভক্তি
(চ) কর্তৃকারকে 'শূন্য' বিভক্তি।
(ছ) সম্বোধন পদ।
(জ) সম্বন্ধ পদে 'র' বিভক্তি।

অধ্যায় ১১ পদ পরিবর্তন

জলের অপর নাম **জীবন**।	জল পান করেই আমরা **জীবিত** থাকি।

ওপরের বাক্য দুটিতে 'জীবন' ও 'জীবিত' পদ দুটি লক্ষ করো। 'জীবন' হল বিশেষ্য পদ। 'জীবিত' হল বিশেষণ পদ। 'জীবন' কে পরিবর্তন করে 'জীবিত' করা হয়েছে। ব্যাকরণে বিশেষ্য থেকে বিশেষণ অথবা বিশেষণ থেকে বিশেষ্য পদে রূপান্তর করাকে **পদ পরিবর্তন** বলে।

➡ **নীচে পদ পরিবর্তনের কিছু উদাহরণ দেওয়া হল ঃ**

বিশেষ্য থেকে বিশেষণে পরিবর্তন

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
অগ্নি	আগ্নেয়	আবেশ	আবিষ্ট	ক্ষুধা	ক্ষুদিত
অঙ্গ	আঙ্গিক	আবরণ	আবৃত	গর্ব	গর্বিত
অর্জন	অর্জিত	আরম্ভ	আরব্ধ	গমন	গত
অত্যাচার	অত্যাচারিত	আলো	আলোকিত	গাছ	গেছো
অর্থ	আর্থিক	আসন	আসীন	গান	গীত
অনুমান	অনুমিত	আহ্বান	আহূত	গাঁ	গেঁয়ো
অণু	আণবিক	আহরণ	আহৃত	গ্রহণ	গৃহীত
অনুবাদ	অনূদিত	উত্তাপ	উত্তপ্ত	গ্রাম	গ্রাম্য
অনাদর	অনাদৃত	উদয়	উদিত	ঘর	ঘরোয়া
অবসাদ	অবসন্ন	উদ্বেগ	উদ্বিগ্ন	ঘুম	ঘুমন্ত
অভ্যাস	অভ্যস্ত	উপকার	উপকৃত	চোর	চোরাই
অভিশাপ	অভিশপ্ত	উপন্যাস	ঔপন্যাসিক	চরিত্র	চারিত্রিক
অরণ্য	আরণ্যক	উল্লাস	উল্লসিত	চন্দ্র	চান্দ্র
অক্ষর	আক্ষরিক	উৎপত্তি	উৎপন্ন	জল	জলীয়
অংশ	আংশিক	ইতিহাস	ঐতিহাসিক	জন্ম	জাত
আকাশ	আকাশি	ইচ্ছা	ঐচ্ছিক	জন্তু	জান্তব
আকর্ষণ	আকৃষ্ট	কর্ম	কর্মী	জটা	জটিল
আক্রমণ	আক্রান্ত	কাজ	কেজো	জীবন	জীবিত
আঘাত	আহত	ক্রয়	কৃত	জয়	জয়ী
আদি	আদিম	ক্রোধ	ক্রুদ্ধ	তর্ক	তার্কিক
আনন্দ	আনন্দিত	কৌতূহল	কৌতূহলী	তেজ	তেজি

বিশেষ্য	বিশেষণ
তাপ	তপ্ত
তামা	তামাটে
দর্প	দর্পিত
দরদ	দরদি
দল	দলীয়
দোষ	দুষ্ট
দুধ	দুধেল
দুঃখ	দুঃখিত
দান	দেয়
দাঁত	দাঁতাল
দিন	দৈনিক
ধন	ধনী
ধার	ধার্য
ধীর	ধৈর্য
নাশ	নষ্ট
নিন্দা	নিন্দনীয়
পরাজয়	পরাজিত
পরিচয়	পরিচিত
পরীক্ষা	পরীক্ষিত
প্রবেশ	প্রবিষ্ট
প্রসার	প্রসারিত
প্রতিবাদ	প্রতিবাদী
পীড়ন	পীড়িত
প্রকৃতি	প্রাকৃতিক
প্রথম	প্রাথমিক
পিতা	পৈতৃক
পান	পানীয়
পাটনা	পাটনাই
পাথর	পাথুরে
পেট	পেটুক

বিশেষ্য	বিশেষণ
পুষ্প	পুষ্পিত
পুরস্কার	পুরস্কৃত
পুরাণ	পৌরাণিক
পৃথিবী	পার্থিব
প্রণাম	প্রণম্য
ফসল	ফসলী
ফুল	ফলন্ত
ফুল	ফুলেল
বন	বন্য
বধ	বধ্য
বর্ণনা	বর্ণিত
বন্ধ	বন্ধা
বপন	উপ্ত
বরণ	বরণীয়
বায়ু	বায়বীয়
বিভেদ	বিভিন্ন
বিমান	বৈমানিক
বিলাস	বিলাসী
ভয়	ভীত
ভাত	ভেতো
ভূত	ভৌতিক
ভ্রম	ভ্রান্ত
মরণ	মৃত
মাছ	মেছো
মাটি	মেটে
মাঠ	মেঠো
মিথ্যা	মিথ্যুক
মুখ	মৌখিক
মূল	মৌলিক
মৃন্ময়	মৃন্ময়ী

বিশেষ্য	বিশেষণ
যন্ত্র	যান্ত্রিক
রচনা	রচিত
রস	রসাল
রসায়ন	রাসায়নিক
লয়	লীন
লাজ	লাজুক
লাভ	লব্ধ
শরীর	শারীরিক
শরৎ	শারদীয়
শহর	শহুরে
শাসন	শাসিত
শাস্ত্র	শস্ত্রীয়
শ্রদ্ধা	শ্রদ্ধেয়
শ্রম	শ্রান্ত
সন্দেহ	সন্দিগ্ধ
সন্ধ্যা	সান্ধ্য
সময়	সাময়িক
সমুদ্র	সামুদ্রিক
স্বর্গ	স্বর্গীয়
স্মরণ	স্মরণীয়
সংকেত	সাংকেতিক
স্বাধীন	স্বাধীনতা
সাহস	সাহসী
সৎ	সততা
সংযোগ	সংযুক্ত
সংসার	সাংসারিক
সুন্দর	সৌন্দর্য
হেমন্ত	হৈমন্তিক
হিংসা	হিংসুক
হিম	হিমেল

বিশেষণ
যান্ত্রিক
রচিত
রসাল
রাসায়নিক
লীন
লাজুক
লব্ধ
শারীরিক
শারদীয়
শহুরে
শাসিত
শস্ত্রীয়
শ্রদ্ধেয়
শ্রান্ত
সন্দিগ্ধ
সান্ধ্য
সাময়িক
সামুদ্রিক
স্বর্গীয়
স্মরণীয়
সাংকেতিক
স্বাধীনতা
সাহসী
সততা
সংযুক্ত
সাংসারিক
সৌন্দর্য
হৈমন্তিক
হিংসুক
হিমেল

বিশেষণ থেকে বিশেষ্যে পরিবর্তন

বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য
অতিশয়	আতিশয্য	দৃঢ়	দৃঢ়তা	বিস্মৃত	বিস্মৃয়
অধিক	আধিক্য	ধীর	ধৈর্য	বৈধ	বিধি
অপমানিত	অপমান	নারকীয়	নরক	বৈষয়িক	বিষয়
অলস	আলস্য	নিকট	নৈকট্য	ব্যাহত	ব্যাঘাত
অস্থির	অস্থিরতা	নিন্দনীয়	নিন্দা	বুদ্ধিমান	বুদ্ধিমত্তা
অধীন	অধীনতা	নিরাশ	নৈরাশ্য	মধুর	মাধুর্য
আরাধ্য	আরাধনা	নীচ	নীচতা	মহৎ	মহত্ব
আংশিক	অংশ	নীল	নীলিমা	মানসিক	মন
ইচ্ছুক	ইচ্ছা	প্রিয়	প্রীতি	মৌখিক	মুখ
উগ্র	উগ্রতা	প্রচুর	প্রাচুর্য	শঠ	শঠতা
উদিত	উদয়	প্রবল	প্রাবল্য	শহুরে	শহর
উচ্চ	উচ্চতা	পৈতৃক	পিতা	শোষিত	শোষণ
উজ্জ্বল	ঔজ্জ্বল্য	পাশ্চাত্য	পশ্চাৎ	শীত	শৈত্য
উত্থিত	উত্থান	পানীয়	পান	শারদীয়	শরৎ
উদ্যত	উদ্যম	পঙ্কিল	পঙ্ক	শাঁসালো	শাঁস
উদার	ঔদার্য	পৈশাচিক	পিশাচ	শাক্ত	শক্তি
উচিত	ঔচিত্য	পুরস্কৃত	পুরস্কার	শ্রদ্ধেয়	শ্রদ্ধা
উদ্বিগ্ন	উদ্বেগ	পাকা	পাকামি	সন্ধানী	সন্ধান
উন্নীত	উন্নত	পাগল	পাগলামি	সর্বনাশা	সর্বনাশ
উপবিষ্ট	উপবেশন	পাপিষ্ট	পাপ	সমাহিত	সমাধি
উষ্ণ	উষ্ণতা	বন্য	বন	সুজন	সৌজন্য
উৎকৃষ্ট	উৎকর্ষ	বাচাল	বাক	সুন্দর	সৌন্দর্য
চঞ্চল	চাঞ্চল্য	বাস্তব	বাস্তবতা	স্বতন্ত্র	স্বাতন্ত্র্য
চতুর	চাতুর্য	বাষ্পীয়	বাষ্প	স্বাধীন	স্বাধীনতা
চালাক	চালাকি	বিকশিত	বিকাশ	সোনালি	সোনা
চোর	চৌর্য	বিকীর্ণ	বিকিরণ	সৌর	সূর্য
দরিদ্র	দরিদ্র্য	বিচিত্র	বৈচিত্র্য	সৎ	সততা
দীর্ঘ	দৈর্ঘ্য	বিপরীত	বৈপরীত্য	স্নিগ্ধ	স্নেহ
দীন	দীনতা,দৈন্য	বিষণ্ণ	বিষাদ	হিমেল	হিম
দূর	দূরত্ব	বিস্তীর্ণ	বিস্তার	হত	হত্যা

অনুশীলনী

১। **বিশেষ্য বিশেষণ উল্লেখ করে পদান্তর করো ঃ**

ইচ্ছা, অধিক, সন্দেহ, ভূগোল, মধুর, শরৎ, মঙ্গল, সোনালি, ঈশ্বর, বন্য, দারিদ্র্য, শীত, আনন্দিত, নাগরিক, জন্তু, পরাজয়, চন্দ্র, সূর্য, পৌরাণিক, লীন।

২। **নীচের শব্দগুলোর পদান্তর করো এবং শূন্যস্থানে সঠিক জায়গায় বসাও ঃ**

সৎ, স্বাধীনতা, হিম, পাপ, প্রচুর, প্রাবল্য, সাহস, শহর, রসাল, মৃত।

(ক) ছেলেটি খুব _____।

(খ) এই মাটিতে _____ নেই।

(গ) _____ একটি মহৎ গুণ।

(ঘ) বীরেরা _____ কে কখনও ভয় পান না।

(ঙ) এবার বাজারে আমের _____ নেই।

(চ) _____ ভাবে শীত পড়েছে।

(ছ) আমরা _____ দেশের নাগরিক।

(জ) _____ হাওয়া বইছে।

(ঝ) _____ মানুষেরা একটু আরামপ্রিয়।

(ঞ) _____ লোককে বিশ্বাস করো না।

৩। **সঠিক উত্তরের মাথায় (✓) চিহ্ন দাও ঃ**

(ক) দান — (বিশেষ্য/বিশেষণ) (খ) বৈচিত্র্য — (বিশেষ্য/বিশেষণ)

(গ) শাক্ত — (বিশেষ্য/বিশেষণ) (ঘ) শৈত্য — (বিশেষ্য/বিশেষণ)

(ঙ) জীবন — (বিশেষ্য/বিশেষণ) (চ) শারদীয় — (বিশেষ্য/বিশেষণ)

(ছ) মৃন্ময় — (বিশেষ্য/বিশেষণ) (জ) সাহসী — (বিশেষ্য/বিশেষণ)

৪। **পদান্তর ঘটিত ভুলগুলো সংশোধন করো ঃ**

(ক) তার চালাক ধরা পড়ে গেছে।

(খ) এই বাড়িটার স্থায়ী খুব কম।

(গ) বাতাসে জল বাষ্পের পরিমাণ বেশি।

(ঘ) তাদের মধ্যে অনেক বিপরীত আছে।

(ঙ) আমাদের মুখ পরীক্ষা হয়ে গেছে।

রিদ্র্য, শীত, আনন্দিত,

অধ্যায় ১২ বিপরীতার্থক শব্দ

➡ **নীচের বাক্যগুলো লক্ষ করো ঃ**

সুখ-দুঃখ নিয়েই তো জীবন।
সংসারে **ভালো-মন্দ** সবই আছে।
চৈতন্যদেব **উচ্চ-নীচ** ভেদ মানতেন না।
খেলায় **জয়-পরাজয়** থাকবেই।

ওপরের বাক্যগুলোতে 'সুখ-দুঃখ', 'ভালো-মন্দ', 'উচ্চ-নীচ', 'জয়-পরাজয়' শব্দযুগল পরস্পরের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছে। আমরা প্রতিদিনের জীবনে এমনি অনেক শব্দই ব্যবহার করি যেগুলো একে অপরের বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে থাকে। এগুলোকে **বিপরীতার্থক শব্দ** বলে।

আমাদের কবি-সাহিত্যিকরাও এমন বিপরীতার্থক শব্দ তাঁদের রচনায় ব্যবহার করেছেন। যেমন—

'**পুণ্যে-পাপে, দুঃখে-সুখে, পতনে-উত্থানে**, মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।'

-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

'তুমি **অধম**, তাই বলিয়া আমি **উত্তম** হইব না কেন।' — *বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়*

নীচে কিছু বিপরীতার্থক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হল —

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
অধম	উত্তম	অন্যায়	ন্যায়	আকার	নিরাকার
অংশ	পূর্ণ	অবনতি	উন্নতি	আমিষ	নিরামিষ
অগ্র	পশ্চাৎ	অনুরাগ	বিরাগ	আসামী	ফরিয়াদী
অজ্ঞ	বিজ্ঞ	অবতরণ	আরোহণ	ইতর	ভদ্র
অগ্রজ	অনুজ	অন্ত	আদি	ইহলোক	পরলোক
অল্প	বিস্তর	আয়	ব্যয়	ইচ্ছা	অনিচ্ছা
অশুচি	শুচি	আরম্ভ	সমাপন	ইমান	বেইমান
অধমর্ণ	উত্তমর্ণ	আকাশ	পাতাল	উৎপত্তি	বিনাশ
অসীম	সসীম	আবাহন	বিসর্জন	উত্তর	দক্ষিণ
অবনত	উন্নত	আসল	নকল	উচিত	অনুচিত
অপকার	উপকার	আশা	নিরাশা	উদ্যত	নিরস্ত
অবিচার	সুবিচার	আনন্দ	নিরানন্দ	উদয়	অস্ত
অনাহার	আহার	আপন	পর	উত্তম	অধম
অন্তর	বাহির	আবির্ভাব	তিরোভাব	উর্বর	অনুর্বর
অলস	পরিশ্রমী	আস্তিক	নাস্তিক	উদার	অনুদার
অমৃত	গরল	আলো	অন্ধকার	উপকার	অপকার
অসুস্থ	সুস্থ	আচার	অনাচার	উষ্ণ	শীতল

শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ	শব্দ	বিপরীতার্থক শব্দ
ঊর্ধ্ব	অধঃ	দৃঢ়	শিথিল	ভন্ড	সাধু
ঋজু	বক্র	দয়ালু	নিষ্ঠুর	ভূত	ভবিষ্যৎ
একাল	সেকাল	দাতা	গ্রহীতা	মুখ্য	গৌণ
একতা	বিচ্ছিন্নতা	দুরন্ত	শান্ত	মূর্খ	পন্ডিত
ঐক্য	অনৈক্য	নিন্দা	প্রশংসা	মৌন	মুখর
কৃশ	স্থূল	নন্দিত	নিন্দিত	মধুর	তিক্ত
কৃতজ্ঞ	কৃতঘ্ন	নিদ্রা	জাগরণ	মরণ	বাঁচন
ক্রেতা	বিক্রেতা	নরক	স্বর্গ	মিহি	মোটা
কাপুরুষ	বীরপুরুষ	নাশ	সৃষ্টি	মিলন	বিচ্ছেদ
কনিষ্ঠ	জ্যেষ্ঠ	নতুন	পুরানো	যুদ্ধ	শান্তি
কুৎসিৎ	সুন্দর	নিকৃষ্ট	উৎকৃষ্ট	রাজা	প্রজা
কোমল	কঠিন,কঠোর	নাস্তিক	আস্তিক	রসিক	বেরসিক
কৃপণ	উদার	পরাধীন	স্বাধীন	লাভ	লোকসান
ক্ষয়িষ্ণু	বর্ধিষ্ণু	পাশ	ফেল	লোকালয়	নির্জন
ক্ষুদ্র	বৃহৎ	প্রবেশ	প্রস্থান	শাপ	বর
গ্রহণ	বর্জন	প্রাচীন	নবীন	শক্তি	দৌর্বল্য
গৃহী	সন্ন্যাসী	প্রতিকূল	অনুকূল	শুদ্ধ	অশুদ্ধ
গূঢ়	ব্যক্ত	পাপ	পুণ্য	সংকুচিত	প্রসারিত
গরিষ্ঠ	লঘিষ্ঠ	পতন	উত্থান	সত্য	মিথ্যা
গুণ	দোষ	প্রসন্ন	বিষন্ন	সমষ্টি	ব্যষ্টি
গরম	ঠান্ডা	প্রভু	ভৃত্য	সহজ	কঠিন
জমা	খরচ	পুরস্কার	তিরস্কার	সাকার	নিরাকার
জল	স্থল	বিষ	অমৃত	সার্থক	নিরর্থক
জন্ম	মৃত্যু	বোকা	চালাক	সবল	দুর্বল
জঙ্গম	স্থাবর	বন্ধন	মুক্তি	সৃষ্টি	ধ্বংস
জোয়ার	ভাটা	বন্ধু	শত্রু	সমতল	বন্ধুর
জয়	পরাজয়	বিবাদ	শান্তি	সুর	অসুর
জটিল	সরল	বর্তমান	অতীত	হাসি	কান্না
জড়	জীব	বিষাদ	হর্ষ	হার	জিৎ
তরুণ	বৃদ্ধ	বিদায়	আগমন	হর্ষ	বিষাদ
ত্বরণ	মন্দন	ভারি	হালকা	হত	জীবিত
দূর	নিকট	ভীরু	নির্ভীক	হায়া	বেহায়া

➡ **একই বাক্যে পরস্পর বিপরীতার্থক শব্দের প্রয়োগ ঃ**

● **আদি-অন্ত ঃ** আকাশের **আদি-অন্ত** কিছুই নেই। ● **অবনতি-উন্নতি ঃ অবনতি-উন্নতির** পথ ধরেই এগিয়ে যেতে হবে। ● **আসল-নকল ঃ** বাজারে **আসল-নকলের** ভিড়ে আমরা দিশাহারা। ● **উষ্ণ-শীতল ঃ উষ্ণ-শীতল** জলে স্নান করবে। ● **লঘু-গুরু ঃ লঘু** পাপে তাকে **গুরু** দন্ড দেওয়া হল। ● **অগ্র-পশ্চাৎ ঃ অগ্র-পশ্চাৎ**

বিপরীতার্থক শব্দ
সাধু
ভবিষ্যৎ
গৌণ
পণ্ডিত
মুখর
তিক্ত
বাঁচন
মোটা
বিচ্ছেদ
শান্তি
প্রজা
বেরসিক
লোকসান
নির্জন
বর
দৌর্বল্য
অশুদ্ধ
প্রসারিত
মিথ্যা
ব্যষ্টি
কঠিন
নিরাকার
নিরর্থক
দুর্বল
ধ্বংস
বন্ধুর
অসুর
কান্না
জিৎ
বিষাদ
জীবিত
বেহায়া

উন্নতির পথ ধরেই
া। ● **উষ্ণ-শীতল ঃ**
পশ্চাৎ ঃ অগ্র-পশ্চাৎ

বিবেচনা করে কাজ করবে। ● **দাতা-গ্রহীতা ঃ** ঈশ্বর **দাতা** আর আমরা **গ্রহীতা**। ● **গ্রহণ-বর্জন ঃ** গাছ কার্বন ডাই অক্সাইড **গ্রহণ** করে এবং অক্সিজেন **বর্জন** করে। ● **প্রভু-ভৃত্য ঃ** ঈশ্বর **প্রভু** আর আমরা তাঁর **ভৃত্য**। ● **সুখ-দুঃখ ঃ সুখ-দুঃখ** জীবনেরই অঙ্গ। ● **চড়াই-উৎরাই ঃ** পাহাড়ের **চড়াই-উৎরাই** পথ ধরে আমরা অগ্রসর হতে লাগলাম। ● **জীবন-মরণ ঃ** মানুষকে **জীবন-মরণ** যুদ্ধ করেই বেঁচে থাকতে হয়। ● **অমৃত-গরল ঃ** সমুদ্র মন্থনে **অমৃতের** পর **গরল** উঠেছিল। ● **উৎকৃষ্ট-নিকৃষ্ট ঃ** রানিগঞ্জের কয়লা **উৎকৃষ্ট**; কিন্তু দার্জিলিংয়ের কয়লা **নিকৃষ্ট**। ● **অসীম-সীমা ঃ** 'সীমার মাঝে **অসীম** তুমি বাজাও আপন সুর।'

অনুশীলনী

১। শূন্যস্থানে উপযুক্ত বিপরীত শব্দ বসাও ঃ

ক) বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা দূরকে____ করেছি। খ) জীবনে উত্থান যেমন আছে, তেমনি আছে____। গ) সত্যকে আঁকড়ে ধরো____কে বর্জন করো। ঘ) পরাজয়ই হল____লাভের পথ। ঙ) অগ্র____বিবেচনা করে কাজ করবে। চ) পরকে____করতে হলে প্রতিভার প্রয়োজন। ছ) রাত____ছেলেটি পড়াশুনা নিয়েই থাকে। জ) বিদ্যাসাগরের বাইরেটা কঠিন থাকলেও অন্তরটা ছিল____। ঝ) পরাধীন ভারত____হয়েছে। ঞ) শত্রু____চিনে তবে পথ চলবে।

২। নীচের শব্দগুলোর বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ

সমষ্টি, আবির্ভাব, যুদ্ধ, পরাজয়, মধুর, অমৃত, উন্নত, আসামী, স্থাবর, হ্রাস, উদয়, উত্তীর্ণ, গ্রহণ, দাতা, জোয়ার, ভীরু, পুরস্কার, উৎকৃষ্ট, উচ্চ, বন্ধু।

৩। বিপরীতার্থক শব্দ-যুগলের মিল করো ঃ

নবীন	সরল	প্রভু	সমতল
জটিল	বক্র	ঋজু	প্রবীণ
মিলন	ভৃত্য	বন্ধুর	বিচ্ছেদ

৪। নীচের বিপরীতার্থক শব্দযুগল দিয়ে বাক্যরচনা করো ঃ

স্বর্গ-নরক, জীবন-মরণ, উত্থান-পতন, উচ্চ-নীচ, পাপ-পুণ্য, আকাশ-পাতাল, ঠাণ্ডা-গরম, কঠিন-কোমল, দেশ-বিদেশ, সমষ্টি-ব্যষ্টি।

৫। পরস্পর বিপরীতার্থক শব্দগুলো বেছে নিয়ে শূন্যস্থানে বসাও ঃ

(ক) জলে-স্থলে মানুষ আধিপত্য বিস্তার করেছে।
(খ) এই পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে প্রকৃতির নিয়মে, আবার ধ্বংসও হবে সেইভাবে।
(গ) শত্রু অনেক সময় মিত্র হয়ে ওঠে।
(ঘ) আকাশ আর পাতাল এখনও মানুষের কাছে রহস্যময়।
(ঙ) শুধু লাভ আশা করো না; লোকসানও ধরে রেখো।

উঃ (ক) _____
(খ) _____
(গ) _____
(ঘ) _____
(ঙ) _____

অধ্যায় ১৩ সমার্থক শব্দ

➡ **নীচের বাক্যগুলো লক্ষ করো ঃ**

পদ্ম আমাদের জাতীয় ফুল।
সরোবরে **শতদল** ফুটেছে।
পঙ্কজ শোভিত সরোবর দেখে সবাই মুগ্ধ হল।
'মধুহীন করো না গো, তব মন **কোকনদে**।'

ওপরের বাক্যগুলোতে পদ্ম, শতদল, পঙ্কজ, কোকনদ শব্দগুলির একই অর্থ। আমাদের এই পৃথিবীতে যে সব প্রাণী, বস্তু, গাছপালা আমরা দেখি তাদের একাধিক নাম আছে। ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রয়োগ করে সেই নাম প্রকাশ করা হয়। নাম ভিন্ন হলেও শব্দের অর্থ কিন্তু এক। ভিন্ন শব্দ, কিন্তু অর্থ একই—এই ধরণের শব্দকে **সমার্থক শব্দ** বলে।

➡ **কিছু সমার্থক শব্দের উদাহরণ দেওয়া হল ঃ**

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিষয়ক ঃ

হাত—হস্ত, বাহু, পানি, ভুজ, কর।
চোখ—চক্ষু, নেত্র, নয়ন, লোচন, আঁখি, অক্ষি।
কান—কর্ণ, শ্রবণ, শ্রুতি, শ্রবণেন্দ্রিয়।
মাথা—মস্তক, মুণ্ড, শির।
মুখ—বদন, আনন, আস্য, মুখমণ্ডল।
দাঁত—দন্ত, দশন, রদ।
পা—চরণ, পদ, পাদ।
চুল—চিকুর, কেশ, কুন্তল, অলক।
নাক—নাসিকা, ঘ্রাণেন্দ্রিয়, নাসা।
পেট—উদর, জঠর, কুক্ষি।
শরীর—বপু, কলেবর, তনু।
ঘাড়—অংস, গ্রীবা, স্কন্ধ।
ঠোঁট—ওষ্ঠ, অধর।

পরিজন বিষয়ক ঃ

বাবা—পিতা, জনক, বাপ, তাত, আব্বা, পালক।
মা—মাতা, জননী, গর্ভধারিণী, অম্বা, পালিকা, জন্মদাত্রী।
পুত্র—তনয়, নন্দন, আত্মজ, ছেলে, সুত, কুমার।
কন্যা—তনয়া, নন্দিনী, আত্মজা, মেয়ে, দুহিতা, পুত্রী।
বন্ধু—মিতা, সখা, সুহৃদ, মিত্র, বান্ধব, সহচর।
বোন—ভগ্নী, সহোদরা।
ভাই—ভ্রাতা, সহোদর।
স্বামী—পতি, নাথ, প্রভু, ভর্তা।
স্ত্রী—জায়া, দারা, পত্নী, ভার্যা।

পশুপাখি-জীবজন্তু বিষয়ক ঃ

ময়ূর—শিখী, অহিভূক, কলাপী।
মাছ—মীন, মৎস।

হরিণ—মৃগ, কুরঙ্গম, কুরঙ্গ।
সাপ—সর্প, অহি, নাগ, ভুজঙ্গ।
মৌমাছি—মধুপ, ভ্রমর, অলি, মধুকর।
হাতি—হস্তী, গজ, মাতঙ্গ, করী, দন্তী।
গোরু—গাভী, গো, ধেনু।
বানর—শাখামৃগ, কপি, মর্কট।
কুকুর—শ্বাপদ, সারমেয়, কুক্কুর।
ঘোড়া—তুরগ, তুরঙ্গম, ঘোটক, অশ্ব, বাজী।
সিংহ—পশুরাজ, কেশরী, মৃগেন্দ্র, মৃগরাজ।
পাখি—খেচর, বিহঙ্গ, বিহগ, পক্ষী।
বাঘ—শার্দূল, ব্যাঘ্র, শের।

দেবদেবী বিষয়ক ঃ

শিব—মহাদেব, মহেশ, মহেশ্বর, কৈলাসনাথ।
দুর্গা—উমা, পার্বতী, চণ্ডী।
লক্ষ্মী—নারায়ণী, কমলা, বিষ্ণুপ্রিয়া, ক্ষীরোদা।
সরস্বতী—বীণাপাণি, বাগ্‌দেবী, ভারতী, সারদা।
ঈশ্বর—ভগবান, আল্লা, বিধাতা, বিধি, পরমেশ্বর।

পরিবেশ বিষয়ক ঃ

গৃহ—বাড়ি, সদন, আলয়, নিকেতন, আবাস, বাটী।
গাছ—বৃক্ষ, তরু, মহীরুহ, উদ্ভিদ, শাখী।
পদ্ম—উৎপল, পঙ্কজ, শতদল, কমল।
ফুল—পুষ্প, কুসুম, প্রসূন।
বন—অটবি, অরণ্য, কানন, জঙ্গল।

প্রাকৃতিক বস্তু বিষয়ক ঃ

আগুন—অগ্নি, অনল, বহ্নি, পাবক, হুতাশন।
জল—নীর, বারি, অপ, উদক, অম্বু, পয়ঃ।
আকাশ—গগন, অন্তরীক্ষ, ব্যোম, শূন্য, বিমান।
সূর্য—অরুণ, রবি, তপন, ভানু, দিবাকর, অর্ক।
চাঁদ—চন্দ্র, শশী, ইন্দু।
পৃথিবী—অবনী, ধরা, মেদিনী, বসুধা, ধরণি, ভুবন।
নদী—তটিনী, সরিৎ, প্রবাহিনী, স্রোতস্বিনী, তরঙ্গিনী।
বাতাস—বায়ু, অনিল, পবন, সমীরণ, মরুৎ।
সমুদ্র—সাগর, অর্ণব, সিন্ধু, জলধি, পারাবার।
পাহাড়—পর্বত, শৈল, গিরি, শিখর, অদ্রি।
মেঘ—নীরদ, জলদ, বারিদ, জলধর।
আলো—আলোক, দীপ্তি, প্রভা, বিভা, জ্যোতি।
রাত্রি—রজনী, যামিনী, নিশি, রাত, তমস্বিনী।
দিন—দিবস, দিবা, অহ্ন, বাসর।
বিদ্যুৎ—সৌদামিনী, দামিনী, তড়িৎ, চপলা, বিজলি।
গ্রাম—পল্লি, সাকিন, পত্তন, গাঁ।
আঁধার—তমসা, তমিস্রা, অন্ধকার।

অন্যান্য ঃ

রাস্তা—সরণি, সড়ক, পথ, মার্গ।
বস্ত্র—বসন, বাস, অম্বর, পরিচ্ছদ, কাপড়।
লতা—বল্লরী, ব্রততী, বল্লী।
শিক্ষক—মাস্টার, গুরু, আচার্য, অধ্যাপক, শিক্ষাদাতা।
ছাত্র—শিক্ষার্থী, বিদ্যার্থী, পড়ুয়া, শিষ্য।

অনুশীলনী

১। তিনটি করে প্রতিশব্দ লেখো ঃ

শব্দ	প্রতিশব্দ
পৃথিবী	
বিদ্যুৎ	
সিংহ	
মাথা	
বন	
পাখি	
পর্বত	
পদ্ম	

শব্দ	প্রতিশব্দ
সরস্বতী	
হাতি	
সাপ	
মেঘ	
সমুদ্র	
সূর্য	
চাঁদ	
আকাশ	

২। মোটা হরফের পদগুলির বদলে একটি করে সমার্থক শব্দ বসাও ঃ

(ক) দিঘিতে **কমল** ফুটেছে।
(খ) **দিনমনি** ডুবে যাচ্ছে।
(গ) বিদ্যালয়ে **বাগ্‌দেবীর** পুজো হবে।
(ঘ) আকাশে **মেঘ** ঘন হয়ে এল।
(ঙ) **পথ** খুব দুর্গম।
(চ) '**আলোয়** মাঠের কোল ভরেছে।'
(ছ) 'জাগরণে যায় **বিভাবরী**।'
(জ) ধীরে **বাতাস** বইছে।
(ঝ) সীতা হলেন জনক রাজার **কন্যা**।
(ঞ) **পুষ্পে** সাজাও বরণডালা।

৩। শূন্যস্থানে একটি প্রতিশব্দ বসাও ঃ

(ক) তপন=_____
(খ) সৌদামিনী=_____
(গ) শাখী=_____
(ঘ) অহি=_____
(ঙ) অদ্রি=_____
(চ) ক্ষীরোদা=_____
(ছ) মহেশ=_____
(জ) শতদল=_____
(ঝ) তড়িৎ=_____
(ঞ) সরিৎ=_____

৪। যেটি সমার্থক শব্দ নয় সেটি কেটে দাও ঃ

পর্বত—গিরি, শতদল, শিখর।

পক্ষী—খেচর, উভয়চর, খগ।

গৃহ—আবাস, ভবন, বামা।

ঈশ্বর—পরমেশ্বর, সরিৎ, ভগবান।

বিদ্যুৎ—ক্ষণপ্রভা, চপলা, অপলা।

অধ্যায় ১৪ সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ

বর্ষা নেমেছে।

মেয়েটি বর্শা ছুঁড়ছে।

ওপরের প্রথম ছবিতে 'বর্ষা' আর দ্বিতীয় ছবিতে 'বর্শা' পদ দুটির একই উচ্চারণ। কিন্তু এদের অর্থ আলাদা। বর্ষা **ঋতু** বিশেষ, বর্শা **তীর** জাতীয় অস্ত্র। এই ধরণের শব্দগুলোকে **সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ** বলে। অর্থ অনুযায়ী এদের বানান ঠিকমতো মুখস্থ রাখতে হবে। না হলে বাক্যের অর্থ পাল্টে যাবে। নীচে এই ধরনের কতকগুলি শব্দ ও তাদের অর্থ দেওয়া হল ঃ

➡ **কিছু উদাহরণ লক্ষ করো ঃ**

অনিল— বাতাস।
অনীল—যা নীল নয়।

অন্ন—ভাত।
অন্য—অপর।

অনুপ—উপমাহীন।
অনূপ—জলময় স্থান।

অন্নদা—ভগবতী।
অন্যদা—অন্যদিন।

অর্ঘ—মূল্য
অর্ঘ্য—পূজার উপকরণ।

অশিত—ভক্ষিত।
অসিত—কৃষ্ণবর্ণ।

অশ্ব—ঘোড়া।
অশ্ম—পাথর।

অবদান—কীর্তি।
অবধান—মন দিয়ে শোনা।

আপন—নিজ।
আপণ—দোকান।

আবরণ—আচ্ছাদন।
আভরণ—অলংকার।

আভাষ—আলাপ।
আভাস—ইঙ্গিত।

আশি—সংখ্যা বিশেষ।
আশী—দাঁত।

আসার—প্রবল বর্ষণ।
আষাঢ়—মাস বিশেষ।

ইহা—এই।
ঈহা—ইচ্ছা।

ইতি—শেষ।
ঈতি—শস্যের ষড়বিঘ্ন।

উপাদান—উপকরণ।
উপাধান—বালিশ।

কমল—পদ্ম।
কোমল—নরম।

করি—ক্রিয়ার রূপ বিশেষ।
করী—হাতি।

কুজন—খারাপ লোক।
কূজন—পাখির ডাক।

কুল—বংশ।
কূল—নদীর তীর।

কালি—রং বিশেষ।
কালী—দেবী বিশেষ।

কৃত্তিবাস—শিব।
কীর্তিবাস—যশস্বী।

কটি—কোমর।
কোটি—সংখ্যা বিশেষ।

গিরিশ—মহাদেব।
গিরীশ—হিমালয়।

চাষ—কৃষিকাজ।
চাস—নীলকণ্ঠ পাখি।

চির—চিরকাল।
চীর—ছিন্নবস্ত্র।

জাতি—বংশ,বর্ণ।
জাতী—মালতি ফুল।

জ্বর—রোগবিশেষ।
জড়—অচেতন।

কাটা—ছেদন করা।
কাঁটা—কণ্ঠক।

বিনা—ছাড়া।
বীণা—বাদ্যযন্ত্র বিশেষ।

জাম—ফলবিশেষ।
যাম—প্রহর।

জ্যোতি—কিরণ।
যতি—সন্ন্যাসী।

তদীয়—তাহার।
ত্বদীয়—তোমার।

দারা—স্ত্রী, পত্নী।
দ্বারা—দিয়া/দিয়ে।

দিন—দিবস।
দীন—দরিদ্র।

দিনেশ—সূর্য।
দীনেশ—দরিদ্রের বন্ধু।

দীপ—প্রদীপ।
দ্বীপ—জলবেষ্ঠিত ভূ-ভাগ।

দেশ—রাষ্ট্র।
দ্বেষ—হিংসা।

ধুনি—সন্ন্যাসীর অগ্নিকুন্ড।
ধুনী—নদী।

ধুম—জাঁকজমক।
ধূম—ধোঁয়া।

লক্ষ—দেখা, সংখ্যাবিশেষ।
লক্ষ্য—উদ্দেশ্য।

শকল—মাছের আঁশ।
সকল—সমস্ত।

পানি—জল।
পাণি—হাত।

শাপ—অভিশাপ।
সাপ—সর্প।

ধ্বনি—আওয়াজ।
ধণী—ধনবান।

শারদা—দূর্গা।
সারদা—সরস্বতী।

নিপ—কলস।
নীপ—কদম্ব।

শূর—বীর
সুর—দেবতা, কণ্ঠস্বর।

নির্—উপসর্গ বিশেষ।
নীর—জল।

সুত—পুত্র।
সূত—সারথি।

পরভৃৎ—কাক।
পরভৃত—কোকিল

সাক্ষর—অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন।
স্বাক্ষর—সই, দস্তখত।

পুত—পুত্র।
পূত—পবিত্র।

সার্থ—বণিক দল।
স্বার্থ—নিজ।

বাণ—তীর।
বান—বন্যা।

ভাষ—কথা।
ভাস—দীপ্তি।

বিশ—সংখ্যা বিশেষ
বিষ—গরল।
বিস—পদ্মের মৃণাল।

আশা—বাসনা।
আসা—আগমন।

পড়া—পাঠ করা।
পরা—পরিধান করা।

সকল—সমস্ত।
শকল—মাছের আঁশ।

অনুশীলনী

১। **অর্থের পার্থক্য লেখো ঃ**

সারদা		দিন		বর্শা		শঙ্কর	
শারদা		দীন		বর্ষা		সংকর	
বিষ		গিরিশ		যতি		ধ্বনি	
বিশ		গিরীশ		জ্যোতি		ধ্বনী	
ইতি		সকল		অনিল		পানি	
ঈতি		শকল		অনীল		পাণি	

২। **বাক্য রচনার মাধ্যমে অর্থের পার্থক্য দেখাও:**

কুল	
কূল	
জাম	
যাম	
চাষ	
চাস	
অবদান	
অবধান	
দেশ	
দ্বেষ	
পরভৃৎ	
পরভৃত	
দীপ	
দ্বীপ	
পুত	
পূত	
বিশ	
বিষ	

৩। **বাক্যগুলোকে শুদ্ধ করো ঃ**

(ক) এখন বর্শা কাল। (খ) দ্বীপ জ্বলছে। (গ) সে অন্য খাচ্ছে। (ঘ) তার কাছে কটি টাকা আছে। (ঙ) গাছে যাম পেকেছে। (চ) দ্বারা পুত্র কন্যা নিয়ে আমাদের পরিবার। (ছ) সাপের আশিতে বিস থাকে। (জ) সাগরের কুলকিনারা নেই। (ঝ) অশ্ম ছুটছে। (ঞ) সরোবরে কোমল ফুটে রয়েছে।

অধ্যায় ১৫ বিরাম চিহ্ন

আমরা যখন কথা বলি অথবা বই পড়ি তখন এক নিশ্বাসে বলতে বা পড়তে পারি না। আর তেমন করলে কোনো অর্থ বোঝা যায় না। কথা বলার সময় বা লেখার সময়, এমনকি কোনো কিছু পড়ার সময় বাক্যের মাঝে মাঝে থামতে হয়। এই থামার নাম **বিরাম**। যে চিহ্নের সাহায্যে থামার কথা বোঝানো হয় তার নাম **বিরাম চিহ্ন**। কোথায় কতটুকু সময় থামতে হবে, বা মনের ভাব কী ভাবে প্রকাশ করতে হবে, সেই অনুসারে নানা ধরণের বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। বাংলায় ব্যবহৃত বিরাম চিহ্ন গুলি হল— কমা (,), দাঁড়ি (।), সেমিকোলন (;), কোলন (ঃ), ড্যাশ (—), হাইফেন (-), বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!), প্রশ্ন চিহ্ন (?), উদ্ধৃতি চিহ্ন (“ ”) ইত্যাদি।

কমা (,)

বাক্যে অল্প সময়ের জন্য থামতে হলে অথবা পরপর কিছুর উল্লেখ করতে হলে কমা (,) ব্যবহৃত হয়। যেমন— আগে কিছু খেয়ে নেব, তারপর খেলতে যাব। নান্টু, ঝন্টু, অমল, পিংকু—এরা সবাই খেলবে।

দাঁড়ি (।)

বাক্যে পূর্ণসময়ের জন্য থামতে দাঁড়ি (।) বসে। দাঁড়ি বসিয়েই বাক্য শেষ করা হয়। যেমন— ঘড়িতে দশটা বাজল। এখন স্কুলে যেতে হবে। আর দেরি করলে চলবে না।

সেমি কোলন (;)

কমার (,) চেয়ে, একটু বেশি থামতে সেমিকোলন (;) ব্যবহার করা হয়। যেমন— সে দরিদ্র ; কিন্তু সৎ। অনেকেই কবিতা লেখেন; তবে সবাই কবি নন।

কোলন (ঃ)

কোনো বিষয় জানার প্রয়োজনে অথবা আলোচনাকালে পূর্ণ পরিণতি দেখানোর জন্য কোলন (ঃ) বসে। যেমন— আমাদের জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটি ঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক। পৃথিবীর দুটো ভাগ। যথা ঃ জীব ও জড়।

ড্যাশ (—)

এককথার সঙ্গে অন্যকথার আকাঙ্ক্ষা থাকলে বা কোনো বিষয়ের উদাহরণ দিতে ড্যাশ (—) বসে। যেমন— তাঁর লেখা বইগুলি হল—গণদেবতা, কবি, কালিন্দী, পঞ্চগ্রাম, ধাত্রীদেবতা ইত্যাদি। রাম, শ্যাম, যদু, রাহিম—এরাই তো ক্লাবের প্রাণ।

হাইফেন (-)

দুই বা ততোধিক পদের সংযোগ করতে হাইফেন (-) ব্যবহৃত হয়। যেমন— সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, জামা-কাপড় ইত্যাদি।

বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!)

বিস্ময়, মনের ভাব, আবেগ বোঝাতে বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) বসে। যেমন— কী মজা! পাখির কী কপাল! আহা! কী দেখলাম!

▶▶ প্রশ্ন চিহ্ন (?)

কোনো কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হলে প্রশ্ন চিহ্ন (?) বসে। যেমন— তোমার নাম কী? কী জন্য কাঁদছ?

▶▶ উদ্ধৃতি চিহ্ন (“ ”)

কারো বক্তব্য, গ্রন্থ বা উদ্ধৃতিকে হুবহু তুলে ধরতে এই চিহ্ন (“ ”) বসে। যেমন— তিনি বললেন, “মানুষ হও।” রবীন্দ্রনাথ “গীতাঞ্জলি” রচনা করেন।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ঃ

(ক) বিরাম চিহ্ন কাকে বলে?

(খ) বিভিন্ন ধরনের বিরাম চিহ্নের উল্লেখ করো।

(গ) বিরাম চিহ্নের প্রয়োজনীয়তা কী? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও।

২। নীচের বাক্যগুলিতে উপযুক্ত স্থানে বিরাম চিহ্ন বসাও ঃ

(ক) শরৎচন্দ্র পথের দাবী রচনা করেন

(খ) হরিহর বাবু বললেন আজ ঝড় উঠবে

(গ) কী সুন্দর দৃশ্য

(ঘ) তুমি কি স্কুলে যাবে

(ঙ) ভালোমন্দ সাদাকালো উচুঁনীচু জগতে সবই আছে

(চ) রবীন্দ্রনাথের নাটকগুলি হল ডাকঘর রক্তকরবী মুক্তধারা রাজর্ষি বিসর্জন ইত্যাদি

(ছ) যাব যাব করি কিন্তু আর যাওয়া হয় না

(জ) কমল মধু রহিম এরাই তো পাড়ার ভালো ছেলে

৩। নীচের চিহ্নগুলো বসিয়ে এক একটি বাক্য তৈরি করো ঃ

(ক) দাঁড়ি (।) ঃ _____

(খ) কমা (,) ঃ _____

(গ) সেমিকোলন (;) ঃ _____

(ঘ) ড্যাশ (—) ঃ _____

(ঙ) প্রশ্নচিহ্ন (?) ঃ _____

(চ) বিস্ময়সূচক চিহ্ন (!) ঃ _____

(ছ) উদ্ধৃতি চিহ্ন (“ ”) ঃ _____

(জ) কোলন (ঃ) ঃ _____

অধ্যায় ১৬ শুদ্ধ বানান

লেখার ক্ষেত্রে 'বানান ভুল' একটি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি। শুদ্ধ বানান না লিখতে পারলে বিষয়বস্তুর অর্থ পরিস্ফুট হয় না। এই বানান ভুলের জন্য পরীক্ষার খাতায় নম্বরও কমে যায়। সাধারণত ব্যাকরণগত অজ্ঞতার জন্যই বেশিরভাগ বানান ভুল হয়। এই বিষয়ে শিক্ষার্থীকে খুব সতর্ক হতে হবে। প্রতিদিন লেখার জন্য যে সব বানান আমরা ব্যবহার করি তার কিছু শুদ্ধ রূপ দেওয়া হল। এগুলি বার বার লেখার অভ্যাস করলে বানান ভুলের সংখ্যা কমে আসবে।

অ, আ ই, ঈ ঘটিত শব্দ

অতিথি	নিশীথ	মনীষী	জাপানি	পাখি	কৃষিজীবী	পৃথিবী	দ্বিতীয়
অধিবাসী	ওকালতি	শাড়ি	বিভীষিকা	ভাগীরথী	নিরীহ	পিপীলিকা	মাস্টারি
হাতি	প্রতিযোগী	দধীচি	বাড়ি	কালিদাস	উদীচী	বাঙালি	পাণিনি
বাল্মীকি	গাড়ি	কিরীটী	প্রতীতি	নেপালি	অতীত	মরীচিকা	দীপান্বিতা

উ, ঊ ঘটিত শব্দ

শূন্য	বায়ু	নূপুর	ভুল	দুর্গা	ভুবন	কৌতূহল	বধূ
পুণ্য	মুমূর্ষু	অদ্ভুত	মধুসূদন	পূজা	শুশ্রূষা	বিদুষী	মূর্খ
পূর্ণ	মুহূর্ত	দূষণ	কটূক্তি	পুজো	কৌতুক	ভূষণ	দুর্গ
ময়ূর	রূপা	ভূত	প্রতিকূল	দূর্বা	দুরবস্থা	পূর্ব	সূর্য

ণ, ন ঘটিত শব্দ

প্রাঙ্গণ	প্রণাম	গণনা	অজ্ঞান	নির্ণয়	ঘ্রাণ	অপরাহ্ণ	গুণ
অঘ্রান	বাণিজ্য	আহ্নিক	বীণা	বিষন্ন	ঋণ	বর্ষণ	নারায়ণ
গৌণ	রামায়ণ	বিভীষণ	রসায়ন	ফাল্গুন	মধ্যাহ্ন	প্রাঙ্গণ	অগ্রহায়ণ

শ, ষ, স ঘটিত শব্দ

শিষ্য	সমস্ত	বিস্ময়	সূচি	শস্য	নিষ্পত্তি	রোগগ্রস্ত	পরিস্ফুট
আবিষ্কার	অনশন	বিষম	তিরস্কার	নৃশংস	দুর্বিষহ	পুরস্কার	শংসাপত্র
পরিষেবা	পরিষ্কার	বাষ্প	শৌখিন	বহিষ্কার	নিস্পৃহ	শুচি	নমস্কার
সুষমা	মুখস্থ	নিষ্পন্দ	জাতিস্মর	বিস্ময়	হরিষেণ	ভস্ম	নিস্ব

ট, ঠ ঘটিত শব্দ

পৃষ্ঠা	দৃষ্টি	ভূমিষ্ঠ	গোষ্ঠী	অভীষ্ট	কনিষ্ঠ	গরিষ্ঠ	কৃষ্টি
যথেষ্ট	লঘিষ্ঠ	জ্যৈষ্ঠ	সৃষ্ট	বৃষ্টি	রাষ্ট্র	বলিষ্ঠ	কাষ্ঠ

্য, ্যা ঘটিত শব্দ

ব্যয়	ব্যক্তি	ব্যবস্থা	ব্যাকরণ	ব্যগ্র	ব্যঞ্জন	ব্যাঘাত	ব্যসন
ব্যবহার	ব্যাহত	ব্যাট	ব্যবসায়	ব্যায়াম	ব্যতীত	ব্যবধান	ব্যঙ্গ
ব্যথা	ব্যাবসায়িক	ব্যাবসা	ব্যষ্টি	ব্যাধি	ব্যতিরেক	ব্যতিক্রম	ব্যাখ্যা

সন্ধি ঘটিত শব্দ

শিরোধার্য	মনোহর	অত্যধিক	অনুমত্যনুসারে	পুরোহিত	জাত্যভিমান	মনোযোগ	অত্যন্ত
গবেষণা	অত্যাচার	পরীক্ষা	জগদীশ	উজ্জ্বল	নীতীশ	উচ্ছ্বাস	অতীত
স্বাগত	অদ্যাপি	দুরাচার	দুরবস্থা	ইতস্তত	বাগীশ্বরী	প্রতীক্ষা	দুর্যোগ

বিবিধ শব্দ

বৃহস্পতি	সান্ত্বনা	রাষ্ট্রীয়	শ্মশান	কল্যানীয়াসু	নিশ্বাস	কেন্দ্রীয়	স্বাক্ষর
কল্যানীয়েষু	শারীরিক	বঙ্গীয়	পাশ্চাত্য	আকাঙ্ক্ষা	দারিদ্র্য	দাশরথি	প্রায়শ্চিত্ত
সরস্বতী	ভৌগোলিক	রাবণি	স্বাচ্ছন্দ	লক্ষ্মণ	প্রতিযোগিতা	বাগীশ্বরী	অশ্বত্থ
পৌরোহিত্য	সহযোগিতা	সন্ন্যাসী	পাণিনি	সমীচীন	স্বত্ব	মন্বন্তর	শরণ

অনুশীলনী

১। নীচের বানানগুলি শুদ্ধ করে লেখো ঃ

ভাগিরথী, মূহূর্ত, পূন্য, আবিষ্কার, দূর্গা, প্রতিযোগীতা, ব্যাবধান, মধ্যাহ্ন, অপরাহ্ন, ঋন।

২। শুদ্ধ বানানটি বেছে নাও ঃ

ক) পিপিলিকা/পিপীলিকা খ) নুপুর / নূপুর গ) বাল্মিকী / বাল্মীকি
ঘ) মুহূর্ত / মুহুর্ত ঙ) ভৌগলিক / ভৌগোলিক চ) ব্যথা / ব্যাথা
ছ) ব্যাবধান / ব্যবধান জ) ব্যকরণ / ব্যাকরণ ঝ) কিরীটী / কিরীটি
ঞ) কৌতুক / কৌতূক

৩। শুদ্ধ ও ভুল বানান আলাদা করে লেখো ঃ

পরিস্কার, অনুমত্যনুসারে, কল্যান, রামায়ণ, অজ্ঞাণ, পুরস্কার, পূর্বাহ্ন, অধ্যয়ন, দূর্গাপুজা, সমিচীন।

ভুলবানান	শুদ্ধবানান
১।	১।
২।	২।
৩।	৩।
৪।	৪।
৫।	৫।

অধ্যায় ১৭ দেওয়াল পত্রিকা

➡ দেওয়াল পত্রিকা কী ঃ

তোমরা স্টেশনে, বাসস্ট্যান্ডে বা ক্লাবের দেওয়ালে জাল দেওয়া কাঠের বাক্সের মধ্যে নানা ধরনের লেখা ও আঁকা সম্বলিত একধরনের পত্রিকা দেখে থাকবে। একটি আর্টপেপারে হাতে লেখা এই ধরনের পত্রিকাকে **দেওয়াল পত্রিকা** বলে। সাধারণত দেওয়ালে টাঙানো থাকে বলে এর এরূপ নাম। স্কুলেও এই ধরণের পত্রিকা দেখা যায়। স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের ঘরের দরজার পাশে বা স্কুলের অফিসের দরজার পাশে কাঠের বাক্সে এটি টাঙানো থাকে।

➡ দেওয়াল পত্রিকার উদ্দেশ্য ঃ

ধূপের মধ্যে যেমন সুগন্ধি লুকিয়ে থাকে, ফুলের মধ্যে যেমন সৌরভ, তেমনি তোমাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে নানা প্রতিভা। তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটলেই সত্যিকারের মানুষ হওয়া যায়। মনের আবেগ, ভাবনা ও কল্পনাকে লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করার নাম সাহিত্য। কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ইত্যাদিকে সাহিত্য বলে। বিদ্যালয় পত্রিকা হল সাহিত্য-প্রতিভা বিকাশের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজস্ব লেখা প্রকাশ করতে পারে। ক্রমাগত লিখতে লিখতে একসময় তারা দক্ষ হয়ে ওঠে। আজকের যাঁরা বড়ো কবি-সাহিত্যিক তাঁরা প্রত্যেকেই বিদ্যালয় পত্রিকায় তাঁদের প্রথম লেখা প্রকাশ করেছেন। এছাড়া যে সব ছাত্র-ছাত্রী ছবি আঁকা খুব পছন্দ করে তাদের ছবিও দেওয়াল পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। বিদ্যালয় পত্রিকা হল প্রতিভা বিকাশের প্রথম সোপান। ছাপা পত্রিকা বছরে একবার প্রকাশিত হয়। কিন্তু দেওয়াল পত্রিকা প্রতিমাসে বা তিনমাস অন্তর প্রকাশ করা যেতে পারে। দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশে খরচও খুব অল্প। সুতরাং বিদ্যালয়ের পক্ষে দেওয়াল পত্রিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

➡ কীভাবে দেওয়াল পত্রিকা তৈরি করতে হয় ঃ

১। প্রথমে একটি আয়তাকার কাঠের বাক্স তৈরি করতে হবে, যার সামনে কাঠের ফ্রেমের সঙ্গে লাগান থাকবে তারের জাল।

২। ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের লেখা সংগ্রহ করতে হবে। গল্প, কবিতা, রম্যরচনা, ক্যুইজ,

প্রবন্ধ প্রভৃতি বিষয়গুলি লেখার মধ্যে থাকবে। এছাড়া ছবি আঁকা ও তার বর্ণনা থাকবে।

৩। প্রাপ্ত লেখা থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক রচনা, আঁকা-ছবি বাছাই করে নিতে হবে।

৪। একটি পূর্ণমাপের আর্টপেপারে লেখাগুলো লিখে ফেলতে হবে। যার হাতের লেখা সুন্দর তাকে দিয়েই লেখাতে হবে।

৫। যে আঁকতে পারে তাকে দিয়ে অলংকরণ করাতে হবে।

৬। পত্রিকাকে সুন্দর করার জন্য নানা ধরণের কালি ব্যবহার করা যেতে পারে।

৭। পত্রিকার একটি নামকরণ করতে হবে। সেই নামটি পত্রিকার ওপরে মাঝখানে বড়ো হরফে লিখতে হবে। যেমন— বলাকা, মানসী, বনানী প্রভৃতি নাম দেওয়া যেতে পারে।

৮। একজন শিক্ষক বা শিক্ষিকা এর সম্পাদক হবেন। দু'জন ছাত্র বা ছাত্রী প্রতিনিধি হিসাবে থাকবে, তাদের নামও পত্রিকায় উল্লেখ থাকবে।

৯। ছবি প্রকাশের ক্ষেত্রে আঠা বা বোর্ডপিন দ্বারা সরাসরি পত্রিকায় আটকে দিতে হবে।

১০। সব কিছু সম্পূর্ণ হলে আর্টপেপারটি কাঠের বাক্সে পিন দিয়ে আটকে দিতে হবে। এরপর দেওয়ালে টাঙিয়ে দিলেই সুন্দর একটি দেওয়াল পত্রিকা তৈরি হয়ে যাবে।

অনুশীলনী

১। নীচের প্রশ্নোগুলোর উত্তর দাও ঃ

(ক) দেওয়াল পত্রিকা কাকে বলে?

(খ) দেওয়াল পত্রিকা কীভাবে তৈরি হয়?

(গ) দেওয়াল পত্রিকায় কী ধরনের লেখা থাকে?

(ঘ) দেওয়াল পত্রিকায় কারা লেখে?

(ঙ) দেওয়াল পত্রিকা কতদিন অন্তর প্রকাশিত হতে পারে?

(চ) ছাত্রজীবনে দেওয়াল পত্রিকার গুরুত্ব কতখানি?

(ছ) একটি দেওয়াল পত্রিকার খসড়া প্রস্তুত করো।

অধ্যায় ১৮ দিনলিপি প্রস্তুত বা ডায়েরি লিখন

মানুষের নানা ধরনের শখ থাকে। কেউ বাগান করে, কেউ ডাকটিকিট সংগ্রহ করে, কেউ বা ছবি আঁকে। কেউ আবার প্রতিদিনের জীবনযাপনকে লিপিবদ্ধ করে রাখে। প্রতিদিনের জীবনযাপনকে লিখে রাখার নাম দিনলিপি বা ডায়েরি। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিয়মিত এই ডায়েরি লিখতেন। তাঁর 'জীবনস্মৃতি' গ্রন্থটি আসলে একখানি সমৃদ্ধ দিনলিপি।

➡ দিনলিপির গুরুত্ব ঃ

সারাদিন আমরা যা করি সেগুলো গুছিয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এই দিনলিপি আসলে ব্যক্তির ধারাবাহিক জীবন ইতিহাস। বহু ঘটনার সাক্ষি হয়ে এই দিনলিপি ভবিষ্যতে স্মৃতির অ্যালবাম হয়ে ওঠে। নিয়মিত ডায়েরি লেখার মধ্যে দিয়ে ভাষা প্রয়োগের দক্ষতা বাড়ে। বিষয়কে সংক্ষিপ্ত আকারে গুছিয়ে লেখার যে দক্ষতা তৈরি হয়, তা আগামী দিনে ব্যবহারিক জীবনে ভীষণ কাজে লাগে। আজকের শিশুই তো ভবিষ্যতের সুনাগরিক। সেও একদিন দেশ ও দশের একজন হয়ে উঠতে পারে। দিনলিপি ভবিষ্যতে জীবনের ইতিহাস হয়ে তখন তার অতীত জীবনকে ভাস্বর করে তুলবে। আবার সেই দিনলিপি অন্যদেরও জীবন সংগ্রামের পাথেয় হতে পারে। দিনলিপি লেখার মধ্যে দিয়েও সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ ঘটে। আমাদের বাংলাদেশের অনেক কবি-সাহিত্যিকদের দিনলিপি আছে। রবীন্দ্রনাথের দিনলিপি তো সেরা সাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। তাই ছাত্র-ছাত্রীদের উচিত প্রত্যেকদিন দিনলিপি সংক্ষিপ্ত আকারে লিপিবদ্ধ করা।

➡ কীভাবে দিনলিপি লিখতে হয় তার কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল ঃ

আজ বুধবার। সকালে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল। তারপর হলুদ রোদের ছড়াছড়ি। প্রতিদিনের মতো আজও আমি ঠিক ছ'টায় ঘুম থেকে উঠেছি। তারপর বাঁধা নিয়মে পড়তে বসা। স্কুলের সব পড়াগুলো একবার করে সব ঝালিয়ে নেওয়া। স্নান যাওয়ার ঠিক ১০টায় বেরিয়ে পড়া। আজ স্কুলে একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। ক্লাসে এসে বাংলার স্যার অমিতবাবু আমাদের কবিতা লিখতে দিয়েছিলেন। প্রথম লাইনটা তিনি বোর্ডে লিখে দিয়েছিলেন। তারপর আমাদের আর তিনটি লাইন মিল করে লিখতে বললেন। আমরা খুব মনোযোগ সহকারে লিখেছিলাম। তাঁর দেওয়া প্রথম লাইনটা ছিল—'কোথায় গেল শালিখ টিয়া'—। আমি ঠিক এই ভাবে কবিতাটিকে রূপ দিলাম—

'কোথায় গেল শালিখ টিয়া/ভাবছি মনে মনে,
রাগ করে কি উড়েই গেল/অনেক দূরে বনে!'

স্যার দেখে তো খুব খুশি। তিনি আমাকে একটা কলম উপহার দিলেন। বাড়িতে মা-বাবা দেখে বাহবা দিল। বন্ধুরা অবশ্য 'কবি' বলে ক্ষ্যাপাতে শুরু করল। সন্ধ্যের সময় পড়ার দিদিমণি এসে কবিতাটি দেখে খুব খুশি হলেন। রাত যখন দশটা, তখন মা খেতে ডাকল। খেয়ে দেয়ে আজকের মতো কর্মে বিরতি দিয়ে ঘুমোতে গেলাম।

লেকটাউন, কলকাতা
১৮.১০.১২

➡ একটি ছুটির দিন কেমন কেটেছিল তা নিয়ে একটি দিনলিপি ঃ

আজ ২৫ বৈশাখ। রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। স্কুল ছুটি। তবে কবির জন্মদিন পালনের জন্য আমাদের স্কুলে যেতে হয়েছিল। সকাল ৬ টায় আমরা স্কুলে উপস্থিত হয়েছিলাম। ৬.৩০ মিনিটে প্রভাত ফেরী। আমরা তাতে পা মিললাম। মাইকে বাজছিল রবীন্দ্র সংগীত। সামনে একটি গাড়িতে রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতি। কবির বাণী দিয়ে গাড়িটা সাজানো। কবির প্রতিকৃতিতে ফুলের মালা। আমরা শহর পরিক্রমা করে এসে আবার ফিরে এলাম স্কুলে। এক ঘন্টার 'কবি প্রণাম' অনুষ্ঠান বেশ জমে উঠল। কবিতা, গান, বক্তৃতায় জমজমাট আসর। তারপর সকাল ৯টা নাগাদ বাড়ি ফিরে ছুটির আনন্দ উপভোগ। পাড়ায় পাড়ায় চলছে রবীন্দ্রজয়ন্তী। বিকেলে শহরের রাস্তায় মানুষের ঢল। যেন কোনো উৎসব চলছে। আজ আর পড়ার তাড়া নেই। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা খুশির দিন উপভোগ করতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে হল।

নবদ্বীপ,
০৯.০৫.১৩

➡ বিদ্যালয়ের কোনো স্মরণীয় দিনকে নিয়ে একটি দিনলিপি ঃ

আজ আমাদের বিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল খুব ধুমধাম করে। জ্ঞানীগুণী মানুষদের সমাবেশে যেন চাঁদের হাট বসেছিল। ফুল-পাতা দিয়ে সাজানো হয়েছিল সুদৃশ্য মঞ্চ। অনুষ্ঠান শুরু হল ঠিক বেলা ১২ টায় রবীন্দ্রনাথের গান দিয়ে। সুরের প্রবাহে আমরা ভেসে গেলাম ভাবের জগতে। তারপর প্রধান শিক্ষক মহাশয় রাখলেন তাঁর ভাষণ। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম। গত পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার জন্য আমি পেলাম সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কাকাবাবু সমগ্র'। প্রধান অতিথি মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী আমাদের হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন। সবশেষে আমরা অভিনয় করলাম সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান' নাটক। বেশ আনন্দেই কাটল আজকের দিনটা।

কলকাতা,
১৫.০৯.১৩

অধ্যায় ১৯ বোধ-পরীক্ষণ

'বোধ' কথার অর্থ হল ধারণা বা উপলব্ধি। আর বোধ-পরীক্ষণ হল সেই ধারণা বা উপলব্ধিকে যাচাই করা। কোনো একটি বিষয় পরিপূর্ণভাবে বোধগম্য হয়েছে কিনা বোধ-পরীক্ষণের মাধ্যমে তা যাচাই করা হয়। গদ্যের একটি বিশেষ অনুচ্ছেদ বা পদ্যের এক বা একাধিক স্তবক উদ্ধৃত করা হয়। সেটিকে মনোযোগ সহকারে পাঠ করে তা থেকে যে সব প্রশ্ন করা হয় তার যথাযথ উত্তর দিতে হয়।

➡ **কীভাবে বোধ-পরীক্ষণের উত্তর দিতে হয় ঃ**

১। মূল রচনা বা রচনাংশটি মনোযোগ সহকারে পড়ে তার সঠিক অর্থ বুঝে নিতে হবে।

২। লেখক বা কবি যা বলতে চান তার অনুকূলেই মনকে চালিত করতে হবে।

৩। প্রশ্নগুলোর উত্তর রচনাংশের কোথায় আছে তা নির্ধারণ করে সম্পূর্ণ নিজের ভাষায় উত্তর দিতে হবে।

৪। উত্তর কখনও রচনাংশের মূল বক্তব্যের বাইরে যাবে না।

৫। সম্পূর্ণ চলিতভাষায় উত্তর লিখতে হবে।

৬। প্রসঙ্গের বাইরে অতিরিক্ত কিছু লেখা যাবে না।

➡ **তোমাদের সুবিধার জন্য কয়েকটি বোধ-পরীক্ষণের উদাহরণ দেওয়া হল ঃ**

১. গল্পে যাই থাকুক, দু-এক জাতের বিষাক্ত মাকড়সা ছাড়া সাধারণত এরা মানুষের অপকার তো করেই না, বরং মশা, মাছি প্রভৃতি অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ শিকার করে মানুষের উপকারই করে থাকে। তাছাড়া মাকড়সা সম্বন্ধে এমন অনেক কাহিনি শোনা যায় যাতে স্বভাবতই এই প্রাণীদের প্রতি একটা সহৃদয় মনোভাব জাগ্রত হওয়াই উচিত।

শোনা যায়, হজরত মোহম্মদ যখন মদিনায় এক গুহার মধ্যে লুক্কায়িতভাবে অবস্থান করছিলেন, তখন আততায়ীরা তাঁর সন্ধানে সেই গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পায়, গুহার প্রবেশ পথে মাকড়সার জাল বিস্তৃত রয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যে কেউ এই গুহায় প্রবেশ করে থাকলে মাকড়সার জাল থাকতে পারে না—একথা ভেবে আততায়ীরা তখন তাঁর সন্ধানে অন্য দিকে চলে গেল। মাকড়সার জালই সেই যাত্রায় মহাপুরুষের প্রাণ রক্ষার কারণ হয়েছিল।

বাংলার কীটপতঙ্গ — গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

➡ **ওপরের গদ্যাংশটি পড়ে নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ**

■ **প্রশ্ন ঃ** ক) সব মাকড়সাই কি বিষাক্ত?

খ) মাকড়সা কীভাবে আমাদের উপকার করে?

গ) মাকড়সার উপকারের একটি উদাহরণ দাও।

ঘ) মাকড়সার জাল কীভাবে হজরত মোহম্মদের প্রাণরক্ষা করেছিল?

উত্তর ঃ ক) না, সব মাকড়সাই বিষাক্ত নয়। দু'এক জাতের বিষাক্ত মাকড়সা ছাড়া সাধারণত এরা মানুষের উপকারই করে।

খ) মাকড়সা যে জাল পেতে রাখে, তাতে মশা, মাছি ও নানা ধরনের অনিষ্টকারী কীট-পতঙ্গ আটকে পড়ে।

গ) মশা আমাদের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছড়ায়। মাকড়সা জালের সাহায্যে এদের ধরে খেয়ে ফেলে।

ঘ) একবার হজরত মোহম্মদ শত্রুদের ভয়ে এক গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। মাকড়সা সেই গুহার দ্বারে জাল বুনে রেখে দেয়। আঁততায়ী সেই জাল দেখে বুঝে নেয় এখানে মানুষ থাকতে পারে না। তাহলে দরজায় জাল থাকত না।

২. বিরসা কি ভগবান? বিরসা কি মানুষ? বিরসা আজ ওদের কাছে ভগবান। কিন্তু এই 'ভগবান'-ই মুন্ডা জাতিকে যুদ্ধ করতে নামিয়েছিল ইংরেজের সঙ্গে। তাই বিরসা মুন্ডা সকল মুন্ডার কাছে, সকল আদিবাসীর কাছে, সিদু ও কানুর মতোই এক পরম প্রিয় নাম। গরিব মুন্ডা মায়ের ছেলে বিরসা চলে গেছে সেই কবে। কিন্তু আজও যারা জমিদার, মহাজন, ঠিকাদারদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়ছে, তারা বিরসার সেই শেষ-না-হওয়া লড়াইটা লড়ছে। বিরসাও তো লড়েছিল সিদু-কানুর শেষ-না-হওয়া এক লড়াই। আজ যেখানে যে আদিবাসী হকের লড়াই লড়ে, সে লড়ে সিধু-কানু ও বিরসার লড়াই। শাল গাছের ফুল ফোটার যেমন শেষ নেই, তেমনি শেষ থাকে না এসব যুদ্ধের।

বিরসার যুদ্ধের নাম উল্‌গুলান, সাঁওতালদের ১৮৫৫-৫৬ সালের গণবিদ্রোহের নাম হুল্। এ ছাড়াও আদিবাসীদের মধ্যে বারবার বহু বিদ্রোহ হয়েছে ও হয়ে চলেছে। *বিরসা মুন্ডা—মহাশ্বেতা দেবী*

■ **প্রশ্ন ঃ** ক) বিরসা কে?

খ) সিধু ও কানু কে?

গ) বিরসার যুদ্ধের নাম কী?

ঘ) 'হুল' কী?

ঙ) বিরসা বিখ্যাত কেন?

উত্তর ঃ ক) বীরসা হলেন মুন্ডা বিদ্রোহের নেতা।

খ) সিধু ও কানু হলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের দু'জন নেতা।

গ) বিরসার যুদ্ধের নাম উল্‌গুলান।

ঘ) সাঁওতালদের ১৮৫৫-৫৬ সালের গণবিদ্রোহের নাম 'হুল'।

ঙ) বিরসা একটা লড়াইয়ের নাম। তাঁর দেখানো পথেই আজও আদিবাসীরা লড়াই করে চলেছে।

৩। আজ দিনের শুরুতেই একটা বিশ্রী কান্ড ঘটে গেল।

রোজকার মতো আজও নদীর ধারে মর্নিং ওয়াক সেরে ফেলেছি। শোবার ঘরে ঢুকতেই একটা বিদঘুটে চেহারার লোকের সামনে পড়তে হল। চমকে গিয়ে চিৎকার করেই বুঝতে পারলাম যে ওটা আসলে আয়না, এবং লোকটা আর কেউ নয়—আমারই ছায়া। এ ক'বছরে আমারই চেহারা ওই রকম হয়েছে। আমার আয়নার প্রয়োজন হয় না বলে ওটার ওপর ক্যালেন্ডারটা টাঙিয়ে রেখেছিলাম; আজ সকালেই বোধহয় প্রহ্লাদটা বছর শেষ হয়ে গেছে বলে সর্দারি করে ওটাকে নামিয়ে রেখেছে। ওকে নিয়ে আর পারা গেল না। সাতাশ বছর ধরে আমার সঙ্গে থেকে আমার কাজ করেও ওর বুদ্ধি হল না। আশ্চর্য!

চিৎকার শুনে প্রহ্লাদ ঘরে এসে পড়েছিল। ওকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার মনে করে আমার Snuffgun বা নস্যাস্ত্রটা ওর ওপর পরীক্ষা করা গেল। দেখলাম, এ নস্যির যা তেজ, তাক করে গোঁফের কাছাকাছি মারতে

পারলেই যথেষ্ট কাজ হয়! এখন রাত এগারোটা। ওর হাঁচি এখনও থামেনি। আমার হিসেব যদি ঠিক হয় তো তেত্রিশ ঘন্টার আগে ওর হাঁচি থামবে না।

প্রফেসর শঙ্কু—সত্যজিৎ রায়

■ **প্রশ্ন ঃ** ক) বক্তা কোথা থেকে ফিরছিলেন?
খ) বক্তা ঘরে ঢুকে চিৎকার করছিলেন কেন?
গ) বক্তার চাকরের নাম কী?
ঘ) বক্তা কীভাবে চাকরকে শিক্ষা দিলেন?

উত্তর ঃ ক) বক্তা নদীর ধার থেকে মর্নিং ওয়াক সেরে ফিরছিলেন।
খ) বক্তা ঘরে ঢুকেই বিদ্‌ঘুটে চেহারার একজন লোক দেখে চমকে উঠে চিৎকার করছিলেন। আসলে ঘরের আয়নায় বক্তা নিজের ছবি দেখে এরূপ করেছিলেন।
গ) বক্তার চাকরের নাম প্রহ্লাদ।
ঘ) বক্তা চাকরকে শিক্ষা দেবার জন্য তার নাকে নস্যি দিলেন। আর তাতেই প্রহ্লাদের বিরামহীন হাঁচি শুরু হল।

৪। লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্ভবত দেখা হয়নি। কিন্তু বাংলার অজ্ঞাত পল্লি প্রত্যন্তের অবজ্ঞাত লোকশিল্পীদের সম্পর্কে তাঁর দরদ ও কৌতূহল ছিল বলে লালন শিষ্যদের সঙ্গে তিনি কথাবার্তা বলতেন, তাঁদের কাছে লালনের গান শুনতেন। শুধু তাঁরাই নন, ঐ অঞ্চলের গোঁসাই রামলাল, গোঁসাই গোপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্ঠমী আর কীর্তনীয়া শিবু সা-র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। স্বীকার করেছেন, 'বাউলের গান শিলাইদহের খাঁটি বাউলের মুখে শুনেছি ও তাদের পুরাতন খাতা দেখেছি'।

এই খাতা প্রসঙ্গে অনেক মজার কথা মনে আসে। লালনের গান ভাল লেগেছিল বলে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জমিদারি এস্টেটের কর্মচারীদের দিয়ে লালনের গানের দুটো খাতা নকল করিয়ে এনেছিলেন। সে খাতাদুটো এখনও বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে সযত্নে রাখা আছে।

লালন—সুধীর চক্রবর্তী

■ **প্রশ্ন ঃ** ক) রবীন্দ্রনাথ লালনের শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলতেন কেন?
খ) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কাদের যোগাযোগ ছিল?
গ) রবীন্দ্রনাথ লালনের গান কোথা থেকে সংগ্রহ করেন?
ঘ) লালনের গানের খাতা কোথায় রাখা আছে?

উত্তর ঃ ক) রবীন্দ্রনাথ লালনের শিষ্যদের সঙ্গে কথা বলতেন কারণ, লোকশিল্পীদের ওপর তাঁর দরদ ও কৌতূহল ছিল অপার।
খ) রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে গোঁসাই রামলাল, গোঁসাই গোপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী আর কীর্তনীয়া শিবু সা-র যোগাযোগ ছিল।
গ) শিলাইদহে থাকাকালীন সেখানকার বাউলদের কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথ লালনের গান সংগ্রহ করেন।
ঘ) লালনের গানের খাতা এখনও বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনে রাখা আছে।

৫। মানুষের সঙ্গ পেয়ে বেঁচে থাকে বসত-বাড়িটা। যতোক্ষণ মানুষ আছে বাড়িতে, ভূত-ভবিষ্যৎ- বর্তমানের ধারা বইয়ে ততোক্ষণ চলেছে বাড়ি, হাব-ভাব চেহারা ও ইতিহাস বদলে বদলে। কালে কালে স্মৃতিতে ভরে, বাড়ি-স্মৃতির মাঝে বেঁচে থাকে বাড়ির সমস্তটা। বাড়ি ঘর জিনিসপত্র সবই স্মৃতির গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা থাকে একালের

সঙ্গে। এইভাবে চলতে চলতে, একদিন যখন মানুষ ছেড়ে যায় একেবারে বাড়ি, স্মৃতির সূত্রজাল উর্ণার মতো উড়ে যায় বাতাসে,তখন মরে বাড়িটা যথার্থ ভাবে। প্রত্নতত্ত্বের কোঠায় পড়ে জানায় শুধু, সেটা দিশি ছাঁদের না বিদেশি ছাঁদের, মোগল ছাঁদের না বৌদ্ধ ছাঁদের। তারপর একদিন আসে কবি, আসে আর্টিস্ট। বাঁচিয়ে তোলে মরা ইঁট কাঠ পাথর এবং ইতিহাস-প্রত্নতত্ত্বের মুর্দাখানার নম্বর-ওয়ারি করে ধরা জিনিসপত্রগুলোকেও তারা নতুন প্রাণ দিয়ে দেয়। সঙ্গা পাচ্ছে মানুষের, তবে বেঁচে উঠেছে ঘর বাড়ি সবই। *আপনকথা—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর*

■ **প্রশ্ন ঃ** ক) বসত বাড়ি কী ভাবে বেঁচে থাকে?
খ) মানুষ মরে গেলে বাড়ির অবস্থা কেমন হয়?
গ) মরা বাড়ি কীভাবে আবার বেঁচে ওঠে?

উত্তর ঃ ক) বসত বাড়ি বেঁচে থাকে মানুষের সঙ্গা পেয়ে। খ) মানুষ মরে গেলে বাড়িও মরে যায়।
গ) মরা বাড়িতে আসেন কবি, আর্টিস্ট। তাঁরা ইঁট, কাঠ, পাথর এবং ইতিহাস প্রত্নতত্ত্বের মুর্দাখানার নম্বর ওয়ারি জিনিসপত্রকে নতুন প্রাণ দিয়ে দেন। এইভাবেই মরা বাড়ি আবার জীবন্ত হয়ে ওঠে।

অনুশীলনী

অনুচ্ছেদগুলো মন দিয়ে পড়ো এবং নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও ঃ

১। পলাশীর যুদ্ধের শতবর্ষ পরে এল ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দ। ভারতের ইতিহাসে এই বছরটি স্মরণীয় এই কারণে যে, 'সিপাহী বিদ্রোহ বা যুদ্ধই ভারতের প্রথম মুক্তিযুদ্ধ', ইংরেজকে ভারত থেকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করাই ছিল এই বিদ্রোহের উদ্দেশ্য। ভারতের সিপাহীরা হাড়ে হাড়ে বুঝেছিল, ইংরেজ-শাসনে কল্যাণ নেই। তাই মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে তারা সশস্ত্র বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু একদিকে যোগ্য নেতার অভাবে আর একদিকে ভারতের অভিজাত শ্রেণির অদম্য ইংরেজভক্তির ফলে সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থতার পর্যবসিত হোল। প্রতিহিংসায় উন্মত্ত ইংরেজ কত গ্রামে লাগালো আগুন, কত নিরীহ নরনারীকে করলে গুলি, অগণিত মানুষকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিলে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের দুই পাশের গাছে গাছে। এই বীভৎসতায় দেশ আবার জড়সড় হয়ে পড়ল।

ভারতের মুক্তি সংগ্রাম—দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়

■ **প্রশ্ন ঃ** ক) পলাশীর যুদ্ধ কবে হয়েছিল? খ) কত সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়েছিল?
গ) সিপাহী বিদ্রোহ কেন ব্যর্থ হয়েছিল? ঘ) ইংরেজরা কীভাবে অত্যাচার করেছিল?
ঙ) 'ভারতের প্রথম মুক্তি যুদ্ধ' কোন্‌টি?

২। মহৎ যে হয় তার সাধু ব্যবহার,
উপকার বিনা নাহি জানে অপকার।
দেখহ কুঠার করে চন্দন ছেদন,
চন্দন সুবাস তারে করে বিতরণ।
কোকিল করেনি কভু ধন বিতরণ।
কাকের কঠোর রব বিষ লাগে কানে;

কোকিল অখিল প্রিয় সমধুর গানে।
গুণহীনে সমাদর কোনখানে নাই
সারী আর শুকপাখি অনেকেই রাখে,
যত্ন করি কে কোথায় কাক পুষে থাকে?

—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত

■ **প্রশ্ন ঃ** ক) মহৎ জীবনের বৈশিষ্ট্য কী?
খ) কাক ও কোকিলের মধ্যে পার্থক্য কী?
গ) মানুষের চরিত্র কেমন হওয়া উচিত বলে তুমি মনে করো?

৩। ঠিক কত বয়েস তা মনে নেই কিন্তু এবারে একটা চাকর পেলেম আমি! চাকরের আসল নামটা শ্রীরামলাল কুণ্ডু, নিবাস বর্ধমান বীরভুঁই। সে কিন্তু বলত তার নাম—ছি আম্‌নাল কুণ্ডু। ছেলেবেলা থেকে রামলাল ছিল আমাদের ছোটোকর্তার কাছে। ঘুমের আগে খানিক পায়ে শুড়শুড়ি না দিলে ছোটোকর্তার ঘুমই আসত না, সেই সমস্ত ভার পেয়েছিল রামলাল। কিন্তু কাজে টিকতে পারলে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা একেবারে সুনিয়মে বাঁধাচালে চলত ছোটোকর্তার কাজকর্ম সমস্তই। নিয়মের একচুল এদিক ওদিক হলে ছোটোকর্তার মেজাজ খারাপ, বুক ধড়ফড়, অনিদ্রা—এমনি নানা উৎপাত আরম্ভ হত। চাকরদের এইসব বুঝে চলতে হত, না হলেই তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত!

আপন কথা— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

■ **প্রশ্ন ঃ** ক) চাকরের আসল নাম কী?
খ) চাকর তার নাম কীভাবে উচ্চারণ করত?
গ) রামলালের নিবাস কোথায়?
ঘ) রামলাল ছোটোকর্তার কী কাজ পেয়েছিল?
ঙ) ছোটোকর্তা কেমন মেজাজের মানুষ ছিলেন?

৪। সেদিনটি আমার খুব মনে পড়ে। সারা দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়াও শেষ হয় নাই। শ্রাবণের সমস্ত আকাশটা ঘন মেঘে সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে এবং সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইতে না হইতেই চারিদিক গাঢ় অন্ধকারে ছাইয়া গিয়াছে। আমরা তিন ভাই নিত্য-প্রথামত বাহিরের বৈঠকখানায় ঢালা বিছানার উপর রেড়ির তেলের সেজ জ্বালাইয়া বই খুলিয়া বসিয়া গিয়াছি। বাহিরের বারান্দায় একদিকে পিসেমশাই ক্যাম্বিসের খাটের উপর শুইয়া সান্ধ্য তন্দ্রাটুকু উপভোগ করিতেছেন এবং অন্যদিকে বসিয়া বৃদ্ধ রামকমল ভট্টাচার্য অন্ধকারে ধূমপান করিতেছেন। দেউড়িতে হিন্দুস্থানী পেয়াদাদের তুলসীদাসী সুর শোনা যাইতেছে এবং ভিতরে আমরা তিন ভাই মেজদার কঠোর তত্ত্বাবধানে নিঃশব্দে বিদ্যাভাস করিতেছি।

বহুরূপী — শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

■ **প্রশ্ন ঃ** ক) দিনটা কেমন ছিল?
খ) লেখকরা তিনভাই সন্ধ্যায় কী করছিলেন?
গ) কীসের প্রদীপ জ্বলছিল?
ঘ) পিসেমশাই সেই সন্ধ্যায় কী করছিলেন?
ঙ) রামকমল ভট্টাচার্য কী করছিলেন?
চ) কার তত্ত্বাবধানে বিদ্যাভ্যাস চলছিল?

অধ্যায় ২০ গল্প-রচনা

গল্প বলা আর শোনা মানুষের চিরদিনের অভ্যাস। মানুষ যে দিন সভ্য হল, উন্নত হল তার বুদ্ধি, সেদিন থেকেই গল্প তৈরির পরিকল্পনা তার মাথায় এল। গল্প বেশ মজার জিনিস বলে যুগে যুগে এর জনপ্রিয়তা বেড়েছে। যখন ছাপাখানার আবিষ্কার হয় নি, তখন মানুষ মুখে মুখে গল্প বানাত। তারপর যেই মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার হল, তখন মানুষ গল্প লিখতে শুরু করল। গল্পকে লিখে রাখার ব্যাপারটি বেশ শক্ত। কারণ সেখানে ভাষার ব্যাকরণ মানতে হয়। সৃষ্টি করতে হয় কৌতূহল। আধুনিক যুগে সাহিত্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা হল গল্প। বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত বহু সাহিত্যিক গল্প রচনা করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। শিশু, কিশোর এবং প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য গল্পের প্রকারভেদও নানারকম। শিশুদের জন্য সাধারণত নীতিমূলক গল্পই বেশি প্রযোজ্য। এতে তাদের নৈতিক চরিত্র সুগঠিত হয়।

➡ গল্প লেখার নিয়মাবলি ঃ

১। বিশেষ একটি বিষয়কে বেছে নিতে হবে। ২। সরল ও সহজ ভাষায় বিষয়টিকে সাজাতে হবে।

৩। ভাষা ও বর্ণনার মধ্যে থাকবে চমক এবং কৌতূহল। ৪। উপসংহারে থাকবে মানসিক প্রশান্তি।

৫। বর্তমান যুগের ব্যাবহারিক ভাষার দিকে লক্ষ রেখে চলিত ভাষাতেই লিখতে হবে।

৬। উক্তি-প্রত্যুক্তি বা সংলাপ সৃষ্টির মাধ্যমে নাটকীয়তা রক্ষা করতে হবে।

তোমাদের সুবিধার জন্য কয়েকটি গল্প লিপিবদ্ধ হল—

১ বুদ্ধি যার, বল তার

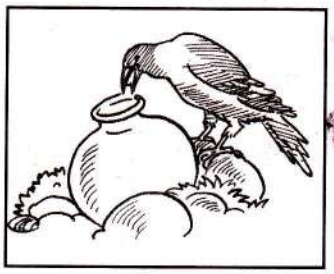

প্রচণ্ড গরমে একটি কাকের ভীষণ তেষ্টা পেল। পুকুর, খাল, বিল সব শুকনো। বেচারা কাক একটু জলের সন্ধানে এখানে ওখানে উড়ে বেড়াতে লাগল। অবশেষে মাঠের মাঝে একটি কলসি দেখতে পেল। কলসিতে সামান্যই জল ছিল। কাক বেচারা বহু চেষ্টা করেও সেই জলের নাগাল পেল না। কলসির কাছেই কিছু টুকরো টুকরো পাথর পড়েছিল। হঠাৎ কাকের মাথায় এক বুদ্ধি এল। সে তখনই উড়ে গেল পাথরের কাছে । একটি করে পাথর মুখে নিয়ে সে কলসির ভেতর ফেলতে লাগল। এইভাবে কিছুক্ষণ ফেলার পর কলসির জল উপরে উঠে এল। কাক তখন জল পান করে তেষ্টা মেটাল।

নীতি কথা ঃ বুদ্ধি যার, বল তার।

২ সিংহ ও ইঁদুর

এক বনে এক সিংহ বাস করত। একদিন সে গুহায় ঘুমিয়ে ছিল। এমন সময় একটি নেংটি ইঁদুর গুহার ভিতর ঢুকে গর্ত ভেবে সিংহের নাকের মধ্যে ঢুকে পড়ল। সিংহ তো ভীষণ গর্জন করে জেগে উঠল। ইঁদুরটিকে থাবার মধ্যে ধরে মেরে ফেলতে উদ্যত হল। বেচারা ইঁদুর আর করে কী! সে কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'প্রভু, আমাকে মারবেন না। একদিন না একদিন এই ক্ষুদ্র প্রাণীটি আপনার উপকারে লাগবে।' ইঁদুরের কাতর প্রার্থনা শুনে সিংহের মনে দয়া হল। সে তখন ইঁদুরকে ছেড়ে দিল। এই ঘটনার কিছুদিন পর সিংহ এক শিকারির পাতা ফাঁদে আটকে পড়ল। বাঁচার জন্য সে তখন চিৎকার করতে লাগল। চিৎকার শুনে সেই ইঁদুরটি ছুটে এল। দেখল সিংহ শিকারির পাতা শক্ত দড়ির জালে আটকে পড়েছে। ইঁদুর তখন সিংহের উপকারের কথা ভেবে তার ধারালো দাঁত দিয়ে জালের দড়ি কাটতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র প্রাণীটির জন্য সিংহ জালের ফাঁদ থেকে মুক্ত হয়ে প্রাণে বাঁচল।

নীতি কথা ঃ বিপদে ছোটোর উপকারও কাজে লাগে।

৩ বাঘ ও রাখাল

বনের ধারে এক রাখাল রোজ গোরু চড়াত। একদিন তার মনে উদয় হল মজা করবে। অমনি সে 'বাঘ, বাঘ' বলে চেঁচাতে লাগল। তার চিৎকার শুনে গ্রামের লোকেরা লাঠি-সোঁটা নিয়ে ছুটে এল। দেখল কোথাও বাঘ নেই। রাখাল গাছের নীচে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসছে। কয়েকদিন পর রাখাল আবার একই ভাবে 'বাঘ বাঘ' বলে চিৎকার করতে লাগল। আবার গ্রামের লোকেরা ছুটে এল। এবারও তারা বাঘ দেখতে না পেয়ে রাখালকে তিরস্কার করে ফিরে গেল। একদিন সত্যি সত্যিই গোরুর পালে বাঘ পড়ল। রাখাল 'বাঘ বাঘ' বলে চেঁচাতে লাগল। এদিন গ্রামবাসীরা আর কেউ এল না। বাঘ গোরু মারল তারপর রাখালকে মেরে জঙ্গলে ফিরে গেল।

নীতি কথা ঃ মিথ্যাবাদীর কথা কেউ বিশ্বাস করে না।

৪ খরগোশ ও কচ্ছপ

খরগোশ কচ্ছপকে তার ধীর গতির জন্য প্রতিদিনই ঠাট্টা-তামাশা করত। কচ্ছপ তা সহ্য করতে না পেরে দৌড় প্রতিযোগিতার প্রস্তাব দিল। খরগোশ তো সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল। তারপর শুরু হল দৌড় প্রতিযোগিতা। কচ্ছপ ধীর গতিতে চলতে শুরু করল। খরগোশ তো তাকে অনেকটাই পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেল।

ফাঁদে আটকে পড়ল।
সিংহ শিকারির পাতা
লো দাঁত দিয়ে জালের
ণে বাঁচল।

র মনে উদয় হল মজা
চিৎকার শুনে গ্রামের
ঘ নেই। রাখাল গাছের
ল আবার একই ভাবে
লোকেরা ছুটে এল।
র করে ফিরে গেল।
এদিন গ্রামবাসীরা আর

করতে না পেরে দৌড়
দৌড় প্রতিযোগিতা।
নক দূর এগিয়ে গেল।

কচ্ছপ ধীর গতিতে চলতে শুরু করল। খরগোশ তো তাকে অনেকটাই পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়ে গেল। তারপর একটি গাছের নীচে এসে বিশ্রাম নিতে লাগল। বিশ্রাম নিতে গিয়ে সে ঘুমিয়ে পড়ল। কচ্ছপ কোনো জায়গায় না থেমে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে যেতে লাগল। তারপর গাছতলায় এসে দেখল খরগোশ আঘোরে ঘুমোচ্ছে। সে কিছু না বলে নিঃশব্দে এগিয়ে গেল। অনেকক্ষণ পরে খরগোশের ঘুম ভাঙল। জেগে উঠে সে কচ্ছপকে দেখতে পেল না। তারপর দৌড় শুরু করল। গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেখল কচ্ছপ অনেক আগেই সেখানে পৌঁছে গেছে।

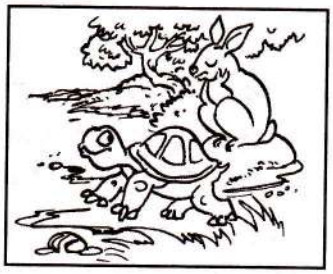

নীতি কথা ঃ ক্ষুদ্র বলে কাউকে অবহেলা করতে নেই।

৫ বোকা কাক ও ধূর্ত শিয়াল

এক টুকরো মাংস চুরি করে একটি কাক গিয়ে বসল গাছের ডালে। সেই সময় গাছের তলা দিয়ে এক শিয়াল যাচ্ছিল। কাকের মুখে মাংসের টুকরো দেখে শিয়ালের বড্ড লোভ হল। ভাবতে লাগল কী করে মাংসের টুকরোটি পাওয়া যায়। হঠাৎ সে মনে মনে একটা ফন্দি আঁটল।

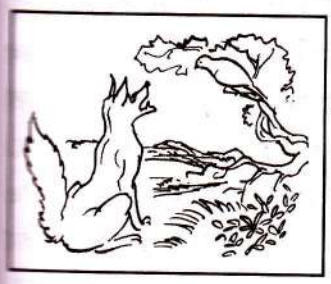

তখন মিষ্টি গলায় কাককে বলল—'ভাই কাক, তুমি তো বেশ সুন্দর দেখতে! নিশ্চয় তোমার গলার সুরও খুব মিষ্টি। তা একটা গান শোনাও তো দেখি।'

কাক কোনো উত্তর দিল না।

তখন শিয়াল বলল— 'ও বুঝেছি, তুমি বোবা।'

এতে কাক বেজায় চটে গেল। সে অমনি 'কা কা' করে ডেকে উঠল। আর যাবে কোথায়? কাকের ঠোঁট থেকে মাংসের টুকরো খসে পড়ল মাটিতে। শিয়াল মনের আনন্দে সেই মাংসখণ্ড নিয়ে ছুটে পালাল।

নীতি কথা ঃ হঠাৎ রাগের বশে কোনো কাজ করা উচিত নয়।

৬ অতি লোভে, তাঁতি নষ্ট

এক দরিদ্র কৃষকের একটি হাঁস ছিল। হাঁসটি প্রতিদিন একটি করে সোনার ডিম দিত। কৃষক সেই ডিম বিক্রি করে দিনে দিনে ধনী হয়ে উঠল। সংসারে তার আর কোনো অভাব রইল না। হঠাৎ একদিন কৃষকের মনে প্রশ্ন জাগল। সে ভাবল, হাঁসের পেটে নিশ্চয় অনেক ডিম আছে। তা না হলে প্রতিদিন একটি করে ডিম দেবে কেন! তাই সে ঠিক করল হাঁসটির পেট চিরে একদিনেই সব ডিম বের করে নেবে। যেমনি ভাবা অমনি কাজ। কৃষক ছুরি দিয়ে হাঁসের পেট চিরে ফেলল। কিন্তু কোনো ডিম দেখতে পেল না। তখন সে 'হায় হায়' করতে লাগল।

নীতি কথা ঃ অতি লোভের পরিণাম দুঃখেরই হয়।

৭ পিঁপড়ে ও ঘুঘু

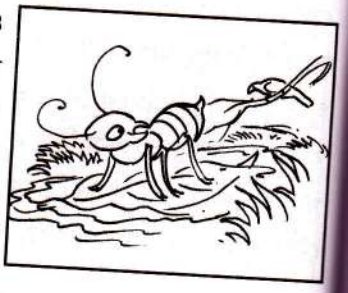

একবার এক পিঁপড়ে পুকুরের জলে পড়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টা করেও সে ডাঙায় উঠতে পারছিল না। পুকুরের পাড়ে ছিল একটি গাছ। সেই গাছের ডালে বসেছিল এক ঘুঘু। পিঁপড়ের দুরবস্থা দেখে তার দয়া হল। সে তখনি গাছের একটি পাতা জলে ফেলে দিল। পিঁপড়ে সেই পাতায় উঠে ভাসতে ভাসতে ডাঙায় উঠে এল। কিছু দিন পর এক শিকারি বন্দুক দিয়ে ঘুঘুটিকে তাক করল। পিঁপড়ে তখন শিকারির পায়ে কামড় দিল। অমনি শিকারির হাত কেঁপে উঠল। বন্দুকের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। ঘুঘুটি উড়ে গিয়ে প্রাণে বাঁচল।

নীতি কথা ঃ **উপকারীকে কখনও ভুলতে নেই।**

৮ কাঠুরিয়া ও জলদেবতা

জঙ্গালের ভেতর দিয়ে বয়ে চলেছে নদী। এক কাঠুরিয়া সেই নদীর তীরে একটি গাছ কাটতে লাগল। হঠাৎ তার হাত ফস্‌কে তার কুঠারখানি ছিটকে গিয়ে পড়ল নদীর জলে। কুঠার হারিয়ে কাঠুরিয়া কাঁদতে লাগল। তার কান্না শুনে জলদেবতা উঠে এলেন। কাঠুরিয়ার মুখে বিবরণ শুনে জলদেবতা আবার নেমে গেলেন জলে। তারপর একটি রুপোর কুঠার এনে কাঠুরিয়াকে দেখালেন। কাঠুরিয়া বলল— 'এ কুঠার আমার নয়।' জলদেবতা এবার একটি সোনার কুঠার নিয়ে এলেন। কাঠুরিয়া সেটা দেখে বলল— 'এ কুঠার আমার নয়।' তখন জলদেবতা তার লোহার কুঠারটি আনলেন। কাঠুরিয়া বলল—'এটাই আমার কুঠার।' কাঠুরিয়ার সততায় সন্তুষ্ট হয়ে জলদেবতা তাকে তিনটি কুঠারই দিয়ে দিলেন।

নীতি কথা ঃ **সততাই জীবনে একমাত্র পথ।**

৯ প্রকৃত বন্ধু

দু'জন বন্ধু। বিমল আর অমল। একই সঙ্গে ওঠা বসা, একই ক্লাসে পড়া। বিমলরা খুব গরিব। অমলরা ধনী। তথাপি অমলের কোনো সংকোচ নেই। একদিন অমল দেখল বিমল স্কুলে আসছে না। কারণ জানতে সে গেল বিমলের বাড়ি। বিমল জানাল সে পরীক্ষার টাকা জোগাড় করতে পারে নি। তাই আর স্কুলে যাবে না। অমলের মন খারাপ হয়ে গেল। সে তৎক্ষণাৎ বাড়ি গিয়ে তার বাবাকে সব জানাল। অমলের বাবা সব শুনে দুঃখ পেলেন। তারপর তিনি বিমলের পড়াশুনার সব খরচ দিতে রাজি হলেন। শুনে অমলের মন খুশিতে ভরে গেল। সে ছুটে গেল বিমলের বাড়ি। সব কথা বন্ধুকে জানাল। বিমলও আনন্দে অমলকে বুকে জড়িয়ে ধরল। তারপর দিন থেকে আবার বিমলকে স্কুলে যেতে দেখা গেল।

নীতি কথা ঃ **প্রকৃত বন্ধু সে, যে বিপদে পাশে দাঁড়ায়।**

১০ সাহসী বালক

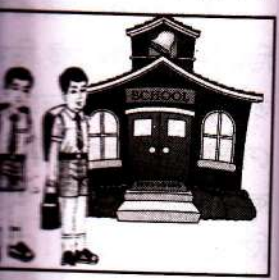

ঝড় উঠেছে প্রচণ্ড বেগে। চারিদিক অন্ধকার। একটি দশ বছরের বালক গাছের মগডালে উঠে বসে আছে। পাড়ার লোকেরা তো ভয়ে কাঁপছে। এখনি হতভাগা ডাল ভেঙে পড়বে মাটিতে। তারা ছুটে গেল ছেলেটির মায়ের কাছে। বলল—'তোমার ছেলে গাছের মগডালে উঠে বসে আছে।' মা শুনে বলল— 'থাকুক। ওকে ভয় দেখালে বড়ো হলে ভীতু হবে। ভীতু লোকেরা জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে না।' মায়ের কথা শুনে তো পাড়ার লোক হাঁ হয়ে গেল। বলে কী! যেমন মা, তেমনি তার ছেলে। সেদিনের ঝড়ে অনেক গাছপালা ভেঙে গেল। ঘরবাড়ি উড়ে গেল।

কিন্তু ছেলেটির কিছু হল না। ঝড় থেমে গেলে সে হাসতে হাসতে বাড়ি ফিরে এল। মা তাকে আদর করে কোলে তুলে নিল। এই ছেলেটিই বড়ো হয়ে নিজের হাতে একটি বাঘ মেরে 'বাঘা যতীন' নামে পরিচিত হয়েছিল।

নীতি কথা ঃ **সাহসী লোকেরাই জীবনযুদ্ধে জয়ী হয়।**

অনুশীলনী

নীচের সূত্রগুলি অবলম্বনে গল্প-রচনা করো ঃ

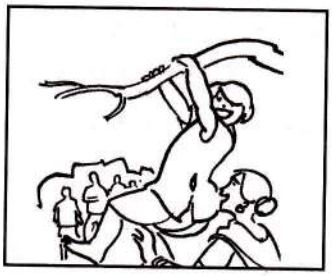

১। 'একতাই বল' — এই প্রবাদ অবলম্বনে একটি গল্প-রচনা করো।

২। 'চালাকির দ্বারা কোনো মহৎ কাজ হয় না' — এই বিষয়ে অবলম্বন করে একটি গল্প-রচনা করো।

৩। 'বিপদের সময় প্রকৃত বন্ধু চেনা যায়' — এই নীতিকথাকে অবলম্বন করে একটি গল্প-রচনা করো।

৪। 'লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু'— এই বিষয় অবলম্বন করে একটি গল্প রচনা করো।

৫। 'কষ্ট করলে কেষ্ট মেলে'— এই বিষয় অবলম্বন করে একটি গল্প রচনা করো।

৬। দক্ষিণা হিসাবে একটি ছাগল পেয়ে ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরছিল — তিনজন ধূর্ত ছাগলটি পাবার জন্য পথের তিন জায়গায় দাঁড়াল — প্রথম জন বলল, ব্রাহ্মণ কেন কুকুর কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছে — দ্বিতীয় ও তৃতীয় জন একই কথা বলল — ব্রাহ্মণ কুকুর ভেবে ছাগলটি ত্যাগ করল — তিন ধূর্ত ছাগলটি নিয়ে বাড়ি গেল — নীতিকথা।

৭। এক বাঘের গলায় হাড় বিঁধে গেল — বাঘ সেটি বের করে দেওয়ার জন্য বনের পশুদের অনুরোধ করল — কেউ সাহস করে এগিয়ে এল না — অবশেষে বাঘ পুরস্কার ঘোষণা করল — তাতেও কেউ এল না — পুরস্কারের লোভে এক সারস তার লম্বা ঠোঁট দিয়ে হাড় বের করে দিল — পুরস্কার দাবি করলে বাঘ বলল— সে যে গলার ভেতর থেকে মাথাটা বাইরে আনতে পেরেছে এটাই তার পুরস্কার।

অধ্যায় ২১

পত্র-রচনা

পৃথিবীতে মানুষ যেদিন সভ্য হল, সেদিন থেকেই সে তার মনের ভাব অন্যকে জানাবার তাগিদ অনুভব করল। এর ফলে সৃষ্টি হল ভাষা। ভাষা সৃষ্টির পরও মানুষ থেমে থাকল না। কারণ ভাষার মাধ্যমে কাছের মানুষের সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান করা যায়। কিন্তু দূরের মানুষের সঙ্গে সে কথা বলবে কী করে? তখন তো আর টেলিফোন বা মোবাইল ফোন আবিষ্কার হয়নি। তাই মানুষ নিজের ভাবনা বা বক্তব্যকে কাগজে লিখে অন্যের কাছে পাঠানোর পরিকল্পনা করল। এই পথ ধরেই পৃথিবীতে চিঠি আবিষ্কৃত হল। চিঠির মাধ্যমে মানুষ যেমন নিজের খবর অন্যকে দিতে পারল, তেমনি অন্যের খবরও জানতে সক্ষম হল। তখনকার দিনে তো আর আজকের মতো ডাকঘর ছিল না। মানুষের হাতে হাতে চিঠি পাঠাত আর রাজা-বাদশারা পাঠাতেন দূত মাধ্যমে। তারপর সভ্যতা যত উন্নত হল, মানুষ চিঠি পাঠানোর আরও নতুন কৌশল আবিষ্কার করল। চারিদিকে স্থাপিত হল ডাকঘর। সেখানে কর্মচারী নিযুক্ত করা হল। এই ডাক-কর্মীরাই বাড়ি বাড়ি চিঠি পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিল।

উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার করে চিঠি বা পত্রকে মোটামুটি **চারটি** ভাগে ভাগ করা যায়—

(ক) ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পত্র।
(খ) সামাজিক পত্র।
(গ) বাণিজ্যিক বা বৈষয়িক পত্র।
(ঘ) আবেদনমূলক পত্র।

ক. ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পত্র ঃ মা, বাবা, ভাই, বোন, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনদের উদ্দেশ্যে যে পত্র লেখা হয়, তাকে **ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পত্র** বলে।

খ. সামাজিক পত্র ঃ বিবাহ, উৎসব-অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বন ইত্যাদিতে যে পত্র লেখা হয় তাকে **সামাজিক পত্র** বলে।

গ. বাণিজ্যিক বা বৈষয়িক পত্র ঃ সরকারি অফিস, আদালত, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানকে উদ্দেশ্য করে অথবা এই সব প্রতিষ্ঠান থেকে অন্যের উদ্দেশ্যে যে পত্র লেখা হয়, তাকে **বাণিজ্যিক বা বৈষয়িক পত্র** বলে।

ঘ. আবেদন মূলক পত্র ঃ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, সংস্থা, স্কুল-কলেজের প্রধান, চাকরির নিয়োগকর্তা ইত্যাদিকে উদ্দেশ্য করে যে পত্র লেখা হয়, তাকে **আবেদনমূলক পত্র** বলে।

পত্ররচনার নিয়মাবলি

পত্র-রচনার ক্ষেত্রে নীচের বিষয়গুলি বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে—

❐ **ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পত্রের ক্ষেত্রে ঃ**

১। ডান দিকে পত্র লেখকের ঠিকানা ও তারিখ।
২। বাঁ দিকে সম্ভাষণ।
৩। সম্ভাষণের নীচে মূল বক্তব্য বিষয়।
৪। নীচে ডান দিকে বিশেষণসহ পত্র লেখকের নাম।
৫। পত্রলেখকের নামের সোজাসুজি বাঁ দিকে পত্রপ্রাপকের ঠিকানা।

❐ **অন্যান্য পত্রের ক্ষেত্রে ঃ**

১। সম্মানজ্ঞাপক সম্ভাষণ।
২। মূল বক্তব্য।
৩। নীচে ডান দিকে পত্রলেখকের নাম।
৪। নীচে বাঁ দিকে স্থান ও তারিখ।

সম্ভাষণের রীতি

হিন্দুদের ক্ষেত্রে ঃ

(ক) গুরুজন হলে — শ্রীচরণেষু, শ্রীচরণকমলেষু, শ্রদ্ধাস্পদেষু, পূজনীয়েষু ইত্যাদি।
(খ) বন্ধুবান্ধব হলে— প্রিয়, প্রীতিভাজনেষু, বন্ধুবরেষু, অভিন্নহৃদয়েষু, প্রিয়বরেষু ইত্যাদি।
(গ) বয়সে ছোটো হলে— প্রিয়, কল্যানীয়াসু, কল্যানীয়েষু, স্নেহভাজনেষু ইত্যাদি।

মুসলমানদের ক্ষেত্রে ঃ

(ক) গুরুজন হলে —পাকজনাবেষু, মোবারকজনাবেষু ইত্যাদি।
(খ) বন্ধুবান্ধব হলে — মেহেরবানেষু, প্রীতিনিলয়েষু ইত্যাদি।
(গ) বয়সে ছোটো হলে — দোয়াবরেষু, কদরেষু ইত্যাদি।

বর্তমানে শিক্ষিত জনসমাজে ধর্মীয় সম্ভাষণ রীতি প্রায়ই বর্জিত হয়েছে। সর্বজনীন জাতীয় শব্দ বা মাতৃভাষা বাংলা শব্দের চিরাচরিত সম্ভাষণ রীতি প্রচলিত।

তোমাদের সুবিধার জন্য বিভিন্ন প্রকার পত্রের কয়েকটি নমুনা দেওয়া হল —

১. জন্মদিনে আমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে পত্র ঃ

বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
৩১.০৭.১২

প্রিয় শ্রেষ্ঠা,

আজ দুপুরে আকাশে যখন মেঘ-রৌদ্রের লুকোচুরি খেলা চলছে, ঠিক তখন ভিজে কদমফুলের গন্ধের মতো তোর চিঠিখানা পেলাম। খাম খুলতেই মিস্টি গন্ধে আমার মনটা ভরে গেল। সেই কারণে তোকে লিখতে বসে গেলাম জুঁই ফুলের গন্ধ দেব বলে। হয়তো ব্যাপারটা একটু হেঁয়ালির মতো লাগছে। আসলে আগামী ১৬ আগস্ট আমার জন্মদিন। এবার খুব ধুমধাম করেই হবে। বাবা বলেছেন, ছাদে প্যান্ডেল হবে। ফুলপাতা দিয়ে সাজানো হবে সারা বাড়ি। থাকবে বিজলি বাতির ঝলক। এমন দিনে তোকে কাছে না পেলে যে আনন্দটাই মাটি হয়ে যাবে। অবশ্যই ওই দিন সকালবেলায় তোর বাবা-মা সহ আমাদের বাড়ি আসবি। এবার আর পরীক্ষার অযুহাত শুনব

না। আমি কিন্তু তোর পথ চেয়ে বসে থাকব।

ঠিকানা
তমান্না নন্দী
চার্চ রোড, ব্যান্ডেল
জেলা-হুগলি

ইতি
তোর অন্তরঙ্গা
তমান্না

২. শিক্ষামূলক ভ্রমণের অনুমতি চেয়ে বাবার কাছে পত্র ঃ

১৮/বি মানিকতলা মেন রোড
কলিকাতা - ৭৬
২০.৯.১২

পাকজনাবেষু,
আব্বাজান,

আশা করি তুমি এবং আম্মা ভালোই আছ। একটা বিশেষ কারণে তোমাকে এই চিঠিখানা লিখছি।

তুমি তো জানো, প্রতি বছর আমাদের স্কুল থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণে যাওয়া হয়। শুধু পুঁথিগত বিদ্যা মানুষকে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী করতে পারে না, ভ্রমণ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের একঘেয়েমি দূর করে এবং মনের প্রসারতা ঘটায়। এবার ঠিক হয়েছে পুজোর ছুটিতে স্কুল থেকে আমাদের উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সে নিয়ে যাওয়া হবে। এই জন্য ইচ্ছুক ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের কাছ থেকে অনুমতি পত্র আহ্বান করা হয়েছে। আশা করি তুমি একটি অনুমতি পত্র লিখে ডাকযোগে আগামী সাত দিনের মধ্যে পাঠিয়ে দেবে। আমি এখানে ভালো আছি। তোমাদের দোয়া প্রার্থনা করি।

ঠিকানা
মহ: নাসিরুদ্দিন
দেওয়ান দিঘি
জেলা-বর্ধমান
পিন - ৭৪২৩০২

ইতি
তোমার আদরের
তসলিমা

৩. একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বন্ধুকে পত্র ঃ

সেন্ট্রাল পার্ক
কল্যাণী, নদিয়া
১৭.১০.১২

প্রিয় সুতীর্থ,

অনেকদিন তোর কোনো চিঠিপত্র পাইনি, তাই নিজেই লিখতে বসে গেলাম একটি স্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে।

গত সপ্তাহে আমরা স্কুল থেকে শিক্ষামূলক ভ্রমণে উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্স গিয়েছিলাম। শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস ধরে আমরা রওনা হয়েছিলাম। সারারাত ধরে গাড়ি চলেছিল। পরদিন সকাল ৮ টায় আমরা নিউ মাল স্টেশনে নেমেছিলাম। সেখান থেকে গাড়ি করে মালবাজার। এখানেই সরকারি গেস্ট হাউস বুক করা ছিল। আমরা স্নান-খাওয়ার পর গোরুমারা অভয়ারণ্য দেখতে গিয়েছিলাম। তোকে বলে বোঝানো যাবে

না কত সুন্দর এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য। চারিদিকে সবুজের সমারোহ। মাইলের পর মাইল চা বাগান। টিকিট কেটে যখন অভয়ারণ্যে ঢুকলাম তখন বেলা ১২টা। কী ঘন জঙ্গল! গাইড আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। তারপর একে একে ওয়াচ টাওয়ারে উঠে জঙ্গলের আসল রূপ দেখলাম। দূরে তৃণক্ষেত্রে বাইসন, হরিণ দেখতে পেলাম। একপাল হাতি জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল। কত নাম না জানা পাখি আর ফুল দেখলাম। তারপর ফিরে এলাম হোটেলে। পরদিন আমরা ঝালং, বিন্দু এবং জলঢাকা বিদ্যুৎ প্রকল্প দেখলাম। পাহাড়ের গা বেয়ে আমাদের গাড়ি পিঁপড়ের মতো এঁকে বেঁকে এগিয়ে যাচ্ছিল। পাহাড়ের মাথায় ধোঁয়ার মতো মেঘের কুন্ডলী। নীচে তীব্র খরস্রোতা জলঢাকা নদী। ছোটো ছোটো পাথর খন্ডের মধ্যে দিয়ে সাপের মতো বয়ে চলেছে। তারপর সন্ধ্যার আগেই আমরা নেমে এলাম মালবাজারে। তারপর দিন সকালে চা-বাগান ও চা-ফ্যাকটরি দেখে বিকেলের ট্রেনে আবার কলকাতা মুখো রওনা হলাম। অভিজ্ঞতা না থাকলে বোঝানো যাবে না ভ্রমণের কী আনন্দ! আমার স্মৃতির মণিকোঠায় ডুয়ার্স ভ্রমণের সেই স্মরণীয় দিনগুলি কোনো দিন ম্লান হবে না।

ঠিকানা
সুতীর্থ দত্ত
C/o সুজয় দত্ত
খেয়াঘাট, নবদ্বীপ, নদিয়া
পিন - ৭৪১৩০২

ইতি
তোর অন্তরঙ্গ
কৌশিক

৪. পরীক্ষায় ভালো ফল করেছে বলে অভিনন্দন জানিয়ে বন্ধুকে পত্র ঃ

হাই স্ট্রিট
কৃষ্ণনগর, নদিয়া
২৫.১২.১২

প্রিয় সত্যব্রত,

গতকালই তোর চিঠি পেয়েছি। এবার বার্ষিক পরীক্ষায় তোর অভাবনীয় সাফল্য আমাদের মুগ্ধ করেছে। বাংলা বাদে প্রতিটি বিষয়ে তোর শতকরা ৯৮ নম্বর বাড়ির সকলকেই বিস্মিত করেছে। মা-বাবা তো তোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। প্রতি মুহূর্তেই আমাকে চাপ দিচ্ছে তোর মতো রেজাল্ট করতে। তোর সাফল্য সত্যিই আমার উৎসাহকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। মনে অনেকটাই জোর পেয়েছি। তবে কষ্ট না করলে তো কেষ্ট মেলে না। তাই এবার আদাজল খেয়ে লেগেছি। নিছক পত্র মারফৎ অভিনন্দন জানিয়ে তোকে ছোটো করতে চাইনে। বাবা-মা তোর জন্য একটা সুন্দর উপহার কিনেছে। আগামী রবিবার তোদের বাড়িতে গিয়ে প্রত্যক্ষ শুভেচ্ছা জানাব। আজ এই পর্যন্তই রইল। সাক্ষাতে সব কথা হবে।

ঠিকানা
অমিতাভ সাহা
C/o অনিল সাহা
রেল কলোনী, কাঁচরা পাড়া
উ: ২৪ পরগনা

ইতি
তোমার অন্তরঙ্গ
অমিতাভ

৫. চিড়িয়াখানা দেখার অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে দিদির কাছে পত্র ঃ

৫১, বৈঠকখানা রোড
কলকাতা - ৯
২৬.১২.১২

প্রিয় দিদি,

আশাকরি তুই ভালো আছিস। তোকে একটা মজার খবর দেব বলে এই চিঠিখানা লিখছি।

গতকাল ২৫শে ডিসেম্বর আমরা হোস্টেল থেকে চিড়িয়াখানায় ঘুরতে গিয়েছিলাম। সঙ্গে ছিলেন আমাদের হোস্টেলের সুপার দীপকবাবু। আগে কখনও চিড়িয়াখানা দেখিনি। তাই মনের মধ্যে একটা চাপা কৌতূহল ছিল। সেই কৌতূহলের ষোলো আনা নিরসন হল। আমরা টিকিট কেটে বেলা ১০টার মধ্যে ভিতরে প্রবেশ করলাম। প্রথমেই পাখিদের মেলা। কত দেশ-বিদেশের পাখি! তারপর একে একে বনমানুষ, হাতি, বাঘ, গন্ডার, হরিণ কুমির দেখার পর আমরা সাপের ঘরে ঢুকলাম। এতদিন এই সাপগুলোর শুধু নাম শুনেছিলাম। এবার খুব কাছ থেকে চোখে দেখলাম। আমার বন্ধুরা অনেকেই ভয় পাচ্ছিল। আমার তেমন একটা ভয় লাগেনি। দুপুরে আমরা একটু টিফিন করে নিলাম। সবুজ ঘাসে একটু দৌড়াদৌড়ি করলাম। কেউ কেউ ব্যাডমিন্টন খেলল। তারপর আবার দেখার পালা। কত রকমের হনুমান! সব মিলিয়ে একটা দারুণ মজার দিন অতিবাহিত করলাম আমরা। বাবা-মাকে আমার প্রণাম জানাস। তুই আমার ভালোবাসা নিস।

ইতি
তোর প্রিয়
সন্তু

ঠিকানা
অদিতি মুখার্জি
C/o অমলেন্দু মুখার্জি
সাহেব পাড়া, সিউড়ি
জেলা-বীরভূম

৬. একটি বনভোজনের বর্ণনা দিয়ে বন্ধুকে পত্র ঃ

রবীন্দ্র সরণি
কাঁথি, পূর্ব মেদিনীপুর
১.০১.১৩

প্রিয় দীপশিখা,

প্রথমেই ইংরেজি নববর্ষের উষ্ণ শুভেচ্ছা জানাই। তারপর জানাই রঙিন প্রজাপতির মতো একটা আনন্দমুখর দিনের কথা।

গত ২৫শে ডিসেম্বর আমরা গিয়ে ছিলাম বনভোজন করতে। আমরা মোট পাঁচটি পরিবার ছিলাম। স্থানটি ছিল কোলাঘাট রূপনারায়ণ নদীর তীর। দুটো টাটা সুমো গাড়ি করে আমরা সকাল সাতটার মধ্যে রওনা দিয়েছিলাম। ঠিক ন'টার সময় আমরা পৌঁছালাম রূপনারায়ণের কূলে। রান্নার সরঞ্জাম আমাদের সঙ্গেই ছিল। কুয়াশার চাদর সরিয়ে সূর্য তখন কাঁচা হলুদের মতো রং ছড়িয়ে দিয়েছে প্রকৃতিতে। আমরা প্রাতঃরাশ সেরে নেমে পড়লাম বনভোজনের কাজে। বড়োরা রান্নার কাজে হাত লাগালেন। আর আমরা ছোটোরা শুধুই হই হই করতে লাগলাম। সবুজ ঘাসের কার্পেট বিছানো মাঠ। একপাশে রেললাইন, অন্য পাশে বোম্বে রোড। আমাদের বনভোজনের জায়গাটা যেন পাহাড়ের উপত্যকা। বড়ো একখানা শতরঞ্চি পেতে আমরা বসে গেলাম। কেউ নাচল, কেউ গান

গাইল, কেউ আবৃত্তি করল। দাদারা ব্যাডমিন্টন খেলল। কখন যে দুপুর গড়িয়ে গেল খেয়াল নেই। আমরা খেতে বসলাম। যেন অমৃত খেলাম। আসলে মুক্ত জীবনের আনন্দই সব খাদ্য সামগ্রীকে আজ সুস্বাদু করে তুলেছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে ফেরার পালা। তখন কুয়াশার চাদরে প্রকৃতি ঘোমটা দিতে শুরু করেছে। গোধূলির শেষ আলোটুকু শুষে নিচ্ছে গাছ-পাতারা। আমরা তখন টাটা সুমো গাড়ি করে বাড়ি মুখো হচ্ছি।

আজ এই পর্যন্তই থাক। উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলাম।

ঠিকানা
দীপশিখা মজুমদার
C/o অমিত মজুমদার
নেতাজি সুভাষ রোড, মল্লিকফটক
হাওড়া—১

ইতি
তোর প্রিয় বান্ধবী
দেবলীনা

৭. ইদ উৎসবে নিমন্ত্রণ জানিয়ে বন্ধুকে পত্র

লালদিঘি
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ
১০.০৮.১২

প্রিয় সন্দীপন,

উৎসব মানেই আনন্দ আর নিয়মছাড়া খাওয়া দাওয়া। আগামী ২০ আগস্ট আমাদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব ইদ। ইদ মানে তো খুশি। খুশির উপভোগ একা একা হয় না। সবাইকে নিয়েই তো উৎসবের সার্থকতা। তোদের পুজো, আমাদের ইদ—কোনো পার্থক্য নেই। আনন্দের আবার রকমফের হয় নাকি! তাই ওই দিন খুব সকাল সকাল চলে আসবি আমাদের বাড়ি। সঙ্গে তোর বাবা মাকে অবশ্যই আনবি! শুধু ভুঁড়ি ভোজ নয়, প্রাণখোলা আনন্দেই ভরে উঠবে আমাদের অন্তর। তোর আগমণের প্রতীক্ষায় বসে থাকব।

ঠিকানা
সন্দীপন রায়
C/o অতুল প্রসাদ রায়
পলাশি সুগার মিল
জেলা- নদিয়া

ইতি
তোর অন্তরঙ্গ
মকবুল

৮. অনুপস্থিতির জন্য ছুটি চেয়ে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছে আবেদন পত্র ঃ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয় সমীপেষু,
সেন্ট জন্ হাইস্কুল
ব্যান্ডেল, হুগলি

মহাশয়,

নিবেদন এই যে, আমি আপনার বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণি 'ক' বিভাগের একজন ছাত্র। গত ২০.৭.১২ থেকে ২৪.৭.১২ পর্যন্ত সর্দিজ্বরে আক্রান্ত হয়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হতে পারিনি।

আশাকরি মাননীয় মহাশয়, উক্ত দিনগুলিতে অনুপস্থিতির জন্য ছুটি মঞ্জুর করে বাধিত করবেন।

বিনীত
আপনার অনুগত ছাত্র
অরিন্দম ভট্টাচার্য
পঞ্চম শ্রেণি
ক-বিভাগ, ক্রমিক নং-৩

ব্যান্ডেল, হুগলি
২৫.৭.১২

৯. বিদ্যালয়ে সরস্বতীপূজার নিমন্ত্রণ পত্র ঃ

তমসো মা জ্যোতির্গময়

সুধী,

পিকরবে মুখরিত বনবীথি। শিয়রে সমাগত শ্রীপঞ্চমী তিথি। আকাশে বাতাসে বাগ্‌দেবীর আগমনী সুর ধ্বনিত হচ্ছে। আগামী ২৫শে জানুয়ারি বিদ্যামঠতলে আমরা হংসবাহিনী বীণাপাণির পূজার আয়োজন করেছি। উক্ত দিবসে আপনার/আপনাদের সানুগ্রহ স্বাগতি আমরা কামনা করি আন্তরিক ভাবে।

বিনীত
ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ
ধুবুলিয়া দেশবন্ধু উচ্চবিদ্যালয়
নদিয়া

ধুবুলিয়া, নদিয়া
৪ঠা জানুয়ারি, ২০১৩

অনুষ্ঠান সূচি ঃ

২৪।১।১২ ঃ সন্ধ্যায় প্রতিমা আনয়ন।
২৫।১।১২ ঃ প্রভাতে পূজার্চনা ও অঞ্জলি প্রদান ও প্রসাদ বিতরণ।
সন্ধ্যায় বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
২৬।১।১২ ঃ মধ্যাহ্নে প্রতিমা নিরঞ্জন।

১০. বিবেকানন্দের জন্মদিন উপলক্ষে আমন্ত্রণ পত্র ঃ

সুধী,

বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ বিদ্যালয়ের সেমিনার কক্ষে আগামী ১২ জানুয়ারি ২০১৩, এক মহতী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন বিশিষ্ট সন্ন্যাসী স্বামী দিব্যানন্দ মহারাজ।

আপনার সানুগ্রহ উপস্থিতিতে সাফল্যমন্ডিত হোক আমাদের প্রয়াস।

বিনীত
ছাত্রবৃন্দ
নবদ্বীপ বকুলতলা উচ্চ বিদ্যলয়
নবদ্বীপ

নবদ্বীপ
১ জানুয়ারি, ২০১৩

১১. প্রকাশকের কাছে বইয়ের অর্ডার দিয়ে পত্র ঃ

মাননীয় কর্মাধ্যক্ষ
আশা বুক এজেন্সি
৮এ, কলেজ রো
কলকাতা-৯
মহাশয়,

আপনার প্রকাশনীর নিম্নলিখিত বইগুলি আমরা বিদ্যালয়ের লাইব্রেরির জন্য কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আবিলম্বে ভি.পি যোগে পাঠিয়ে বাধিত করবেন। অগ্রিম মূল্য বাবদ ২০০০ (দুই হাজার) টাকা M.O যোগে পাঠালাম। সমস্ত বই হাতে এলে চেকের মাধ্যমে বাকি টাকা প্রদান করা হবে।

বিনীত
শ্রীবিমল কুমার সিংহ
প্রধান শিক্ষক
বোলপুর উচ্চবিদ্যালয়
বীরভূম

পুস্তক তালিকা ঃ

১। ভাষা প্রসঙ্গ-**ix-x** সিরাজুল ইসলাম— ৫ কপি
২। রূপা পেন্সিল ড্রয়িং — পার্থপ্রতিম বিশ্বাস পার্ট ৬, ৭, ৮/৫ কপি
৩। ভাষারীতি — (সপ্তম ও অষ্টম) — রণেন গুপ্ত — ৫ কপি

অনুশীলনী

১। বিদ্যালয়ের জন্য বিদ্যালয়ের জন্য টাকা চেয়ে তোমার বাবার কাছে একটি চিঠি লেখো।
২। বইমেলায় কেমন অভিজ্ঞতা হয়েছিল তা জানিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।
৩। তোমার দেখা একটা মেলার কথা জানিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।
৪। পরীক্ষার প্রস্তুতির কথা জানিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লেখো।
৫। বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রজয়ন্তী পালন করা হবে। এই উপলক্ষে একটি আমন্ত্রণ পত্র তৈরি করো।
৬। শরীর খারাপের জন্য কয়েকটাদিন স্কুলে উপস্থিত হতে পা রিনি। প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছে ওই দিনগুলির জন্য ছুটির আবেদনপত্র লেখো।
৭। দিদির বিয়ে উপলক্ষে বন্ধুকে আমন্ত্রণ জানিয়ে একটি পত্র রচনা করো।
৮। নির্দিষ্ট কিছু বইয়ের অর্ডার দিয়ে প্রকাশকের কাছে একটি চিঠি লেখো।
৯। সমুদ্র দেখার প্রথম অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে বন্ধুকে একটি পত্র লেখো।
১০। বিদ্যালয়ে ক্যুইজ প্রতিযোগিতার অনুমতি চেয়ে প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখো।

অধ্যায় ২২ অনুচ্ছেদ ও প্রবন্ধ রচনা

পূর্বের শ্রেণিতে তোমরা অনুচ্ছেদ রচনা শিখেছ। পঞ্চম শ্রেণিতে সেই অনুচ্ছেদ রচনার পাশাপাশি প্রবন্ধ রচনাও শিখবে। অনুচ্ছেদ রচনায় একটি Paragraph-এর মধ্যেই বিষয়ের সামগ্রিক অথচ সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থাকে। কিন্তু প্রবন্ধ হল বিষয়ের ক্রম অনুযায়ী বিস্তারিত ব্যাখ্যা। এখানে অনেকগুলি অনুচ্ছেদ থাকে। অর্থাৎ কয়েকটি অনুচ্ছেদ মিলেই একটি প্রবন্ধ তৈরি হয়।

প্রবন্ধ বা অনুচ্ছেদ রচনা লেখার নিয়মাবলি ঃ

১। সহজ, সরল ও সাবলীল ভাষায় লিখতে হবে।

২। বিষয়ের ক্রম রক্ষা করতে হবে। ব্যক্তি হলে আগে জন্ম, পরে মৃত্যুর তারিখ লিখতে হবে।

৩। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে সংকেত (point) অনুযায়ী ভাগ করে লেখাই ভালো। তবে শব্দ সংখ্যা যেন ২৫০ এর বেশি না হয়।

৪। অনুচ্ছেদ হলে ১৫-১৬ টি বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই ভালো।

৫। কোনো ভাবেই ভুল তথ্য দেওয়া যাবে না।

৬। চলিত ভাষাতেই লিখতে হবে। তবে কোনো লেখক বা কবির একই লেখা দ্বিতীয়বার লেখা যাবে না। উদ্ধৃতি দিতে গেলে হুবুহু রচনাটাই উল্লেখ করতে হবে।

৭। বানান ভুল এবং বাক্যগঠনের ত্রুটি অবশ্যই দূর করতে হবে।

অনুচ্ছেদ রচনা

গোরুর উপকারিতা

গৃহপালিত পশু-পাখিদের মধ্যে গোরু হল সবচেয়ে উপকারী প্রাণী। মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই গোরু বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো আমাদের সেবা করে চলেছে। আমাদের দেশে গোরুর এই সেবাপরায়ণতা দেখে মানুষ তাকে দেবতা রূপে পুজো করে থাকে। ভারতবর্ষ কৃষিভিত্তিক দেশ। কৃষিকাজে গোরুর ভূমিকা অপরিসীম। জমি-চাষ করা, চাষের খেতে গোরুকে দিয়ে লাঙল টানানো এবং গোরুর গাড়ি করে ফসল ঘরে আনা ইত্যাদি কাজে গোরুর খুব প্রয়োজন। গাই গোরু আমাদের দুধ দেয়। দুধ সকল বয়সী মানুষের কাছে পুষ্টিকর খাদ্য। তাছাড়া দুধ থেকে তৈরি দই, ছানা, মাখন, ঘি এবং নানা রকমের মিষ্টান্ন প্রস্তুত হয়। মৃত গোরুর চামড়া দিয়ে ব্যাগ, জুতো, কোমরের বেল্ট ইত্যাদি তৈরি হয়। গোরুর হাড় সার তৈরির কাজে ব্যবহৃত হয়।

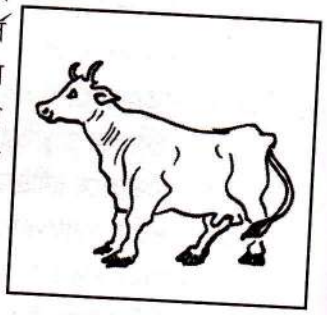

গম, যব, ছোলা, সরষে, মুগ, মুসুর প্রভৃতি রবি শস্যের ঝাড়াই বাছাইয়ে গোরুকে কাজে লাগোনো হয়। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে এখনও গোরু ঘানি টেনে ভোজ্য তেল উৎপাদনে সাহায্য করে। গোরুর গোবর থেকে ঘুঁটে তৈরি হয়। এখন আবার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে গোবর থেকে রান্নার গ্যাস তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে জৈব সার তৈরিতে গোবর খুব প্রয়োজনীয়। মানব সভ্যতার বিকাশে গোরুর অবদান অনস্বীকার্য।

কুকুর

দাঁতযুক্ত হিংস্র প্রাণীদের মধ্যে কুকুর আর বিড়ালই মানুষের কাছে পোষ মেনেছে বেশি। যদিও এদের কামড় খুব ভয়ংকর এবং প্রাণহানিকর, তবুও এই দুটি প্রাণীকেই মানুষ বেশি করে বাড়িতে পোষে। কুকুর খুব প্রভুভক্ত। চেনা মানুষকে দেখলে এরা লেজ নেড়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আর অচেনা মানুষকে দেখলে রাগে ঘেউ ঘেউ করে ওঠে। চতুষ্পদ এই প্রাণীটির সারা গায়ে ছোটো ছেটো লোম থাকে। সাদা, কালো, খয়েরি ইত্যাদি রঙের কুকুর বেশি দেখা যায়। এদের দাঁত খুব ধারালো। তাই এরা কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে পারে। এদের পেছনে একটা নাতিদীর্ঘ লেজ থাকে। লেজটিও লোমে ঢাকা। এদের ঘ্রাণশক্তি খুব প্রবল, তীক্ষ্ণ ঘ্রাণশক্তির জন্য গোয়েন্দা বিভাগে কাজে লাগানো হয়। আজকাল আভিজাত পরিবারে বিদেশি কুকুর পোষার রেওয়াজ লক্ষ করা যায়। কুকুরের ভয়ে চোর-ডাকাত বাড়িতে প্রবেশ করতে পারে না। কুকুরের প্রধান খাদ্য মাংস। তবে বাড়িতে পোষা কুকুর ভাত, দুধ, রুটি ইত্যাদিও খায়। এরা প্রায় ১০-১৫ বছর বাঁচে। কুকুরে কামড়ালে জলাতঙ্ক রোগ হয়। এর জন্য ওষুধও আবিষ্কৃত হয়েছে।

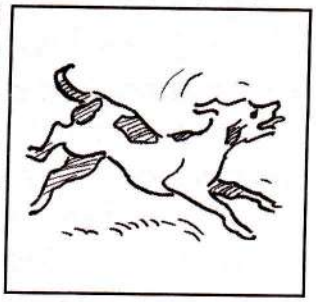

বিড়াল

বিড়াল অতি পরিচিত চতুষ্পদ গৃহপালিত প্রাণী। অনেকটা বাঘের মতো দেখতে বলে বিড়ালকে বলা হয় 'বাঘের মাসি'। তবে বাঘের চেয়ে আকৃতিতে বিড়াল অনেক ছোটো। বিড়ালের সারা শরীরর ছোটো বড়ো লোমে ঢাকা। সাদা, কালো, বাদামি ইত্যাদি নানা রঙের বিড়াল দেখা যায়। বিড়ালের দাঁতও খুব ধারালো। এদের পায়ের নীচে মাংসের প্যাড থাকে বলে হাঁটলে শব্দ হয় না। বিড়ালের পায়ের ধারালো নখগুলো গোটানো থাকে। কুকুরের মতো বিড়াল তেমন উপকারী প্রাণী নয়। খুব সহজে পোষ মানে বলে মানুষ এদের বাড়িতে পোষে। এরা ইঁদুর শিকারে খুব পটু। বনবিড়াল মাংসাশী প্রাণী। পোষা বিড়াল মাছ, মাংস ছাড়াও দুধ, দই ও ভাত খায়। যে বাড়িতে বিড়াল পোষা হয় সে বাড়িতে ইদুঁর থাকে না। রাতে বিড়ালের চোখ বিজলিবাতির মতো জ্বলে। ফলে অন্ধকারেও এরা দেখতে পায়। বিড়ালের প্রধান শত্রু কুকুর। শিকারি বিড়ালের গোঁফ থাকে। কুকুরের মতো বিড়ালে কামড়ালেও জলাতঙ্কের প্রতিষেধক নিতে হয়। বিড়াল ডিপথেরিয়া রোগের বাহক।

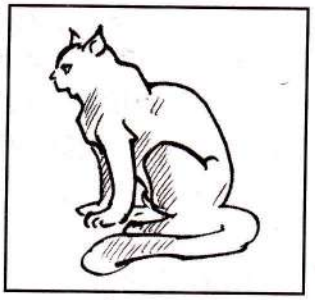

হাতি

চতুষ্পদ স্থলচর স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে হাতি সবচেয়ে বড়ো এবং শক্তিশালী। বন্যপ্রাণীদের মধ্যে একমাত্র হাতিই অল্পবিস্তর মানুষের পোষ মনে। আগেকার দিনে যুদ্ধ করার জন্য রাজারা হাতি পুষতেন। যে স্থানে হাতি থাকত তার নাম হাতিশালা। হাতির চারটি থামের মতো পা এবং এদের পায়ের তলায় মাংসের প্যাড থাকে। হাতির শরীর অত্যন্ত ভারী বলে বাঘ, সিংহ বা ঘোড়ার মতো দ্রুত ছুটতে পারে না। এরা খুব শান্ত প্রকৃতির। তবে ক্ষেপে গেলে হাতি বেশ ভয়ংকর হয়ে ওঠে। এদের সারা শরীর শক্ত পুরু চামড়া দ্বারা আবৃত। গায়ের রং ধূসর ছাই বর্ণের।

সামনের দিকে যে বড়ো শুঁড় থাকে তার সাহায্যেই হাতি সব কিছু কাজ করে। শুঁড়ের গোড়ার দিকে দু'পাশ থেকে দুটো মুলোর মতো সাদা দাঁত থাকে। সব হাতির অবশ্য দাঁত থাকে না। যাদের দাঁত থাকে তাদের দাঁতাল হাতি বলে। একটা লম্বা লেজও থাকে। তবে হাতির কানদুটো ঠিক কুলোর মতো। তবে দেহের তুলানায় এদের চোখ খুব ছোটো। বন্যপ্রাণী হলেও হাতি কিন্তু তৃণভোজী। জঙ্গালের গাছপালার পাতা, কলাগাছ, আঁখ, লম্বা ঘাস প্রভৃতি হাতির প্রধান খাদ্য। এরা সাধারণত দলবেঁধে বাস করে। এদের খাদ্যের পরিমাণ বিশাল। একটি হাতি দিনে প্রায় এক কুইন্টাল খাদ্য খায়। প্রবাদ আছে 'মরা হাতি লাখ টাকা'। হাতির চামড়া কোনো কাজে লাগে না। তবে এদের দাঁত ও হাড় খুব মূলবান। দাঁত এবং হাড় দিয়ে শৌখিন জিনিস তৈরি হয়। আমাদের দেশের পুরাণ ও মহাকাব্যে হাতির উল্লেখ আছে। হাতির পিঠে চড়ে যুদ্ধ বা রাজার শোভাযাত্রা আমরা গল্পে পড়েছি। এখনও সার্কাসে হাতির খেলা দেখানো হয়। এই বৃহদাশয় প্রাণীটি প্রায় ৭০-৮০ বছর বাঁচে।

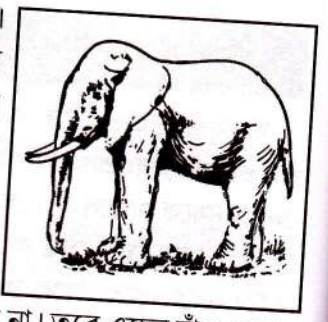

মরুভূমিতে উটের উপকারিতা

মরুভূমি বালির সমুদ্র। বালির ওপর দিয়ে দীর্ঘক্ষণ হাঁটা সম্ভব নয়, কারণ প্রতি মুহূর্তে পা বালির ভেতরে বসে যেতে চায়। দুপুরবেলায় মরুভূমিতে বালুরাশি এত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে যে, বালির উপরে পা রাখাই দায় হয়ে ওঠে। এই পরিস্থিতিতে মরুভূমিতে চলাচলের একমাত্র বাহন হল উট। এশিয়া এবং আফ্রিকা মহাদেশের মরুভূমিতে উট দেখা যায়। উটের পায়ের তলা এবং পাতা এমনভাবে তৈরি যে, সে অনায়াসে উত্তপ্ত বালুরাশির উপর দিয়ে চলাফেরা করতে পারে। মরু অঞ্চলের ব্যবসায়ীরা তাই উটের পিঠে মাল চাপিয়ে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় পণ্যদ্রব্য নিয়ে যায়। উটকে এইজন্য 'মরুভূমির জাহাজ' বলে। পিঠে অনেকটা বোঝা নিয়ে চলতে উট অসুবিধে বোধ করে না। উটের দুধ ও মাংস মরুবাসীর খাদ্য। উটের লোম দিয়ে কাপড় তৈরি হয়। মরুভুমিতে মাঝে মাঝে বালির দুরন্ত ঝড় ওঠে। উট মরুভুমিতে বালুঝড়ের পূর্বাভাস বুঝতে পারে। পথিক মরীচিকাকে জল বলে ভুল করে, কিন্তু সে করে না। তাই পথিক ভুল পথে যেতে চাইলেও সে যায় না। এভাবে সে মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত পথিকের জীবন বাঁচায়। ভারতের রাজস্থানে উঠ দেখা যায়।

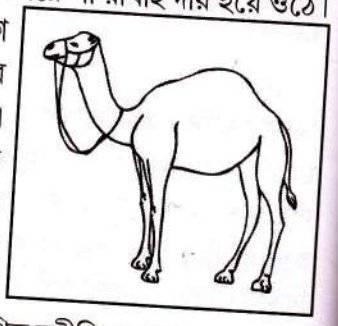

ধান

ভারত কৃষিপ্রধান দেশ। কৃষিজ ফসলের মধ্যে ভারতে ধানই প্রধান। আমাদের প্রধান খাদ্য ভাত। ধান থেকে চাল হয় এবং চাল থেকেই আমরা ভাত পাই। আমাদের প্রাণ ধারণের প্রধান উপাদান হল ভাত। তাই ধানকে বলা হয় লক্ষ্মী। বিভিন্ন পুজো পার্বণেও ধান লাগে। ধানগাছ তৃণজাতীয় উদ্ভিদ। বিজ্ঞানের ভাষায় একে বলে ওষধি। কারণ ধান পাকলে ধানগাছ মরে যায়। লম্বা ঘাসের মতো ধানগাছ কোনো কিছুকে অবলম্বন না করেই দাঁড়িয়ে থাকে। এদের উচ্চতা তিন থেকে চার ফুট হয়। আমাদের দেশে দুই ধরনের ধান চাষ হয় —আউশ এবং আমন। আউশ ধান শুকনো ঝরঝরে মাটিতে বীজ ছড়িয়ে চাষ করতে হয়। আমন ধান রোয়াতে হয়। জমি কাদা করে সেই কাদার মধ্যে ধানের চাড়া পুঁতে দিতে হয়। সাধারণত বর্ষাকালে আমন ধানের চাষ হয়। আউশ ধান বৈশাখ মাসে

বোনা হয় এবং ভাদ্র মাসে কাটা হয়। আর আমন ধান জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় মাসে বোনা হয় এবং কাটা হয় অঘ্রান মাসে। বর্তমানে আউশ ধান প্রায় উঠেই গেছে। এখন বৈজ্ঞানিক প্রথায় একই জমিতে বছরে তিনবার ধান ফলানো যায়। এগুলি সবই উচ্চ ফলনশীল ধান। এগুলির নাম রত্না, জয়া, তাইচুং, পঙ্কজ, স্বর্ণ, আই.আর-৮, আই. আর-৩৬ ইত্যাদি। এই সব ধান চাষের জন্য প্রচুর পরিমাণে জলসেচ এবং সার ও কীটনাশক প্রয়োজন। ধান পাকলে শিষগুলি সোনালি বর্ণ ধারণ করে। পাকা ধান কেটে মেশিনের সাহায্যে ঝাড়াই করা হয়। ধানের খড় বা বিচালি গবাদি পশুর খাদ্য এবং গ্রামাঞ্চলে ঘরের চাল তৈরির উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আমাদের রাজ্যে বর্ধমান, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, হুগলি, মালদহ, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর প্রভৃতি জেলায় প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়। ভারতে ধান উৎপাদনে পশ্চিমবঙ্গ প্রথম। তবে পাঞ্জাব, হরিয়ানাতেও এখন প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়।

পাট

পাট তন্তুজাতীয় এবং ভারতের প্রধান অর্থকরী ফসল। আমাদের রাজ্য সারা ভারতে পাট উৎপাদনে প্রথম। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে হুগলি নদীর উভয় তীরে যে পাটকলগুলি তৈরি হয়েছিল, তা এই রাজ্যের পাট উৎপাদনের ওপর নির্ভর করেই। পাট গাছ প্রায় ৮-১০ ফুট লম্বা হয়। এই গাছের ছাল বা আঁশকেই পাট বলে। বৈশাখ মাসে পাট বোনা হয়। প্রকৃতির বৃষ্টি ছাড়াও পাটচাষে প্রচুর পরিমানে জল লাগে। বর্তমানে অগভীর নলকূপের সাহায্যে পাটের জমিতে সেচ দেওয়া হয়। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে পাটগাছ কেটে নেওয়া হয়। তিন-চারদিন পাটগাছ জমিতে গাদা করে রেখে দেওয়া হয়। তারপর পাতা ঝরে গেলে সেই পাট গাছ আঁটি বেঁধে জলাশয়ে পচাতে দেওয়া হয়। প্রায় ২০-২৫ দিন পর পাট গাছ পচে গেলে তা থেকে আঁশ ছাড়িয়ে আলাদা করা হয়। আঁশ ছাড়ানোর পর পাট গাছের লম্বা কান্ডটিকে পাটকাটি বলা হয়। পাটকাটি গ্রামাঞ্চলে জ্বালানি এবং বেড়া তৈরির কাজে লাগে। পাট থেকে চট, থলি, ব্যাগ, কার্পেট ও নানা ধরনের শৌখিন জিনিস তৈরি হয়। ভারতের পাটজাত দ্রব্য বিদেশেও রপ্তানি করা হয়। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশেও প্রচুর পাট উৎপন্ন হয়। পাট আসলে গ্রীষ্ম প্রধান দেশের ফসল। পাট চাষের জন্য যেমন ৩২°—৩৬° সেন্ট্রিগ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োজন, তেমনি প্রয়োজন প্রচুর বৃষ্টিপাতের। নদীবাহিত পলি বা দোঁয়াশ মৃত্তিকায় পাট চাষ ভালো হয়। পাটশিল্পের ওপর প্রচুর মানুষ নির্ভরশীল। আমাদের রাজ্যে পাটশিল্পকে বাঁচাতে সরকারি উদ্যোগ জরুরি।

চা

বর্তমান যুগে আমাদের দেশে চা হল সর্বাধিক ব্যবহৃত পানীয়। সকালে ঘুম থেকে উঠে সংবাদপত্র পাঠের সঙ্গে এক কাপ চা না হলে দিনটাই শুরু হয় না। আমাদের দেশ বিদেশে যে সব দ্রব্যসামগ্রী রপ্তানি করে তাদের মধ্যেও চা অন্যতম। চা রপ্তানি করে ভারত প্রচুর বিদেশি মুদ্রা অর্জন করে। চা আসলে গাছের পাতা। পার্বত্য অঞ্চলে ঢালু জমিতে চা-গাছের চাষ হয়। চা-চাষের জন্য লৌহমিশ্রিত দোঁয়াশ মাটির প্রয়োজন। এই চাষে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাতের দরকার। জমির প্রকৃতি এমন হবে যেখানে জল দাঁড়ায় না। চা গাছ অনেকটা গুল্ম জাতীয়। প্রায় তিন থেকে সাড়ে তিন ফুট উঁচু এই গাছগুলিকে মাঝে মাঝে ছেঁটে দিতে হয়। তারপর নতুন পাতা

গজায়। চায়ের কচিপাতা তুলে কারখানায় নিয়ে যাওয়া যায়। সেখানে বিশেষ পদ্ধতিতে পাতাগুলিকে শুকিয়ে চা তৈরি করা হয়। চা-গাছ প্রায় ১৫ থেকে ২০ বছর বাঁচে। চা বাগানে কিছু দূর অন্তর একটা করে পাতাওয়ালা বড়ো গাছ লাগাতে হয়। এই গাছের ছায়া চা-গাছকে কড়া রোদের হাত থেকে রক্ষা করে। ভারতে আসাম ও দার্জিলিং-এর পার্বত্য অঞ্চলে উৎকৃষ্ট শ্রেণির চা উৎপন্ন হয়। এছাড়া ভারতের নীলগিরি পর্বতে এবং অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চলেও কমবেশি চা উৎপন্ন হয়। পৃথিবীতে চা এখন অত্যন্ত জনপ্রিয় মাদকহীন একটি পানীয়।

গ্রীষ্মকাল

বাংলার ঋতুচক্রের প্রথম ঋতু হল গ্রীষ্ম। তার আগমনে সব যেন জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যায়। রুদ্রমূর্তি গ্রীষ্ম যেন ধ্যান মগ্ন ঋষি। বৈশাখ আর জ্যৈষ্ঠ মাস গ্রীষ্মের ব্যাপ্তিকাল। সূর্য যেন সবকিছুকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিতে চায়। বাতাসও তার প্রভাবে ক্ষেপে ওঠে। তারও নিশ্বাসে আগুন। ধরিত্রীর পশু-পাখি, মানুষজন, বৃক্ষলতা যেন ঝিমিয়ে পড়ে। শুকিয়ে যায় নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর-ঘাট। শূন্য মাঠের দিকে দুপুরে চেয়ে থাকলে মাথা ঝিম ঝিম করে। দূর দিগন্ত কেঁপে কেঁপে ওঠে মরীচিকার মতো। গ্রীষ্মকালের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল কাল বৈশাখী ঝড়। আপরাহ্ণে পশ্চিম আকাশে দুলে ওঠে ঘনকালো মেঘের জটাভার। দুরন্ত বেগে ঝড় ওঠে। ধুলোয় ধূসরিত হয়ে যায় চারিদিক। তারপর শুরু হয় বৃষ্টি। গ্রীষ্মের বৃষ্টি তো সঞ্জীবনী সুধা। তার স্পর্শে দেহ-মনে লাগে শান্তির পরশ, মাটির বুকে তৃণ অঙ্কুর মাথা তোলে। গ্রীষ্মকে বলা হয় ফলের ঋতু। এই সময় আম, জাম, কাঁঠাল, পেয়ারা, আনারস ইত্যাদি রসাল ফল পাওয়া যায়। বেল, জুঁই, রজনীগন্ধা, গন্ধরাজ প্রভৃতি ফুলের সৌরভে বাতাস সুরভিত হয়। বাংলার নববর্ষ পয়লা বৈশাখ দিয়ে হয় গ্রীষ্মের সূচনা। সেই কারণে গ্রীষ্ম নতুন বছরের বার্তা বহন করে আনে। রবীন্দ্রজয়ন্তী, নজরুলজয়ন্তী, জামাই ষষ্ঠী প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলি আমাদের ঘরে ঘরে আনন্দের বান ডাকে। গ্রীষ্ম দহন-তপ্ত ঋতু হলেও এর উপকারিতা কম নয়। কৃষিভিত্তিক বাংলার মাঠে মাঠে গ্রীষ্মকালেই প্রথম ফসলের বীজ রোপিত হয়। গ্রীষ্মই আবাহন করে আনে মৌসুমী কন্যা বর্ষাকে।

বাংলার বর্ষা

'নীল নবঘন আষাঢ় গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে,
ওরে, আজ তোরা যাসনে ঘরের বাহিরে।'

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বর্ষা মানে আলকাতরার মতো কালো আকাশ আর টাপুর টুপুর বৃষ্টির ছন্দময় নাচ। বর্ষা মানেই সবুজে সবুজে সব একাকার, জল থই থই নদী-নালা, পুকুর-ঘাটে প্রাণের হিল্লোল। বর্ষা মানে বাংলা রূপসী, রূপের তার নেইকো শেষ। আষাঢ় আর শ্রাবণ এই দুটো মাস হল বর্ষার ব্যাপ্তি। দহন তপ্ত পৃথিবী যেন নতুন করে প্রাণ ফিরে পায়। গ্রীষ্মের রোষানলকে প্রশমিত করে বর্ষাই বয়ে আনে শান্তির বার্তা। বাংলার বর্ষা তো সৌন্দর্যের লীলাক্ষেত্র। আকাশ ফর্সা গালে মেঘের কালি মেখে থাকলেও তার সুধাবর্ষণ জীবন ও জগতকে নতুন করে বাঁচার পথ দেখায়। বাংলা তো ফসলের দেশ। মাঠ সবুজ থাকলেই তার সমৃদ্ধি। বর্ষা হল মাঠ ভরা

ফসলের প্রধান কারিগর। যদিও গ্রামজীবনে বন্যার ভয়াবহতা দুর্যোগের কালো ছায়া বয়ে আনে, তথাপি বর্ষাই তো নবজীবনের বার্তাবাহক। রথযাত্রা, ঝুলন, রাখিবন্ধন, নন্দোৎসব প্রভৃতি উৎসব সব দুঃখকে ভুলিয়ে দেয়। অন্যদিকে আন্ত্রিক, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি জলবাহিত রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে সর্দি-কাশি। এই সময় ম্যালেরিয়া রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। বর্ষা আবার কবি-সাহিত্যিকদেরও ঋতু। মহাকবি কালিদাস বর্ষাকে পটভূমি করে রচনা করেছিলেন 'মেঘদূত' কাব্য। আমাদের বৈষ্ণব পদাবলিতে বর্ষার প্রভাব বেশি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও বর্ষকালকে নিয়ে অজস্র কবিতা লিখেছেন। আমরা সহজ পাঠে পড়েছি—

'আষাঢ়ে বাদল নামে নদী ভরো ভরো,
মাতিয়া ছুটিয়া চলে ধারা খরতর।'

শরৎকাল

'সেই গান মিলে যায় দূর হতে দূরে,
শরতের আকাশেতে সোনার রোদ্দুরে।' —রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শরৎকালকে বলা হয় ঋতু-রানি। সত্যিই শরৎ রানি বটে। 'কী বিচিত্র শোভা তার, কী বিচিত্র সাজ।' ভাদ্র-আশ্বিন মাসে সে আসে রানির বেশে বাংলার ঋতুরঙ্গ মঞ্চে। তখন বর্ষার কালো মেঘ ফিকে হয়ে যায়। সোনালি রোদ যেন সোনা হয়ে ঝরে পড়ে আউশের খেতে। আর পেঁজা তুলোর মতো সাদা মেঘের পানসি ভেসে চলে আকাশে। নদীর পাড়ে কাশ ফুল মাথা দোলায়। সরোবরে ফোটে পদ্মকলি। প্রশান্ত প্রকৃতি অন্য এক অনুভূতি বয়ে আনে মানুষের মনে। সকালের বাতাসে শিউলির মিষ্টি গন্ধ মনে করিয়ে দেয় মা দুর্গার আবাহনকে। শরৎ তো উৎসবের ঋতু। বাতাসে পুজো পুজো গন্ধ। মা দুর্গা আসেন সব দুঃখ ভুলিয়ে দিতে। আমরা বই ফেলে 'ছুটি ছুটি' খেলায় মেতে উঠি। ঢাকের কাঠিতে বেজে ওঠে তাককুড়াকুড় বোল। বাংলার ঘরে ঘরে তখন আগমনী সুর। গ্রাম-গঞ্জের কাদাপথ শুকনো হয়ে ওঠে। মানুষ তার মন থেকে মুছে ফেলে বন্যার স্মৃতি। শরতের জ্যোৎস্না তো বাংলার প্রকৃতিকে করে তোলে রূপকথার দেশ। মাঠে মাঠে পাকা ধানের সমারোহ নিস্তরঙ্গ পল্লিজীবনে সমৃদ্ধির বার্তা বয়ে আনে। চামেলি, মালতি, পদ্ম প্রভৃতি ফুল যেন শরতের গলায় সাতনড়ি হার। বাজারে নানা ফলের সমারোহ। কেউ কেউ আবার বেরিয়ে পড়েন ভ্রমণে। শরতে দুর্গাপুজো ছাড়াও লক্ষ্মীপুজো, শ্যামাপুজো, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া ঘরে ঘরে আনন্দের বার্তা বয়ে আনে। দুঃখ ভুলে বাঙালি মেতে ওঠে অনাবিল আনন্দে।

শীতকাল

হেমন্তের ফসল-কাটা মাঠের আলপথ ধরে শীত আসে গুটি গুটি পায়ে আমাদের বাংলায়। হিমেল হাওয়া জানিয়ে দেয় শীতবুড়ির আগমনের কথা। বাংলার ঋতুচক্রের পৌষ-মাঘ চলে যায় শীতের দখলে। শীতের প্রকৃতি বড়ো ধূসর ও রুক্ষ। দিগন্ত ঝাপসা, আকাশ ধোঁয়া ধোঁয়া। কুয়াশা আর ধোঁয়া মিলেমিশে তৈরি হয় ধোঁয়াশা। সবাই বলে শীত জড়তার ঋতু। একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে শীতকালই আমাদের কাছে বেশি আরামের, বেশি সুখের। শীত মানে তো শুধুই উৎসব আর মেলা। গ্রাম-শহর মেতে ওঠে বিচিত্র ধরনের মেলায়। বইমেলা, কৃষিমেলা, শিল্প মেলা, পৌষপার্বণের মেলা, গঙ্গাসাগর মেলা, এমনি কত যে মেলা শীতকালে হয় তার হিসাব নেই। যদিও পাতা ঝরার দিন, তবুও শীত গাছে গাছে কিশলয়ের আগমনী বার্তা বয়ে আনে। শীতের শেষে বসন্তে

গাছে গাছে নতুন পাতা উঁকি দেয়। শীতকালে রোগ বালাই একটু কম। তাই মানুষ বেড়িয়ে এবং খেয়ে খুব আনন্দ পায়। বাজার ভরে যায় হরেক রকম সব্জিতে। ফুলকপি, বাঁধাকপি, সিম, মটরশুঁটি, মুলো, পালংশাক, টমেটো ইত্যাদি সব্জির অঢেল আয়োজন। দিকে দিকে জমে ওঠে বনভোজন। খেজুর রস আর নলেন গুড়ের পায়েস-সন্দেশ শীতকালকে নতুনমাত্রা এনে দেয়। পৌষপার্বণে বাংলার ঘরে ঘরে নানা রকমের পিঠে-পুলির আয়োজন চলে। আসন্ন বড়োদিনের উৎসব উপলক্ষে বিচিত্র পোষাকে বাজার সেজে ওঠে। এই সময় ফুলেরও সমারোহ কম নয়। চন্দ্রমল্লিকা, গাঁদা, ডালিয়া ইত্যাদি ফুল শীতেরই উপহার। তারপর বড়ো-দিনের কেক এবং ইংরাজি নববর্ষ অন্য এক স্বাদ নিয়ে আসে আমাদের কাছে। গরিব মানুষ শীতের প্রকোপে একটু কষ্ট পায় বটে; তথাপি বাংলার ঋতুচক্রে শীতকালই হল সবচেয়ে আরামের এবং আনন্দের ঋতু।

বসন্তকাল

'ফাল্গুনে বিকশিত কাঞ্চনফুল
ডালে ডালে পুঞ্জিত আম্রমুকুল।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আমের মুকুলের গন্ধ ছড়িয়ে বসন্ত আসে আমাদের আঙিনায়। শীতবুড়ি বিদায় নেয় দূর দিগন্তে। কুয়াশার ওড়নার ফাঁকে ফাঁকে সোনালি রোদ মায়া বিস্তার করে। বাংলার ঋতু রঙ্গমঞ্চে ফাল্গুন আর চৈত্র মাস বসন্তরাজ। বসন্ত ফুল-পাতার ঋতু। শীতে ঝরে যাওয়া পাতার শূন্যস্থান পূরণ করে নব কিশলয়। ফুলে ফুলে ভরে যায় গাছের ডাল। শিমুল, পলাশ, কৃষ্ণচূড়া আর হরেক ফুলের রংবাহারি উদ্ভাসে ধরিত্রী হয়ে ওঠে রূপসী। হোলির রং আর ফুলের রং মিশে মানুষের মনও হয়ে ওঠে রঙিন। আমরা বিস্ময়ে প্রকৃতিকে দেখি আর বলে উঠি— "কী বিচিত্র শোভা তোমার, কী বিচিত্র সাজ!" রবীন্দ্রনাথও ফাল্গুনের রূপ দেখে স্থির থাকতে পারেননি। তিনিও আনন্দে গেয়ে উঠেছিলেন—

'খোল দ্বার খোল
লাগল যে দোল।'

বসন্ত যৌবনের ঋতু। বড়ো মনোরম এই ঋতুর পরিবেশ। হালকা শীতের মৃদুমন্দ বাতাস দেহমনে স্নিগ্ধতার পরশ দিয়ে যায়। নানা উৎসবে মেতে ওঠে মানুষ। এই সময় বাসন্তী পূজা, অন্নপূর্ণা পূজা, দোল উৎসব, চড়ক প্রভৃতি উৎসবে মানুষ অনাবিল আনন্দে দুঃখ ভুলে থাকে। বাংলার প্রাচীন সাহিত্যে, পদাবলিতে এবং লোকসংস্কৃতিতে বসন্তের প্রভাবই বেশি। আমাদের মনেরও একটা বাগান আছে। বসন্তে সেখানেও ফোটে কল্পনার ফুল। জীবনের সঙ্গে বসন্তের তাই নিবিড় যোগ।

দুর্গাপূজা

বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে যাবতীয় বিভেদ এবং দুঃখ ভুলে মানুষ এই উৎসবে মেতে ওঠে। যদিও দুর্গাপূজা ধর্মকেন্দ্রিক উৎসব, তথাপি ব্যাপকতার বিচারে এই উৎসব এখন সার্বজনীন রূপলাভ করেছে। বাংলাদেশে শরৎকালে দুর্গাপূজা হয় বলে একে 'শারদীয়া পূজা' বলা হয়। রামায়ণে আছে, শ্রীরামচন্দ্র

রিব মানুষ শীতের
বং আনন্দের ঋতু।

দিগন্তে। কুয়াশার
ত্র মাস বসন্তরাজ।
ল ফুলে ভরে যায়
ঠ রূপসী। হোলির

আনন্দে দুঃখ ভুলে
আমাদের মনেরও
বিড় যোগ।

মানুষ এই উৎসবে
সার্বজনীন রূপলাভ
আছে, শ্রীরামচন্দ্র

রাবণ বধের জন্য ১০৮টি নীলপদ্ম দিয়ে শরৎকালে দুর্গাপূজা করেন। নামে দুর্গাপূজা হলেও দেবী দুর্গার সঙ্গে তাঁর দুই ছেলে কার্তিক ও গণেশ এবং দুই মেয়ে লক্ষ্মী ও সরস্বতী থাকেন। দেবী দুর্গা এখানে মহিষমর্দিনী। তাঁর দশটি হাত। দশ হাতে দশ রকমের অস্ত্র। দেবীর বাহন হল সিংহ। ত্রিশূল দিয়ে তিনি মহিষাসুরকে বধ করেন। এই পুজোর ব্যাপ্তি কাল চারদিন। ষষ্ঠীতে দেবীর বোধন। তারপর সপ্তমীর সকালে নব পত্রিকা স্থাপনের মধ্যে দিয়ে দেবীর আরাধনা শুরু হয়। তারপর অষ্টমী ও নবমী তিথিতে দেবীর পুজো হয়। এই তিথির সন্ধিক্ষণে দেবীর যে পুজো হয় তাকে বলে 'সন্ধিপূজা'। দশমীতে দেবীর বিসর্জন। শুরু হয় প্রতিমা বিসর্জনের প্রস্তুতি। মহিলারা দেবী দুর্গাকে কন্যা রূপে কল্পনা করে তাঁর মাথায় সিঁদুর পরিয়ে দেন এবং মুখে মিষ্টি খাইয়ে পরের বছর আসতে বলে চোখের জলে বিদায় দেন। তারপর শুরু হয় প্রতিমা নিয়ে শোভাযাত্রা। নদীবক্ষে প্রতিমা বিসর্জনের পর শুরু হয় কোলাকুলি। পুরাণ মতে পার্বতী তাঁর স্বামীর ঘর কৈলাশ থেকে এই চারদিন বাপের বাড়ি আসেন। সেই বিশ্বাসে বাঙালি মায়েরা দুর্গাকে কন্যারূপে দেখে থাকে। দশমীতে তাঁর বিসর্জনে বাঙালির চোখের জল বাগ মানে না। হিন্দুধর্মমতে পূজা হলেও দুর্গাপূজা এখন দুর্গোৎসবে পরিণত হয়েছে। উৎসব মানে নানা মানুষের মিলন। গ্রাম-শহরে আনন্দের বান ডাকে। বাজার সেজে ওঠে নানা ধরনের সামগ্রীতে। প্রবাসীরা এই সময় বাড়ি ফিরে আসে। সকলকে পেয়ে বাঙালির ঘরে ঘরে যেন চাঁদের হাট বসে।

সরস্বতী পূজা

ভারতীয় পুরাণ মতে সরস্বতী বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই গৃহপরিমন্ডলের বাইরে শিক্ষাঙ্গনেও এই দেবীর আরাধনা করা হয়। মাঘ মাসের শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে দেবী পূজিত হন। দুর্গাপূজার মতো সরস্বতী পূজাও এখন সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে। কেননা, বিদ্যার দেবী বলে জাতি- ধর্ম সকলের কাছে মা সরস্বতী পূজনীয়। ক্লাব, লাইব্রেরি, স্কুল, কলেজ ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে মহা সমারোহে সরস্বতী পূজা অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। পুজোর একমাস আগে থেকেই প্রস্তুতি শুরু হয়। নিমন্ত্রণ-পত্র ছাপানো, প্রতিমা নির্মাণ, মন্ডপ তৈরি, চাঁদা তোলা ইত্যাদি কাজ চলতে থাকে। বিশেষ করে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সীমা থাকে না। বহু জায়গায় সরস্বতীপূজা উপলক্ষে প্রদর্শনী ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। হংসবাহিনী দেবী এখানে একক ভাবে পূজিত হন। তাঁর হাতে থাকে বীণা। প্রভাতে পূজার্চনা ও পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীরা মায়ের উদ্দেশ্যে অঞ্জলি দেয় এবং জ্ঞান ও বিদ্যা প্রার্থনা করে। দেবী কলুষনাশিনী, জ্ঞানদাত্রী। তাই সকলে করজোড়ে তাঁর কাছে জড়তামুক্ত মন ও বিদ্যা প্রার্থনা করে। পরের দিন শোভাযাত্রা সহকারে দেবীর বিসর্জন হয়। কোনো কোনো বাড়িতে দেবীকে এক বছরের জন্য রেখে দেওয়া হয়।

মহরম

নানা ভাষা নানা মতের দেশ এই ভারতবর্ষে উৎসব-পার্বণের শেষ নেই। বারো মাসে তেরো পার্বণের মধ্যে মহরম অন্যতম। এটি মূলত মুসলমান সম্প্রদায়ের উৎসব। এর পিছনে লুকিয়ে আছে এক করুণ ঐতিহাসিক কাহিনি ঃ হজরত মহম্মদের দুই দৌহিত্র হাসান ও হোসেন। হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর সমগ্র আরবের খলিফা পদ নিয়ে

বিরোধ বেধে উঠেছিল। তখন দামাস্কাসের শাসনকর্তা ছিলেন মাবিয়া। তিনি দামাস্কাসের খলিফা হলেন এবং এমাম হোসেন হলেন মদিনার খলিফা। মুসলমান সম্প্রদায় দু'ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে দেখে হোসেন মদিনার খলিফা পদ ছেড়ে মাবিয়াকে সমগ্র আরবের খলিফা বলে স্বীকার করে নিলেন। মাবিয়ার মৃত্যুর পর খলিফা পদ নিয়ে তার পুত্র এজিদের সঙ্গে হাসান ও হোসেনের বিরোধ বাধে। এজিদ ছিলেন অত্যন্ত কূটকৌশলী। তিনি কৌশলে হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন। তারপর হোসেনকে হত্যা করতে ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করতে থাকেন। হোসেন তখন মদিনা ছেড়ে মক্কায় পালিয়ে যান। তারপর আর এক ছলনার শিকার হলেন তিনি। কুফার ধর্মপ্রাণ মুসলমান সম্প্রদায় তাঁকে সাহায্য করবেন বলে তাঁকে জানানো হয়। সেই আশায় তিনি সপরিবারে কুফা যাত্রা করেন। কুফার পথেই বিশাল কারবালা ময়দান। সেখানেই এজিদের সৈন্যবাহিনী হোসেনকে ঘিরে ফেলে। অতর্কিত আক্রমণে হোসেন পরিবারের অনেককেই হত্যা করা হয়। একমাত্র নদী ফোরাতের জলও অবরুদ্ধ করা হয়। ফলে পিপাসায় অনেক জন মারা যায়। অবশেষে হোসেনকে বন্দি করে হত্যা করা হয়। সিমার নামক জনৈক ব্যক্তি হোসেনের মুন্ডু কেটে দামাস্কাস শহরে নিয়ে গিয়ে এজিদকে দেখিয়ে প্রচুর উপহার লাভ করেন। মহরম মাসের দশ তারিখে এই হৃদয়বিদারক ঘটনা ঘটেছিল বলে প্রতিবছর ওই দিনটিতে মহরম উৎসব পালন করা হয়। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা এই দিন কারবালার যুদ্ধের অনুকরণে 'তাজিয়া' নিয়ে শোভাযাত্রা করেন। অনেকে 'হায় হাসান, হায় হোসেন' বলে শোক প্রকাশ করেন। মহরম শোকের পর্ব হলেও এই উৎসব আসলে অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য শপথ গ্রহণের দিন। সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য মহরম এক প্রতীকী অনুষ্ঠান।

ইদ

মুসলমান সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড়ো খুশির উৎসব হল ইদ। ইদ দুই প্রকার— ইদ-উল-ফিতর এবং ইদুজ্জোহা। প্রথম ইদ হল সংযমের উৎসব। ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা একমাস উপবাস করেন। একে বলে 'রোজা'। যে মাসে এই রোজা পালিত হয় সেই মাসের নাম রমজান মাস। রমজান মাসে সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত নির্জলা উপবাস থাকতে হয়। সূর্যাস্তের পর ফলমূল, ঠাণ্ডাপানীয় ইত্যাদি সহযোগে উপবাস ভাঙতে হয়। একে বলে 'ইফতার'। এই নিয়ম একমাস চলে। একমাস ধরে কঠোর সংযমের জীবন যাপন করতে হয়। মিথ্যা না বলা, অন্যায় কাজ না করা, মানুষকে প্রতারণা না করা এবং গরিব দুঃখীদের দান করা রমজান মাসের প্রধান কর্তব্য। তারপর রমজান মাস শেষ হলে প্রতিপদের চাঁদ দেখে 'ইদ' পালন করা হয়। নতুন জামাকাপড় পরে ইদগাহে অথবা বিশাল ময়দানে সমবেত ভাবে নামাজ পড়া হয় এবং পরস্পরকে অলিঙ্গানের মাধ্যমে শুভেচ্ছা জানানো হয়। এই উৎসবে বাড়ি বাড়ি নানা ধরনের মিষ্টান্ন-পায়েস তৈরি হয়। জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকলকে ডেকে এনে খাওয়ানো হয়। এই রকমই আর এক উৎসব হল 'ইদুজ্জোহা'। অনেকে একে 'কুরবানী ইদ' বলে থাকেন। কারণ, এই উৎসবে সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশ্যে পশুবলি দেওয়া হয়। এই বলি আসলে অন্তরের পশুশক্তিকেই বলি দেওয়া। কথিত আছে, ইব্রাহিম তাঁর প্রিয় পুত্র ইসমাইলকে বলি দিতে উদ্যত হয়েছিলেন আল্লাকে খুশি করার জন্যে। সেই ঘটনাকে স্মরণ করে ইদুজ্জোহা পালিত হয়। উভয় ইদেই গরিব-দুঃখীদের দান করা হয়। বিভিন্ন জায়গায় ইদ উপলক্ষে মেলা বসে এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়। দূর দূরান্তের মানুষ এই সময় ঘরে ফিরে আসে। পাড়ায় পাড়ায় মিলনক্ষেত্র তৈরি হয়।

বড়োদিন

খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ উৎসব বড়োদিন। ২৫ ডিসেম্বর ঈশ্বরপুত্র যিশুর জন্মদিনে এই উৎসব পালিত হয়। খ্রিস্টধর্মাবলম্বীদের মতে মানবত্রাতা যিশু ওই দিনটিতে বেথলেহমে এক মেষপালকের কুটিরে জন্মগ্রহণ করেন। মানব-পরিত্রাতার এই জন্মদিন খ্রিস্টানদের কাছে পরম আনন্দের ও উৎসবের দিন। খ্রিস্টান ধর্মের উপাসনালয়কে গির্জা বলে। বড়োদিনে চোখ জুড়ানো আলোকমালায় গির্জাসমূহ সেজে ওঠে। সকালবেলায় খ্রিস্টানরা নতুন পোশাক পরে গির্জায় যান উপাসনায় যোগ দিতে। পথে বের হয় বুড়ো 'সান্তাক্লজ'। ছোটো ছোটো ছেলে মেয়েরা তাঁকে নিয়ে মেতে ওঠে। শীতকাল হওয়ার জন্য মানুষ মনোরম পরিবেশে প্রাণখুলে আনন্দ উপভোগ করতে পারে। এই সময় স্কুল, কলেজ ছুটি থাকে। সারা দেশ জুড়ে চলে নানা ধরনের মেলা। তার সঙ্গে যুক্ত হয় বড়ো দিন। তার ফলে মানুষের আনন্দের সীমা থাকে না। বড়ো দিনের প্রিয় খাবার হল কেক। দোকানে দোকানে মানুষের ভিড় জমে ওঠে। গির্জায় গির্জায় চলে উপাসনা এবং শুভেচ্ছা বিনিময়। খ্রিস্টানদের উৎসব হলেও বড়োদিন এখন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের উৎসব হয়ে উঠেছে। এই উৎসবের দিনে মানুষ পথে বেরিয়ে সমস্ত দিনটা আনন্দে উপভোগ করে এবং বিভিন্ন স্থানে বনভোজনের আয়োজন করে থাকে। আসলে যে উৎসবে বহু মানুষের সমাগম হয় সে উৎসব আর ধর্মীয় থাকে না, তা হয়ে ওঠে সকলের। বড়োদিনও এখন বাংলার বারোমাসে তেরো পার্বনের অন্যতম এক উৎসব।

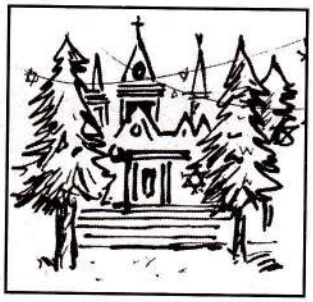

আমাদের জাতীয় পতাকা

'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সাথক জনম, মাগো, তোমায় ভালোবেসে।।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দেশ তো মায়ের সমান। তাকে ভালোবাসতে পারলেই জন্ম সার্থক। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। প্রায় দুশো বছর ইংরেজদের অধীনে ছিল এই দেশ। তখন আমরা পরাধীন ছিলাম। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। প্রত্যেক স্বাধীন দেশের একটা জাতীয় পতাকা আছে। জাতীয় পতাকা দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। তাকে মান্য করা নাগরিকদের কর্তব্য। ১৯৩০ সালে আইন অমান্য আন্দোলনের সময় গান্ধিজি আনুষ্ঠানিকভাবে গেরুয়া, সাদা ও সবুজ রঙ-শোভিত পতাকা প্রচলন করেন। ওই সময় সাদা অংশের উপরে অঙ্কিত ছিল চরকা। স্বাধীনতা লাভের পর জাতীয় পতাকায় চরকার পরিবর্তে অশোক চক্র ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে আমাদের স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকার তিনটি রং। আয়তাকার এই পতাকার দৈর্ঘ্য তিনফুট এবং প্রস্থ দুই ফুট। পতাকার ওপরের অংশটি গৈরিক বর্ণের। এই রং সাহস ও ত্যাগের প্রতীক। মাঝের অংশটি সাদা। সাদা রং সত্য ও শান্তির প্রতীক। সবার নীচে আছে সবুজ রং, যা শৌর্য ও বীরত্বের প্রতীক। পতাকার মাঝখানে নীল রঙের যে অশোকচক্র থাকে তা কর্ম ও অগ্রগতির প্রতীক। দেশবাসীর কাছে জাতীয় পতাকা খুব পবিত্র ও মর্যাদার বস্তু। সরকারি, বেসরকারি

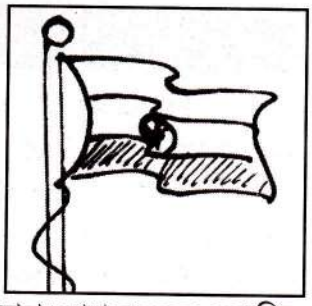

নানা অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। বিশেষ করে স্বাধীনতা দিবস, সাধারণতন্ত্র দিবস এবং বীর শহিদদের স্মরণ উৎসবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা আবশ্যিক। একটি উঁচু দন্ডের ওপর এই পতাকা উড়তে থাকে। তাছাড়া দেশের আদালতগুলিতে এবং রাষ্ট্রপতি, বিচারপতি, প্রধানমন্ত্রী প্রমুখের গাড়িতে জাতীয় পতাকা লাগানো থাকে। প্রকৃত পক্ষে জাতীয় পতাকা জাতির আশা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান জানানো প্রত্যেকের কর্তব্য। তাই আমরা সগর্বে জানাতে পারি—*'ঝন্ডা উঁচা রহে হমারা।'*

স্বাধীনতা দিবস

"ঐ গঙ্গায় ডুবিয়াছে হায় ভারতের দিবাকর"— কাজী নজরুল ইসলাম ভারতের স্বাধীনতা সূর্যকে ডুবতে দেখেছিলেন ১৭৫৭ সালে পলাশির যুদ্ধে সিরাজ-উদ্-দৌলার পরাজয়ের পর। কবি খুব আশাবাদী ছিলেন। তাই লিখেছেন "উদিবে সে রবি আমাদেরি খুনে রাঙিয়া পুনর্বার।" একদিন সত্য হয়েছে কবির সেই স্বপ্ন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করেছে। সে এক অন্ধকারময় যুগ। বাণিজ্য করতে এসে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আমাদের দেশকে দখল করে নিল। আমরা পরাধীন হয়ে গেলাম। প্রায় দুশো বছর আমরা পরাধীনতার শেকল পরে রইলাম। কত অত্যাচার, অবিচার চলেছে ভারতবাসীর ওপর। কত বীর সন্তান দেশমায়ের মুক্তির জন্য হাসিমুখে ফাঁসির দড়ি গলায় পরেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ, গান্ধিজি, নেতাজি, ক্ষুদিরাম, অরবিন্দ ঘোষ, প্রফুল্ল চাকী, মাস্টারদা সূর্য সেন, বিনয়-বাদল-দীনেশ, সাভারকর, ভগত সিং, জওহরলাল নেহরু প্রমুখের কথা ইতিহাসে সোনার অক্ষরে লেখা আছে। স্বাধীনতার জন্য এঁদের লড়াই কখনও ভুলে যাবার নয়। তাই স্বাধীনতা দিবস পালনের মধ্যে দিয়ে আমরা সেই বীর শহিদের অবদানের কথাই স্মরণ করি। স্বাধীনতা ছাড়া কোনো জাতি বড়ো হতে পারে না। পাখিকে খাঁচায় বন্দি করে রাখলে তার জীবনের বিকাশ বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতাহীনতায় মানুষও নিজের মতো করে বাঁচতে পারে না, থমকে যায় তার জীবনের বিকাশ। স্বাধীনতা মানে মান-মর্যাদা নিয়ে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকা। স্বাধীনতা মানে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করা। তাই যে কোনো জাতির কাছে স্বাধীনতা দিবস একটি জাতীয় উৎসবের দিন এবং একটি পরম পবিত্র দিন। কিন্তু সেই উৎসবে আনন্দের মাঝে দেশের জন্য জীবনদানকারী বীর শহীদের কথা যেন আমরা না ভুলি।

একতাই বল

ইংরেজিতে একটা কথা আছে—"United we stand, devided we fall"— কথাটা কেবল কথার কথা নয়। একতাই জাতির উত্থানের একমাত্র পথ। যে সমাজে বা দেশে একতা নেই, সেই সমাজ বা দেশের ওপর নানা আক্রমণ আসতে পারে। একদিন বাঁচার তাগিদে অরণ্যের আদিম মানুষও একতাবদ্ধ হয়েছিল। আমাদের মধ্যে একতা ছিল না বলে অল্পসংখ্যক ইংরেজ তেত্রিশ কোটি ভারতবাসীকে পরাধীনতার নাগপাশে বন্দি করে রেখেছিল। আমরা যেদিন সব ভেদাভেদ ভুলে একজোট হলাম, সেদিন ইংরেজরা আমাদের স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হল। একতার অভাবে বহু সংখ্যক সৈন্য নিয়েও সিরাজ-উদ্-দৌলা পলাশির প্রান্তরে ক্লাইভের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন। দেশের পক্ষে জনগণের একতার নামই জাতীয় সংহতি। এই সংহতি না থাকলে যে কোনো সময়ে দেশের সার্বভৌমত্ব নষ্ট হতে পারে। সেই কারণেই বলা হয়—'Union is strength'. সম্প্রদায়ে-সম্প্রদায়ে, জাতিতে-জাতিতে,

বর্ণে-বর্ণে একতা ও সাম্য বজায় থাকলে দেশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। প্রজাশক্তিই হল রাষ্ট্রশক্তির মূলকথা। ধর্মে-ধর্মে, জাতিতে-জাতিতে পার্থক্য তো থাকবেই। সেই পার্থক্যকে ভুলে দেশের স্বার্থে সকলকে একসুরে কথা বলতে হবে, এক সঙ্গে কাজ করতে হবে। তাহলেই দেশ সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাবে।

সময়ের মূল্য

'Time and Tide wait for none' — এই কথা সামনে রেখেই মানুষকে জীবনপথে অগ্রসর হতে হবে। তা নাহলে জীবনে বিপর্যয় অনিবার্য। মানুষের জীবন খুব ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পারলে শেষ জীবনে তাকে কাঁদতেই হবে। 'আগামী কাল করব' — এই বলে কোনো কাজ ফেলে রাখলে আর একটা কাজ এসে জমা হবে সামনে। এইভাবে ফেলে রাখা কাজের স্তূপ জমে উঠবে। তখনই মানুষ কাজের চাপে দিশাহারা হয়ে পড়বে। সুতরাং সময়ের কাজ সময়েই করতে হবে। সময় একবার অতিবাহিত হলে তাকে আর ফিরে পাওয়া সম্ভবপর নয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রথম জীবনে ইংরেজি ভাষায় কাব্য লিখতে গিয়ে অনেক মূল্যবান সময় ব্যয় করেছিলেন। কিন্তু সাফল্যলাভ করতে পারেন নি। এ জন্য শেষ জীবনে তিনি খুব আক্ষেপ করেছিলেন। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন—"কী ফল লভিনু হায়।" তিনি বুঝেছিলেন, সময়ের স্রোতে ভেসে যাওয়া জীবনকে আর নতুন করে পাওয়া সম্ভব নয়। তাই তাঁকে বলতে শোনা যায় — 'জীবন প্রবাহ বহি, হায়,/ কাল সিন্ধুপানে ধায়/ ফিরাবে কেমনে?' তাই সময়কে কখনই অবহেলা করা উচিত নয়। সময়ের কাজ সময়ে করে জীবনকে হালকা করে তুলতে হবে। আর যারা বৃথা কর্মে সময় নষ্ট করবে, তাদের জীবনের অন্তিমলগ্ন হবে অত্যন্ত বেদনার। জীবন তো একটা সময়ের গন্ডিতে আবদ্ধ। সেই সময়ের তালে পা ফেলে এগিয়ে যেতে পারলেই সাফল্য লাভ করা সহজ হবে।

শ্রমের মর্যাদা

"কেন পান্থ ক্ষান্ত হও হেরি দীর্ঘপথ,
উদ্যম বিহনে কার পুরে মনোরথ।"

এই পৃথিবী একদিন জঙ্গলে ভরা ছিল। ভয়াল প্রকৃতি আর হিংস্র জীবজন্তুদের সঙ্গে প্রতিনিয়ত লড়াই করে মানুষকে বেঁচে থাকতে হত। তারপর একদিন মানুষ শ্রমকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীকে বসবাসের উপযোগী করে তুলল। এই সুন্দর কুসুমিতা বসুন্ধরা তো মানুষের শ্রমেরই ফসল। ধরিত্রী জননী শ্রমজীবী মানুষের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে এই সুন্দর পরিবেশ তাদের উপহার দিয়েছেন। তা নাহলে আজও এই পৃথিবী জঙ্গলে ভরা থাকত। যারা শ্রমকে ভয় পায়, তাদের জন্য এই পৃথিবী নয়। কর্মহীন মানুষ জড়তার অচলায়তনে বন্দি হয়ে কেবল অদৃষ্টের দোহাই দেয়। পৃথিবীতে তাদের কোনো মুক্তি নেই, নেই জীবনের বিকাশ। পশুরাজ সিংহ খুব বলবান। কিন্তু সে যদি গুহায় ঘুমিয়ে কাটায়, তবে বাঁচতে পারে না। তাকেও শিকারের জন্য পরিশ্রম করতে দূর দূরান্তে যেতে হয়। মানুষও তো কর্মের দাস। কর্ম ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। পৃথিবী তো একটা রণক্ষেত্র। রণক্ষেত্রে সৈনিকরা নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। জয়লাভ করতে হলে তাদের যুদ্ধ করতেই হবে। রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেছেন —'এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।' এই পৃথিবীতে যোগ্যতমেরই জয় হয়। যে মানুষ পরিশ্রমী, সেই লাভ করে বিজয় মুকুট। আর যে শুয়ে থাকে, তার ভাগ্যও শুয়ে থাকে। অলস ব্যক্তির বাঁচা-মরা একই কথা। কথায় আছে —' ডিউটি করলে বিউটি বাড়ে।' তাই 'ডিউটি' করেই আমাদের জীবনের 'বিউটি' বাড়াতে হবে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

"জগৎ কবির সভায় মোরা তোমার কবি গর্ব" — সত্যিই রবীন্দ্রনাথ আমাদের গর্ব, আমাদের অহংকার। তাঁর প্রতিভার সর্ববিস্তারী আলোয় আমাদের ভুবন আজও জোতির্ময়। বিশ্ববন্দিত মানবতাবাদী এই কবি ১৮৬১ সালের ৭মে, বাংলা ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ কলকাতার বিখ্যাত জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মাতার নাম সারদা দেবী। বিদ্যালয়ের প্রথাগত শিক্ষার গন্ডিতে তাঁর মন বসেনি। তাই ছোটোবেলায় 'স্কুল পালানো ছেলে' বলে তাঁর দুর্নাম ছিল। গৃহ পরিমন্ডলেই তাঁর শিক্ষা চলতে থাকে। কলকাতার ওরিয়েন্টাল সেমিনারী এবং নর্মালস্কুলে তাঁকে ভর্তি করা হলেও সেখানে তাঁকে বেঁধে রাখা যায় নি। ঐতিহ্যমন্ডিত ঠাকুর বাড়িই তাঁর জীবনের প্রকৃত স্কুল। মাত্র বারো বছর বয়স থেকে রবীন্দ্রনাথ কবিতা লিখতে শুরু করেন। অচিরেই হয়ে ওঠেন সম্ভাবনাময় কবি। তাঁর কাব্যগ্রন্থ গুলি হল- প্রভাত সংগীত, সন্ধ্যাসংগীত,সোনার তরী, মানসী,গীতাঞ্জলি, গীতালি, গীতিমাল্য, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, ইত্যাদি। তাঁর রচিত উপন্যাসগুলি হল চোখের বালি, নৌকাডুবি, চতুরঙ্গ, গোরা, ঘরে বাইরে, রাজর্ষি, বৌ ঠাকুরানীর হাট প্রভৃতি। তিনখন্ডে সমাপ্ত 'গল্পগুচ্ছ', তাঁর অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। তাঁর রচিত রক্তকরবী, মুক্তধারা, ডাকঘর, রাজা ও রাণী, কালের যাত্রা প্রভৃতি নাটকগুলি বাংলা সাহিত্যের চিরন্তন সম্পদ। তাঁর রচিত অজস্রগান মানুষের হৃদয় বীণায় আজও জীবনের সুর তোলে। ১৯১৩ সালে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার পান। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়' পূর্ব ভারতের একটি স্মরণীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। স্বদেশপ্রেমী, দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ শুধু ভারতের কেন, বিশ্বের বিস্ময়। ২০১১ সালের তাঁর জন্মের দেড়শো বছর পূর্ণ হয়েছে। ১৯৪১ সালের ৭ আগস্ট, বাংলা ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ২২ শ্রাবণ এই মহান কবির জীবনাবসান ঘটে।

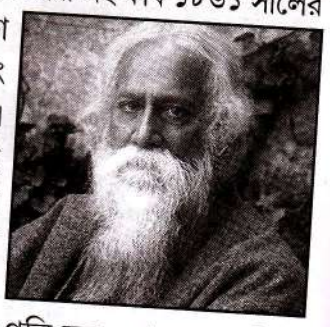

কাজী নজরুল ইসলাম

'আমি এলোকেশী ঝড়, অকাল বৈশাখীর' — নজরুল একটি ঝড়ের নাম। বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব ধূমকেতুর মতো। খুব অল্প সময়ের মধ্যে বাঙালিকে নাড়া দিয়ে ছিলেন তিনি। ১৮৯৮ সালের ২৫ মে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে নজরুলের জন্ম হয়। পিতার নাম কাজী ফকির আহমেদ এবং মাতার নাম জাহেদা খাতুন। নজরুল যখন খুব ছোটো তখন তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। বালক নজরুল দুঃখের সাগরে ভাসতে থাকেন। ছোটো বেলায় তাকে 'দুখু মিঞা' বলে ডাকা হত। দারিদ্র্যের কারণে লেখাপড়া বেশিদূর এগোয়নি। জীবিকার জন্য তিনি চায়ের দোকানে, যাত্রাদলে কাজ করেছেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগ দেন। চলে যান পাকিস্তানের করাচিতে। তারপর চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে কবিতা রচনায় মনোনিবেশ করেন। তাঁর 'বিদ্রোহী, কবিতা সেই সময় সারা বাংলায় সাড়া ফেলে দেয়। বৃটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তাঁর কবিতাগুলি ছিল যেন ধারালো তরবারি। এই জন্য বৃটিশ সরকার তাঁকে জেলে বন্দি করে রাখে। জেলের মধ্যে বসেও তিনি কবিতা লেখেন। বাংলার মানুষের মুখে মুখে তাঁর কবিতা প্রচারিত হতে থাকে। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল—বিষের বাঁশি, অগ্নিবীণা, ভাঙার গান, প্রলয়শিখা, ছায়ানট, সাম্যবাদী, সর্বহারা ইত্যাদি। এছাড়া কুহেলিকা, বাঁধনহারা প্রভৃতি

উপন্যাস এবং ব্যথার দান, রিক্তের বেদন, শিউলিমালা প্রভৃতি ছোটগল্প লিখেছিলেন। নজরুল ছিলেন মানুষের কবি। হিন্দু-মুসুলমানের ভেদা ভেদ দূর করতে তিনি লিখেছিলেন — 'মোরা একই বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসুলমান।' ১৯৪২ সাল থেকে তিনি বাক্‌রুদ্ধ হয়ে যান। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি সুস্থ হতে পারেননি। অবশেষে ১৯৭৬ সালের ২৯ আগস্ট বাংলাদেশের ঢাকা শহরে তাঁর দেহাবসান ঘটে। আজও তাঁর কবিতা ও গান বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হয়। আজও আমরা বলি —'সবার হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ, চেতনাতে নজরুল।'

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু

ভারতবর্ষ পুণ্যভূমি। বহু মনীষী ও বীরসন্তানের পদধূলি মিশে আছে এদেশের মাটিতে। এদেশের ইতিহাস তাই গৌরবের ইতিহাস। সেই ইতিহাসের কিংবদন্তি নায়ক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। তাঁর দেশপ্রেম সোনার অক্ষরে খোদিত আছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে। ১৮৯৭ সালের ২৩ জানুয়ারি ওড়িশার কটক শহরে নেতাজির জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম জানকীনাথ বসু এবং মাতার নাম প্রভাবতী দেবী। সুভাষ চন্দ্র কটক শহর থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন এবং কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হন। সেখানে এক ইংরেজ সাহেবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হওয়ার জন্য তাঁকে ঐ কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। পরে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন। এরপর তিনি ইংল্যান্ড থেকে আই.সি.এস পরীক্ষায় চতুর্থ স্থান লাভ করেন; কিন্তু ইংরেজ সরকারের অধীনে চাকরি করেন নি। সেই সময় মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠেছে। নেতাজি যোগ দিলেন জাতীয় কংগ্রেসে। পরবর্তী কালে নিজে 'ফরোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি দল তৈরি করেন । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি ইংরেজদের চোখে ধুলো দিয়ে জার্মানিতে চলে যান। জার্মানি থেকে যান জাপানে। সেখানে রাসবিহারী বসুর আজাদ-হিন্দ-ফৌজের তিনি সর্বাধিনায়ক নির্বাচিত হন। 'দিল্লি চলো'— এই ডাক দিয়ে তিনি ভারতের দিকে অগ্রসর হন। প্রাণপণ যুদ্ধ করে আজাদ-হিন্দ-বাহিনী ইংরেজদের কাছে পরাজিত হয়। পরাজয়ের পর নেতাজি জাপানের পথে যাত্রা করেন। কিন্তু প্রচারিত হয় এই সময় এক বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আজও তাঁর মৃত্যু রহস্য উন্মোচিত হয় নি। সে যাই হোক, বীরের কখনও মৃত্যু হয় না। নেতাজি আজও বেঁচে আছেন ভারতবাসীর হৃদয়ে। আজও ভারতবাসী তাঁর পথ চেয়ে বরণের মালা গেঁথে বসে আছেন আর বলছেন — 'হে বীর, পূর্ণ করো তোমার আসন।'

স্বামী বিবেকানন্দ

জাতির জীবনে যখন অনাচার, অবক্ষয় নেমে আসে, তখনই জ্ঞানের প্রদীপ শিখা হাতে মহাপুরুষেরা এই পৃথিবীতে অবতরণ করেন। বীর সন্ন্যাসী ভারতের জাতীয়তাবোধকে জাগিয়ে ভারতবাসীর আত্মার জাগরণ ঘটাতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন একাধারে বীর এবং সন্ন্যাসী। ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি কলকাতার সিমলা অঞ্চলের দত্ত পরিবারে বিবেকানন্দের জন্ম হয়। তার প্রকৃত নাম নরেন্দ্রনাথ দত্ত। ডাক নাম বিলে। তাঁর পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন বিখ্যাত আইনজীবী। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র ছিলেন বিবেকানন্দ। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে দর্শন শাস্ত্রে বি. এ পাশ করেন। হঠাৎ একসময় ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে —'ঈশ্বর

আছেন, না নেই।' বিচলিত হয়ে পড়েন তিনি। অবশেষে দক্ষিণেশ্বরের পরম সাধক শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের কাছে আসেন। তাঁর কাছেই বিবেকানন্দ পেয়ে যান তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তর। তারপর গ্রহণ করলেন রামকৃষ্ণের শিষ্যত্ব। সন্ন্যাস জীবন গ্রহণের পর থেকেই নরেন্দ্রনাথের নাম হল স্বামী বিবেকানন্দ। ১৮৮৬ সালে রামকৃষ্ণদেবের মৃত্যুর পর বিবেকানন্দ ভারত ভ্রমণে বের হন। দরিদ্র, নিপীড়িত, অজ্ঞ ভারতবাসীকে দেখে তাঁর মনে গভীর অনুতাপ দেখা দিল। তিনি উপলব্ধি করলেন আগে এদের সবার মুখে অন্ন দিতে হবে। দেহবল না থাকলে মনোবল আসে না। আর্ত-দুর্গত মানুষদের সেবার জন্য তৈরি করলেন 'রামকৃষ্ণ মিশন'। পাথরের দেবতা নয়, জীবন্ত দেবতার সেবার মাধ্যমে জীবন উৎসর্গ করলেন। ১৮৯৩ সালে আমেরিকার চিকাগো শহরে 'বিশ্বধর্ম মহাসম্মেলন'-এ তিনি ভারতের সনাতন ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে জগদ্বিখ্যাত হন। তিনি বলতেন — 'সত্যের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যায়; কিন্তু কোনো কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না।' দেশ যে জননীর সমান তা বিবেকানন্দ আমাদের শিখিয়েছেন। তিনি না থাকলে আজ আমরা স্বাধীনতা পেতাম না, কুসংস্কার ও ধর্মান্ধতা থেকে মুক্তি পেতাম না। ১৯০২ সালের ৪ জুলাই মাত্র ৩৯ বছর বয়সে এই মহান সন্ন্যাসীর মহাপ্রয়াণ ঘটে। ২০১২ থেকে তার জন্মের সার্ধশত বর্ষ উদযাপনের সূচনা হয়েছে। তাঁর মত ও পথ গ্রহণ করতে পারলেই আমরা আবার জগৎ সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারব।

বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু

বাঙালি বিজ্ঞানীদের মধ্যে জগদীশ চন্দ্র বসু সর্বজনপ্রিয় এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয়। উদ্ভিদের প্রাণ আছে — একথা প্রমাণ করেন তিনি। ১৮৫৮ সালের ৩৯শে নভেম্বর ঢাকার রাঢ়িখাল গ্রামে জগদীশচন্দ্র বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ভগবানচন্দ্র বসু ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। ফরিদপুরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর বাল্যশিক্ষা সমাপ্ত হয়। তারপর কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। ১৮৮০ সালে সেখান থেকে বি.এ.পাশ করেন। এরপর তিনি লন্ডনে প্রণীবিদ্যা ও উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে পড়াশুনা করেন। ১৮৮৩ সালে তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এবং উদ্ভিদবিদ্যায় 'ট্রাইপোস্' ডিগ্রি লাভ করেন। বিদেশ থেকে ফিরে ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। পাশাপাশি চলতে থাকে তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা। বেতার যন্ত্র তাঁর স্মরণীয় আবিষ্কার। তিনিই প্রথম প্রমাণ করেন যে, উদ্ভিদের প্রাণ আছে। ১৮৯৬ সালে তিনি ডি.এস-সি. উপাধি পান। তিনি উদ্ভিদবিদ্যা নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি 'কেস্কোগ্রাফ' নামে একটি যন্ত্র আবিষ্কার করে সেই যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করে দেখান যে, গাছেদের জীবন আমাদের মতো। তাদেরও বৃদ্ধি ও মৃত্যু আছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' আজও আমাদের গর্ব। আজীবন বিজ্ঞান সাধনায় নিমগ্ন থেকে অবশেষে ১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। শুধু বিজ্ঞান নয়, সাহিত্য চর্চাতেও তিনি ছিলেন নিরলস সাধক। তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম 'অব্যক্ত'। বাঙালির বিজ্ঞান সাধনার পরিধিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিয়ে তিনি কিংবদন্তির মতো স্মরণীয় হয়ে আছেন।

করুণাময়ী মাদার টেরেসা

'জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণা ধারায় এসো।'

কবির এই বাণীর সার্থক দৃষ্টান্ত মাদার টেরেসা। যিশু খ্রিস্ট মানুষকে সেবা করা এবং ভালবাসা ঈশ্বর লাভের উপায় বলেছিলেন। মাদার টেরেসা মানুষের সেবাকেই তাঁর জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। আশ্রয়হীন, আর্ত মানুষের সেবাকর্মকে জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। মা টেরেসা ১৯১০ সালের ২৭ আগস্ট ইউরোপের আলবানিয়ার স্কোপেজ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাল্য নাম ছিল অ্যাগনেস। ছোটোবেলা থেকেই অ্যাগনেস ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। গির্জায় বসে ধর্ম কথা শুনতে শুনতে তন্ময় হয়ে যেতেন। তারপর বড়ো হয়ে শুনতে পেলেন মানুষের ডাক। আর ঘরে থাকতে পারলেন না তিনি। বেরিয়ে পড়লেন পথে। ১৯২৯ সালে তিনি ইউরোপ থেকে কলকাতায় চলে আসেন এবং এখানে এন্টালির কাছে সেন্ট মেরিজ লরোটো স্কুলে শিক্ষায়িত্রী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। এখানেই স্থাপন করলেন তাঁর সেবা কেন্দ্র। এরপরে তিনি ১৯৫০ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন 'মিশনারিজ অব্ চ্যারিটি' নামক সেবা প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে তাঁর সেবা কর্ম ছড়িয়ে পড়ে। কুষ্ঠরোগী, অনাথ শিশু এবং আশ্রয়হীন মানুষদের জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে খুলেছেন সেবা কেন্দ্র। এমনি একটি সেবা কেন্দ্রের নাম 'নির্মল হৃদয়।' সেবামূলক কাজে তাঁর মমতাময়ী রূপ দেখে পৃথিবীর মানুষ তাঁকে 'মা' বলে জেনেছে। সেবামূলক কাজে স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি বহু পুরস্কার পেয়েছেন। ১৯৭৯ সালে তিনি 'নোবেল শান্তি পুরস্কার' পান। ১৯৯৬ সালে ভারত সরকার তাঁকে 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেছে। ১৯৯৭ সালের ৫ সেপ্টেম্বর করুনাময়ী মাদার টেরেসার দেহাবসান ঘটে। আর্ত, পীড়িত, অসহায় মানুষের চিরন্তন 'মা' রূপে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

মহাত্মা গান্ধি

পরাধীনতার যুগে দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা সর্বস্ব ত্যাগ করে ভারতের গৌরবময় ইতিহাসে নিজের নাম স্বর্ণাক্ষরে খোদিত করেছিলেন, মাহাত্মা গান্ধি তাঁদের অন্যতম। তাঁর চরিত্রের মাধুর্য এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠা দেখে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'মহাত্মা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। তিনি আমাদের জাতির জনক। তাঁর নাম শুনলেই শ্রদ্ধায় আমাদের মাথা নত হয়ে আসে। আমরা তাঁকে 'বাপুজি' বলেও জানি। ১৮৬৯ সালের ২ অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আসল নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধি। তাঁর পিতার নাম করমচাঁদ গান্ধি এবং মাতার নাম পুতলি বাঈ। ভারতে পড়াশুনা শেষ করে তিনি ইংল্যান্ডে ব্যারিস্টারি পড়তে যান। তারপর দেশে ফিরে মুম্বাইয়ে আইন ব্যবসা শুরু করেন। কিছুদিন পরে একটা মামলা চালাতে তিনি দক্ষিণ অফ্রিকা যান। সেখানে ভারতীয়দের ওপর ইংরেজদের অত্যাচার তাঁকে ক্ষুব্ধ করে। সেখানেই তাঁর জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে।

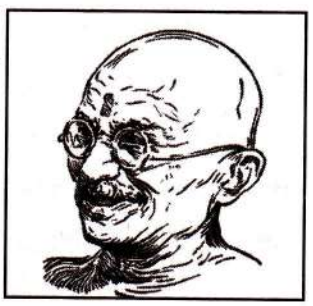

সেখানেই তিনি ভারতীয়দের নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন। তারপর ১৯১৫ সালে ভারতে ফিরে স্বাধীনতা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। তাঁর নেতৃত্বে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস জাতীয় দলে পরিণত হয়। অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, আগস্ট আন্দোলন ইত্যাদিতে তাঁর ভূমিকা ছিল অগ্রণী সৈনিকের মতো। ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাঁর এই লাগাতার সংগ্রামের পথ ধরেই অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ঠ ভারত স্বাধীনতা পেয়েছিল। কোনো হিংসাত্মক আন্দোলনে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। তিনি ছিলেন অহিংস সত্যাগ্রহের জীবন্ত প্রতিমূর্তি। সাধারণ দরিদ্র মানুষের জন্য তাঁর দরদ ছিল অপরিসীম। তিনি দরিদ্র হরিজনদের জন্য সবরমতী নদীর তীরে 'সবরমতী আশ্রম' গড়ে তুলেছিলেন। বহু অসহায় মানুষ তাঁর সবরমতী আশ্রমে ঠাঁই পেয়েছিল। তাঁর 'করেঙ্গা ইয়ে মরেঙ্গে' মন্ত্র আজও আমাদের মনে উন্মাদনা জাগায়। অতি সাধারণ জীবনযাপনের মাধ্যমে তিনি যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তা আজও অম্লান আদর্শ রূপে স্মরণীয় হয়ে আছে। ১৯৪৮ সালের ৩০ জানুয়ারি এক আঁততায়ীর গুলিতে তিনি প্রাণ হারান। তাঁর আদর্শ এবং জীবন দর্শন আমাদের চিরাচরিত ঐতিহ্য। ভারতবাসীর হৃদয় সিংহাসনে তাঁর অমরতার আসনখানি চিরমর্যাদায় চিরভাস্বর।

বিশ্বজয়ী কন্যাশ্রী

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের প্রধান লক্ষ্য হল জনগণের কল্যাণ সাধন। সেই উদ্দেশ্যে সরকার নানা প্রকল্প রচনা করে থাকে এবং সেগুলির রূপায়ণে সচেষ্ট হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২০১৩ সালে 'কন্যাশ্রী' নামে একটি প্রকল্প চালু করে। আমাদের দেশে নারীশিক্ষার গতি খুব ধীর। এর অন্যতম কারণ দারিদ্র্য এবং সামাজিক বাধা। তাই সামাজিক ও পারিবারিক বাধাকে দূর করতে হলে অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতির দিকেও লক্ষ রাখতে হবে। সেই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নারীশিক্ষার অগ্রগতির লক্ষ্যে 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' রূপায়ণে বিশেষ জোর দেন। প্রকল্পটির শর্ত হল ঃ যাদের বার্ষিক আয় এক লক্ষ কুড়ি হাজার টাকার নীচে, সেই পরিবারের কন্যা সন্তানরা ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত বার্ষিক ৫০০ টাকা করে পাবে এবং ১৮ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে অবিবাহিত কন্যারা পাবে বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা। ২০১৩ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে প্রায় ৯১ লক্ষ ছাত্রী এই প্রকল্পের অধীনে এসেছে। এই প্রকল্প চালু হওয়ার ফলে সামাজিক ক্ষেত্রে মেয়েদের মর্যদা বেড়েছে। মেয়েরা বেশি করে স্কুলমুখী হয়েছে, বাল্যবিবাহের হার হ্রাস পেয়েছে এবং স্কুলছুট ছাত্রীর সংখ্যা কমেছে। পশ্চিমবঙ্গের 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' সারা ভারতে নারী প্রগতির নতুন দিগন্ত হয়ে উঠেছে। ২০১৭ সালে ২৪ জুন এই প্রকল্পটি রাষ্ট্রপুঞ্জের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছে। ৬২টি দেশের ৫৫২ টি প্রকল্পের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। বিশ্বজয়ী কন্যাশ্রী নারীর আপন ভাগ্য জয় করার নতুন দিশারি হয়ে সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

আমার প্রিয় খেলা ঃ ক্রিকেট

পৃথিবীতে ফুটবল এবং ক্রিকেটই সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা। এই দুটি খেলার মধ্যে ক্রিকেটই আমার কাছে প্রিয়। আগে বলা হত ক্রিকেট সাগর পারের খেলা। আমাদের দেশ দু'বার বিশ্বকাপ ক্রিকেট জিতে প্রমাণ করে দিয়েছে, 'আমরাও পারি।' ক্রিকেট হল দলগত খেলা। প্রতিদলে এগারো জন খেলোয়াড় থাকে। একপক্ষ ব্যাট করে, অপর পক্ষ ফিল্ডিং করে। খেলা হয় ইনিংস বা সীমিত ওভারে। যারা বেশি রান তোলে, তারাই বিজয়ী হয়। যেখানে ব্যাটে বলে লড়াই চলে তাকে বলা হয় পিচ্। তার দুধারে তিনটি করে স্টাম্প থাকে। স্টাম্পের দুদিকে দু'জন ব্যাট্সম্যান থাকে। ব্যাটের দ্বারা বল মেরে দু'জন জায়গা বদল করে— একে বলা হয় রান তোলা। যতবার জায়গা বদল করা হয়, রান সংখ্যাও তত হয়। বল মাঠের বাইরে গড়িয়ে গেলে চার এবং ওপর দিয়ে গেলে ছয় রান হয়। রান নেওয়ার সময় ব্যাট্সম্যান উইকেটে পৌঁছানোর আগে প্রতিপক্ষ বল দিয়ে উইকেট ফেলে দিলে 'আউট' ধরা হয়। আবার বোলার সরাসরি বল দিয়ে উইকেট ভাঙলে বা ফিল্ডার ক্যাচ ধরলেও ব্যাট্সম্যান আউট হয়। দু'জন আম্পায়ার এই খেলা পরিচালনা করেন। ক্রিকেট দক্ষতার খেলা। এরজন্য প্রচুর শারীরিক কসরৎ করতে হয়। যাঁরা ক্রিকেট খেলেন, তাঁদের শারীরিক গঠন খুব ভালো হয়, হাত ও পায়ের পেশি খুব মজবুত হয়। ক্রিকেট একাগ্রতার খেলা। চোখ ও মনকে সবসময় সতর্ক রাখতে হবে। ক্রিকেট খেলে দেশকে বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করা যায়। আমাদের ভারতের শচীন তেন্ডুলকার বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়। আমাদের দেশ ভারত দুবার বিশ্বকাপ ক্রিকেটে শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা পেয়েছে। এই কারণে ক্রিকেটই আমার প্রিয় খেলা।

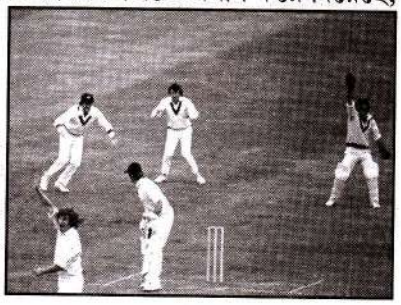

আমার ভালোলাগা একটি বই

ছোটোবেলা থেকে অনেক বই-ই তো পড়ছি। এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুটি 'সহজপাঠ' ই আমার কাছে সেরা বই। নন্দলাল বসুর আঁকা ছবি আর রবীন্দ্রনাথের মন ছুঁয়ে যাওয়া লেখার এমন সুন্দর সমন্বয় আর কোথাও আমি পাই নি। কী নেই সহজ পাঠে? এখানে আছে ভূগোল, বিজ্ঞান, সমাজনীতি, অর্থনীতি, আরও কত কী। আর আছে বিভিন্ন পেশার মানুষ। অক্ষরের সিঁড়ি বেয়ে আমরা চলে যাই বাক্যের জগতে। সেখানে আমবনে বাঘের দেখা পেয়ে যাই। গায়ে তার চাকা চাকা দাগ। গা শিউরে উঠে। আমরা সহজে চিনে নিতে পারি পাতুপাল, অবিনাশ, গুরুদাস, মধুরায় প্রমুখ মানুষদের। আর পেয়ে যাই আমাদের ছোটো নদীটিকে। তার পারে বালি চিক্‌চিক্ করে এবং দুইপারে সাদা কাশফুল ফুটে থাকে। আদ্যনাথ বাবুর মেয়ের বিয়ের কথা আমরা জানতে পারি সহজেই। শুধু বই পড়লে হবে না। সামাজিক কাজ কিছু করতে হবে। তাই মঙ্গালবারে পাড়ার জঙ্গাল সাফ করবার দিন। সকলকে দলবেঁধে যেতে হবে। কখনও আবার বেরিয়ে পড়ি উস্রিনদীর ঝরনা দেখতে। আমরা আরও পেয়ে যাই আব্দুল মাঝির গল্প। শক্তিনাথ আর মুক্তিনাথের শিকার কাহিনি। গুপ্তিপাড়ার বিশ্বম্ভর বাবুকে ভোলা যায় না। এমন ডাক্তার আজকের দিনে পাওয়া দুষ্কর। এমনিভাবে কত ছোটো ছোটো গল্প আর কবিতার মালায় সাজানো সহজপাঠের পাতা। পড়তে পড়তে মনে হয় অন্ধ কুঞ্জবিহারীর

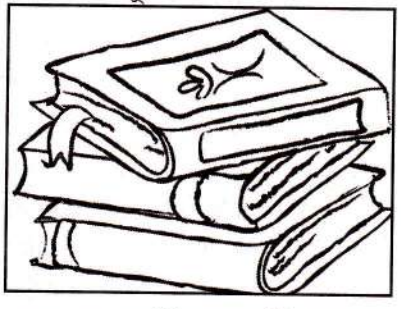

একতারার সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠি বাউল গান। এমন বই আর বাংলা সাহিত্যে ছোটোদের জন্য লেখা হয়েছে কিনা আমার জানা নেই। 'সহজপাঠ' আমাদের জীবনের ধ্রুবপাঠ। তা পাঠ করেই আমি প্রজাপতি হয়ে আকাশে উড়ে যেতে পারি।

একটি বনভোজনের অভিজ্ঞতা

"হৃদয় আমার নাচেরে আজিকে
ময়ূরের মতো নাচেরে।"

বনভোজনের কথা শুনলে কার না হৃদয় নেচে ওঠে। একটা দিন মুক্তডানায় ভর করে যেথা খুশি সেথা যাওয়া কী কম কথা। গত ডিসেম্বরে আমাদের স্কুল থেকে বাসে করে বনভোজন করতে গিয়েছিলাম সুবজ দ্বীপে। গঙ্গার মাঝখানে সবুজ দ্বীপ। কী সুন্দর জায়গা। যেন কোন রূপকথার দেশে এসে পড়েছি।

শহর থেকে দূরে সবুজের মাঝখানে নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে ভাবছিলাম পৃথিবীতে এমন জায়গা বোধ হয় কোথাও নেই। সবুজ ঘাস, ফুলের বাগান, গাছ গাছালি আর চারিদিকে ঢেউয়ের ছলাৎ ছলাৎ শব্দ। এর মাঝখানে চলছে আমাদের বন ভোজনের রান্না। আমরা যেন সেদিন খাঁচা খোলা পাখি। বেলা একটু পড়ে এলে আমরা খেতে বসলাম। যেন অমৃত খেলাম। রান্না যাই হোক, প্রতিদিনেব বাঁধাধরা জীবন থেকে এমন মুক্ত পরিবেশে সকলের সঙ্গে খাওয়া কী কম কথা! আমার মা খাওয়ার পর রবীন্দ্র সংগীত গাইল—"ওরে আমার মন মেতেছে, তারে আজ থামায় কে?" আমি আবৃত্তি করলাম। আমার বান্ধবী সুমিতা কী সুন্দরই না নাচল! দেখতে দেখতে বেলা গড়িয়ে সেই সন্ধ্যার কাছাকাছি, আমরা তখন নৌকা পার হয়ে বলাগড় স্টেশনে এলাম। ওখানেই আমাদের বাস দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা বাড়ি মুখো রওনা দিলাম। একটা বনভোজনের স্মৃতি আর সবুজ দ্বীপ মনের পাতায় চিরস্থায়ী হয়ে রইল।

একটি ভ্রমণের অভিজ্ঞতা

বেড়াতে যাবার কথা শুনলে সবার মন নেচে ওঠে। বাবা যেদিন বললেন এবার পুজোয় আমরা দিল্লি যাবো, সেদিন আমার আনন্দে নেচে উঠল মন। অবশেষে ২২ অক্টোবর যখন আমরা হাওড়া স্টেশন থেকে রাজধানী এক্সপ্রেসে চাপলাম তখন সত্যি সত্যিই মনে হল এবার দিল্লি যাচ্ছি। আমাদের পরিবারের সঙ্গে ছিল বাবার বন্ধুর একটি পরিবারও। রাতে আমি ট্রেনের জানালা দিয়ে কিছুই দেখতে পাইনি। দিনের বেলা পর্দা সরিয়ে কালো কাচের মধ্যে দিয়ে নতুন এক পৃথিবীকে দেখতে দেখতে চললাম। অবশেষে দিল্লি পৌঁছলাম। প্রথমে আমরা একটা হোটেলে উঠলাম। সেদিনকার মতো বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন দর্শনীয় স্থান দেখতে বেরোলাম। প্রথম দিন দেখলাম লালাকেল্লা, যন্তর মন্তর, জামা মসজিদ, কুতুবমিনার আরও কত কী। তারপর দিন গেলাম আগ্রার তাজমহল দেখতে। জীবনে এত সুন্দর জিনিস আর দেখিনি। শ্বেত পাথরের তৈরি এই সমাধি ক্ষেত্র পৃথিবীর সপ্তম আশ্চর্যের একটি। চাঁদের আলোয় নাকি তাজমহল আরও সুন্দর। পরের দিন আবার আমরা ফিরে এলাম দিল্লিতে। আরও অনেক আশ্চর্য স্থান দর্শন করলাম। এতদিন ইতিহাসে এসব জায়গার কথা পড়েছি। এবার নিজের চোখে তা দেখে নিলাম। দিল্লি আমাদের রাজধানী। এখানে ভারতের ইতিহাসের সিংহভাগ বর্তমান। ইতিহাসও

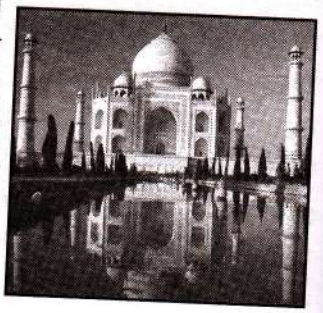

যে জীবন্ত হতে পারে তা এই প্রথম বুঝলাম। বড়ো হয়ে ভারতের আরও অনেক জায়গায় হয়ত ঘুরব, কিন্তু দিল্লি বেড়ানোর স্মৃতি কোনো দিন ম্লান হবে না।

ছৌ নৃত্য

আমাদের পশ্চিমবাংলার পুরুলিয়া অঞ্চলের ছৌ নৃত্য খুবই প্রসিদ্ধ। বসন্তকালে অর্থাৎ মার্চ-এপ্রিল মাসে এই ছৌ নৃত্য অনুষ্ঠিত হয়। ছৌ নাচের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এর মুখোশ। পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি অঞ্চলের বহু মানুষ এই মুখোশ বানায়। ছৌ নাচের মুখোশ মাটি দিয়ে তৈরি করা হয়। মাটি শুকিয়ে গেলে তার উপর প্রথমে কাগজ তারপর কাপড় লাগানো হয়। তারপর পালিশ করে ছুরি বা বাটালি দিয়ে মুখের বৈশিষ্ট্য খোদাই করা হয়। এই মুখোশে বিভিন্ন দেবদেবী, অসুর এবং পশুর মূর্তি বানানো হয়। চরিত্র বিশেষে মুখোশের বিভিন্ন রঙ হয়। যেমন — দুর্গা, লক্ষ্মী, ও কার্তিকের মুখোশের রঙ হয় হলুদ বা কমলা। তেমনি শিব, গনেশ ও সরস্বতীর রং সাদা, আবার কালীর কালো বা গাঢ় নীল। অসুরের মুখোশের রঙ কালো বা গাঢ় সবুজ। অসুরের বড়ো বড়ো চোখ, বেরিয়ে থাকা দাঁত ও মোটা কালো গোঁফ হল তার বৈশিষ্ট্য। মুখোশ রং করার পর সোনালি ও রুপোলি পালক দিয়ে সাজানো হয়। সব শেষে মুখোশের উপর এক ধরনের তেল মাখানো হয়। ছৌ নাচের বিষয় হল বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি, মহিষাসুর বধ, মহিরাবণ বধ, বকাসুর বধ, অভিমন্যু বধ প্রভৃতি প্রচলিত নাচের বিষয়। এই নাচের বিষয় বস্তু হল অশুভর পরাজয় ও শুভর জয়। এই ছৌ নাচের আরেকটি দিক হল, এই নাচে মেয়েরা কখনও অংশগ্রহণ করে না।

প্রবন্ধ

পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার

সূত্র ঃ ভূমিকা ।। পরিবেশ কাকে বলে।। পরিবেশ দূষণের কারণ।। কুফল ও প্রতিকার।। উপসংহার।

"নির্মল জল হাওয়া উর্বর মাটি,
এই নিয়ে পরিবেশ হয় পরিপাটি।"

ভূমিকা

মানব বিশ্বের এখন সবচেয়ে বড়ো সমস্যা হল পরিবেশ দূষণ। পৃথিবীর এমন কোনো দেশ নেই, যেখানে পরিবেশ নিয়ে মানুষ চিন্তিত নয়। কীভাবে ভবিষ্যতে আমরা বাঁচবো, পৃথিবী কীভাবে টিকে থাকবে — এই নিয়ে বিশ্বের পরিবেশবিদ্‌দের চিন্তার শেষ নেই।

পরিবেশ কাকে বলে

আমরা যেখানে বাসকরি তার চারপাশে যা কিছু আছে সব নিয়েই হল পরিবেশ। জল, বাতাস, মাটি, গাছপালা, মানুষ, পশুপক্ষী সবই পরিবেশের অন্তর্গত।

পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ গাছ কেটে ফেলা। সভ্যতার বয়স যত বেড়েছে মানুষ বসবাসের প্রয়োজনে অরণ্য ধ্বংস করতে বাধ্য হয়েছে। গাছ বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করে। সমগ্র জীবজগৎ শ্বাসকার্যের সময় অক্সিজেন নেয় এবং কার্বন ডাই অক্সাইড ছেড়ে দেয়। গাছই বাতাসের ভারসাম্য রক্ষা করে। তাছাড়া কয়লা, পেট্রল, ডিজেল ইত্যাদি পোড়ানোর ফলে বাতাসে কার্বনডাই

অক্সাইড বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরের নোংরা জলও আবর্জনা নদীর জলকে দূষিত করছে।

পরিবেশ দূষণের কারণ

জমিতে রাসায়নিক সার মাটিকে দূষিত করছে। আর বাজি, মাইক, ডিনামাইট, গাড়ির হর্ন ইত্যাদি হল শব্দদূষণের কারণ। বাতাসের কার্বন ডাই অক্সাইড বেড়ে যাওয়ার ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুর বরফ গলতে শুরু করেছে।

কুফল ও তার প্রতিকার

পরিবেশ দূষণের কুফল খুব ভয়াবহ। বর্তমানে যে নানা ধরনের রোগের প্রাদুর্ভাব লক্ষ করা যাচ্ছে , তা পরিবেশ দূষণেরই ফল। পৃথিবীতে বৃষ্টিপাত কমে যাচ্ছে। দুই মেরুর বরফ গলে গিয়ে সমুদ্র তীরবর্তী জনপদ জলমগ্ন হবে। পৃথিবীর জীব-জগৎ ধ্বংস হয়ে যাবে। বায়ু দূষণের ফলে মানুষের ফুসফুসের সংক্রমণ ও শ্বাসকষ্ট জনিত রোগ দেখা দিচ্ছে। ক্যান্সার পর্যন্ত হতে পারে। শব্দ দূষণের ফলে বহু মানুষ বধির হয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে পরিবেশ দূষণ রোধ করতে হবে। না হলে পৃথিবীর জীবকুলের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। দূষণ রোধ করতে হলে প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে হবে, কারখানার বর্জ্য পদার্থ মাটির গভীরে ফেলতে হবে এবং দূষিত জল বৈজ্ঞানিক প্রথায় দূষণ মুক্ত করতে হবে। মাটি দূষণ রোধ করতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমাতে হবে।

উপসংহার

পরিবেশ দূষণ রোধে মানুষকেই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। মানুষের ভুলের জন্যই পরিবেশ আজ বিপন্ন। সমাজের সকল স্তরের মানুষের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। ছাত্র-ছাত্রীদেরও এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। বৃক্ষরোপণ, আলোচনা সভা, প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধ্যমে জনমানসে পরিবেশ রক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরতে হবে।

কম্পিউটার

সূত্র ঃ ভূমিকা।। আবিষ্কার ও কার্যকারিতা।। আধুনিক জীবনে কম্পিউটার।। উপসংহার।

ভূমিকা

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলির মধ্যে কম্পিউটার অন্যতম। বলা যায় বর্তমান যুগটাই হল কম্পিউটারের যুগ। সরকারি ও বেসরকারি এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়নি। এমন কী বিদ্যালয়ের পাঠক্রমেও এখন কম্পিউটার আবশ্যিক হয়েছে।

আবিষ্কার ও কার্যকারিতা

১৮৩৪ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ গণিতবিদ্ চার্লস ব্যাবেজ প্রথম কম্পিউটার তৈরি করেন। পরবর্তীকালে তাকে অনুসরণ করেই আধুনিক কম্পিউটার তৈরি হয়েছে। চার্লস ব্যাবেজকে তাই 'কমপিউটারের জনক' বলা হয়। বিভিন্ন যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে কম্পিউটার গঠিত। এই যন্ত্রাংশ গুলি হল —মনিটর, কী-বোর্ড, মাউস, সিডিড্রাইভ , সি পি ইউ বা সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট, ক্যাবিনেট ইত্যাদি। অসংখ্য তথ্য এই যন্ত্রটি তার মেমোরিতে ধরে রাখতে পারে। কম্পিউটারের যেখানে যাবতীয় তথ্য সংরক্ষিত থাকে তাকে বলে হার্ডডিস্ক। কম্পিউটারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য যন্ত্রাংশ হল CPU (Central Processing Unit)। এটি কম্পিউটারের অভ্যন্তরীণ সকল যন্ত্রাংশের কার্য কলাপকে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনার ক্ষেত্রে মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। বর্তমানে ইন্টারনেট যুক্ত হওয়ার ফলে কম্পিউটারের কার্যপরিধি আরও বেড়েছে।

কম্পিউটার খুব অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কাজ করতে পারে। বহু হিসাব বা তথ্য সে ধরে রাখতে পারে। দেশ বিদেশের নানা সংবাদ এবং খবরাখবর ইন্টারনেটের মাধ্যমে এর সাহায্যে জানা যায়। রোগ নির্ণয়, আবহমন্ডলের গতিপ্রকৃতি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি কম্পিউটারের মাধ্যমে জানা যায়। বর্তমানে ভারতে কম্পিউটারের ব্যরহার ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রেই কম্পিউটারকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এভাবে ভারতের আজ সর্বত্র কম্পিউটারের ব্যবহার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

আধুনিক জীবনে কম্পিউটার

কম্পিউটার দেশের অগ্রগতির অন্যতম হাতিয়ার। তবে এর ব্যবহার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। দেখতে হবে ভারতের মতো বহুসংখ্যক বেকারের দেশে কম্পিউটার যেন মানুষের কাজকে কেড়ে না নেয়। তাই উপযুক্ত ক্ষেত্র ছাড়া কম্পিউটারের ব্যবহার যেন না হয়।

উপসংহার

দূরদর্শন

সূত্র ঃ ভূমিকা ।। আবিষ্কার ।। ভালোমন্দ ।। উপসংহার।।

'কত অজানারে জানাইলে তুমি, কত ঘরে দিলে ঠাঁই,
দূরকে করিলে নিকট বন্ধু, পরকে করিলে ভাই।'

সত্যিই দূরদর্শন আজ দূরকে করেছে নিকট আর পরকে করেছে আত্মার আত্মীয়। শুধু একটা বোতাম টিপলেই রঙিন পর্দায় সারা বিশ্ব এসে লুটোপুটি খায়। আগে ছিল বেতার বা রেডিও। তাতে শুধু শোনা যেত। আর দূরদর্শন এমনই এক বিস্ময়কর জিনিস যার সাহায্যে দেখা ও শোনা দুটোই হয়। আধুনিক যুগে দূরদর্শন হল শিক্ষা বিস্তারের সবচেয়ে জনপ্রিয় গণমাধ্যম।

ভূমিকা

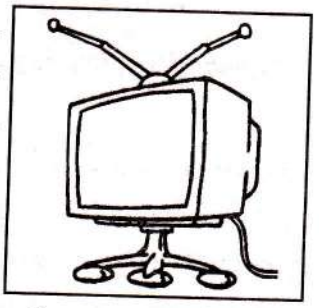

১৯২৬ সালে স্কটল্যান্ডের বিজ্ঞানী জন বেয়ার্ড লন্ডনের একটি বাড়ি থেকে অন্য একটি বাড়িতে জীবন্ত মানুষের চলন্ত ছবি পর্দার ওপর ফেলে দেখান। এর থেকেই দূরদর্শনের সৃষ্টি। তারপর ১৯৩০ সালে আনুষ্ঠানিক ভাবে দূরদর্শনের সম্প্রচার শুরু হয়। ভারতে দূরদর্শন চালু হয় ১৯৫৯ সালে দিল্লিতে। কলকাতায় চালু হয় ১৯৭৫ সাল থেকে।

আবিষ্কার

বিশ্বের যাবতীয় খবরাখবর আমরা প্রতিদিন ঘরে বসে দূরদর্শনের মাধ্যমেই দেখতে পাই। পৃথিবীর কোথায় কী ঘটছে বা ঘটবে তা দূরদর্শন আমাদের জানিয়ে দেয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, বিজ্ঞান গবেষণা, চিকিৎসা প্রভৃতির খবরাখবর আমরা দূরদর্শনের মাধ্যমে পাই। বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান আমাদের মনকে একঘেয়েমি থেকে মুক্তি দেয়। সিনেমা, নাটক ও নানা ধরণের তথ্যচিত্রের সাহায্যে আমরা নৈতিক শিক্ষা লাভ করি। নানা ধরনের সরকারি ঘোষণা ও বিজ্ঞপ্তি আমরা দূরদর্শন থেকে পাই। তবে অধিক দূরদর্শন- প্রীতি ছাত্র সমাজে বিরূপ প্রভাব ফেলে। এতে তাদের পড়াশুনার ক্ষতি হয়। দূরদর্শনের নেশা আজকাল ছাত্র-ছাত্রীদের বই পড়া থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তাই অনেকে আজকাল দূরদর্শনকে 'বোকাবাক্স' আখ্যা দিয়েছে।

ভালোমন্দ

দূরদর্শন জনশিক্ষা বিস্তারের সবচেয়ে শক্তিশালী গণমাধ্যম। এর পরিচালনার ক্ষেত্রে নজর দিতে হবে। শুধু ব্যবসায়িক স্বার্থকে বড়ো করে দেখলে চলবে না। দেশ ও দেশের মানুষের স্বার্থে দূরদর্শনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে হবে। শিশু-কিশোর মনে বিরূপ প্রভাব ফেলে এমন চিত্র প্রদর্শন বন্ধ করতে হবে।

উপসংহার

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান

সূত্র ঃ ভূমিকা।। দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহার।। সুফল।। সতর্কতা।। উপসংহার।।

আদিম অরণ্যবাসী মানুষ আকাশে বিদ্যুতের ঝলক দেখে চমকে উঠত। তারা জানত না আসলে ওই আগুনের ঝলকটি কী। তারপর যেদিন তারা পাথরে পাথরে ঘষাঘষি করে আগুন জ্বালাতে শিখল, সেদিনই তাদের বিজ্ঞান শুরু হল। বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশেষ জ্ঞান। এই বিশেষ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ অরণ্যের গুহা থেকে সভ্যতার আলোয় বেরিয়ে এল। বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই তো আজকের এই সুন্দর পৃথিবী মানুষের বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠেছে। শুধু দৈনন্দিন জীবন কেন? এখন আমরা বিজ্ঞান ছাড়া এক মুহূর্তও চলতে পারি না।

ভূমিকা

সকালে ঘুম থেকে উঠে এককাপ চায়ের সঙ্গে খবরের কাগজ পড়া থেকে সারাদিন যা কিছু আমর করি সবই বিজ্ঞানের সাহায্যে। চায়ের জল গরম করা উনুনটিও বিজ্ঞানের দান। খবরের কাগজ ছাপা হয় বিজ্ঞানের তৈরি মেশিনে। তারপর কাজের সন্ধানে আমরা বাসে, ট্রেনে, সাইকেলে, মোটর সাইকেলে এদিক ওদিক চলে যাই। এইগুলি সবই বিজ্ঞানের আবিষ্কার। প্রচন্ড গরমের ভয়! একটা সুইচ টিপলেই মাথার ওপর বন্‌বন্‌ করে ইলেকট্রিক পাখা ঘুরতে শুরু করে। নিমেষেই শরীর ঠান্ডা হয়ে যাবে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে জামা-কাপড় থেকে শুরু করে যা কিছু আমরা ব্যবহার করি সবই বিজ্ঞানের দান। এই যে দ্রুতগামী ট্রেন, এরোপ্লেন সবই তো আমাদের দিয়েছে বিজ্ঞান। যে মোবাইল ফোনে আমরা ঘরে বসে অন্যের সঙ্গে কথা বলছি, দূর বিদেশে বসবাসকারী বন্ধুকে ই-মেল করি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্যের অনুসন্ধান করি, তাও বিজ্ঞানের আশীর্বাদ। অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ, ব্যাঙ্ক, বিমা প্রভৃতি স্থানে কম্পিউটারের সাহায্যে প্রতিদিন কাজ চলছে। এই কম্পিউটার বিজ্ঞানের এক অভিনব আবিষ্কার। বলা যায় বিজ্ঞানের সাহায্যেই আমরা পৃথিবীকে হাতের মুঠোয় এনে ফেলেছি। বিজ্ঞান ছাড়া আমাদের জীবনযাত্রা একেবারেই অচল।

দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ব্যবহার

পূর্বে আমরা প্রকৃতির কাছে পরাধীন ছিলাম। নানা ধরনের প্রতিকূলতাকে আমরা দৈবদুর্বিপাক বলেই মনে করতাম। ফলে আমাদের মনে বাসা বেঁধেছিল কুসংস্কার। বিজ্ঞান যুক্তির কষ্ঠিপাথরে বিচার করে সব রহস্যের দ্বার উন্মোচন করেছে। আমাদের জীবনকেও আমরা খুব সহজ এবং সাবলীল করতে পেরেছি। বিজ্ঞানই আমাদের জীবনযুদ্ধে জয়ী হতে শিখিয়েছে।

সুফল

বিজ্ঞানকে মানব কল্যানেই ব্যবহার করতে হবে। ব্যক্তিস্বার্থে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ বন্ধ না করলে বিজ্ঞানই একদিন সভ্যতার অভিশাপ হয়ে দাঁড়াবে। এ ব্যাপারে আমাদের সজাগ থাকতে হবে।

সতর্কতা

পৃথিবী এগোচ্ছে। বিজ্ঞানই তাকে দিয়েছে বেগ। সেই বেগেই আমরা গতিশীল। এখনও অনেক বাধা আমাদের সম্মুখে। বিজ্ঞানের সাহায্যেই সেই বাধাকে অতিক্রম করতে হবে। তাহলে আমাদের জীবন আরও সহজ ও সাবলীল হয়ে উঠবে।

উপসংহার

বনমহোৎসব বা গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও

সূত্র — ভূমিকা।। বনমহোৎসব কী।। গাছের অবদান।। উপসংহার।।

"বন্ধু যখন গাছ
মুক্ত বাতাস টেনেই বাঁচো
ভাবনা কী সাত পাঁচ।"

পৃথিবীর জীবকুলের মধ্যে প্রথম আগন্তুক হল উদ্ভিদ বা গাছ। এই গাছই মানুষকে প্রথম মুখে তুলে দিয়েছিল খাদ্য, মাথার ওপর একটু আশ্রয় আর পরিধানের বস্ত্র। এই গাছ না থাকলে পৃথিবীর কোনো মানুষ বা জীবজন্তু বাঁচতে পারত না।

ভূমিকা

গাছকে নিয়ে যে মহান উৎসব তাই হল বনমহোৎসব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতনে প্রতি বছর বৃক্ষরোপণ উৎসব পালন করতেন। সেই উৎসব বনমহোৎসব নামে পরিচিত। এই উৎসবের প্রকৃত উদ্দেশ্য হল গাছের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনচেতনা জাগরণ। এই ধরিত্রী যে এত 'সুন্দর কুসুমিতা মনোহরা', তার কারণই তো হল গাছ।

বনমহোৎসব কী?

গাছ বায়ুমন্ডলের ভারসাম্য রক্ষা করে। সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে কলকারখানা এবং ডিজেল ও পেট্রল চালিত গাড়ি। ফলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ দিনদিন বেড়েই চলেছে। গাছ দিনের বেলায় খাদ্য তৈরির সময় বাতাসের কার্বন-ডাই অক্সাইড গ্যাস শোষণ করে নেয়। পরিবর্তে প্রচুর পরিমান অক্সিজেন বাতাসে ত্যাগ করে। যার সাহায্যে আমরা নিঃশ্বাস নিতে পারি। গাছ বৃষ্টিপাত ঘটায় এবং ভূমিক্ষয় রোধ করে। গাছ আমাদের প্রাণীজগৎকে খাদ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে। এই যে আমাদের ঘরে এত দামি দামি আসবাবপত্র, পরিধানে ঝকঝকে পোষাক, সবই তো গাছের দান।

গাছের অবদান

সারা পৃথিবীতে ৮ জুন তারিখকে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসের শপথ হল দূষণ মুক্ত পৃথিবীর জন্য গাছ লাগানো এবং গাছকে বাঁচিয়ে রাখা। গাছ না বাঁচলে মানুষ ও জীবজন্তুর কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। তাই আমাদেরও শপথ হোক : **'গাছ লাগাও, প্রাণ বাঁচাও।'**

উপসংহার

চরিত্র গঠনে খেলাধুলার ভূমিকা

সূত্র — ভূমিকা।। দেহমনের গঠনে খেলাধুলা।। চরিত্রগঠনে খেলাধুলা।। উপসংহার।।

'খেলা মোদের বাঁচামরা
খেলা মোদের লড়াই করা
খেলা ছাড়া কোথাও কিছু নেই।'—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

মানবসভ্যতার ঊষালগ্ন থেকেই মানুষ আমোদ-প্রমোদের জন্য খেলাকে গুরুত্ব দিয়ে আসছে। তবে খেলা মানে তো নিছকই আমোদ-প্রমোদ নয়। দেহকে সুস্থও সবল রাখতে খেলাধুলা যে একান্ত অপরিহার্য তা মানুষ উপলব্ধি করতে পেরেছে। কারণ— 'All works and no play makes Jack a dull boy.'

দেহমনের গঠন ও খেলাধুলা

দেহ ও মন — এই দুটো জিনিসই মানুষকে চালিত করে। দেহকে রোগমুক্ত সবল করে গড়ে তুলতে না পারলে মনও দুর্বল হয়ে পড়ে। দৈহিক শক্তিই মনের শক্তির উৎস। খেলাধুলা দেহকে সুগঠিত ও শক্তিশালী করে। নিয়মিত ব্যায়াম বা শরীরচর্চার মাধ্যমেই দেহ সুস্থ থাকে। তাছাড়া দৌড়, ঝাঁপ, ফুটবল, ক্রিকেট, হাডুডু, কবাডি, খো খো ইত্যাদি যে সব খেলা আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, সেগুলোর দ্বারাও দেহ সবল হয়। সবল সুস্থ দেহ উন্নত মনের জন্ম দেয়।

চরিত্রগঠনে খেলাধুলা

খেলাধুলার মাধ্যমে একটা ভালো মন তৈরি হয়। ভালো মনের মানুষরাই চরিত্রবান হয়। খেলাধুলার মাধ্যমে পরস্পরের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। ফলে সমাজে শান্তি ও সাম্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকের সঙ্গে থাকার ফলে যৌথ জীবনের সুবিধাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তাই বিবেকানন্দও বলেছেন,— "গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলা ভালো।"

উপসংহার

বর্তমানে খেলাধুলাকে শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসাবে ধরা হয়েছে। বিদ্যালয়ে খেলাধুলাকে আবশ্যিক করা হয়েছে। ছাত্রজীবন হল জীবনের বীজ বপনের সময়। খেলাধুলার মাধ্যমে দেহ, মন ও চরিত্র সুগঠিত হলেই একজন ছাত্র আগামী দিনে সুনাগরিক হয়ে উঠতে পারবে।

শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে দেশভ্রমণ

সূত্র ঃ ভূমিকা ।। প্রচীনকালে দেশভ্রমণ।। বর্তমানে দেশভ্রমণ।। ভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ।। উপসংহার।।

ভূমিকা

"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি' — এই কৌতূহল মানুষের চিরদিনের। তাই সময় পেলেই মানুষ বেরিয়ে পড়ে 'হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা'। বর্তমান যুগে দেশভ্রমণ হল শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।

অতি প্রাচীনকালে মানুষের কাছে দেশভ্রমণ ছিল খুব কষ্টকর। পায়ে হেঁটে বা জলপথে তখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হত। কারণ তখন রাস্তাঘাট, যানবাহন আবিষ্কৃত হয়নি। সুদূর গ্রিস দেশ থেকে ভারতে

এসেছিলেন মেগাস্থেনিস, চিন দেশে থেকে ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ, আফ্রিকা থেকে ইবনবতুতা। পোর্তুগাল থেকে এসেছিলেন ভাস্কো-ডা- গামা। এঁরা তৎকালীন ভারত সম্পর্কে বহু মূল্যবান লেখা আমাদের উপহার দিয়েছেন।

প্রাচীনকালে দেশভ্রমণ

বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে বর্তমানে বহু দ্রুতগামী যানবাহন আবিষ্কৃত হয়েছে। আকাশ পথে আছে এরোপ্লেন। ফলে এখন হাজার হাজার মাইল পথ মানুষ মাত্র কয়েক ঘন্টায় অতিক্রম করতে পারছে। পৃথিবীকে চেনা ও জানার নেশায় এখন মানুষ দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বাঙালিরা দুর্গাপুজো এবং শীতের মরশুমে দেশভ্রমণে বেশ উৎসাহী হয়ে উঠেছে। আমাদের রাজ্যে অনেক ভ্রমণ সংস্থা গড়ে উঠেছে। এই সংস্থাগুলির মাধ্যমে মানুষ দেশভ্রমণকে সহজ করে নিতে পেরেছে।

বর্তমানে দেশভ্রমণ

শুধু পুঁথিগত বিদ্যা শিক্ষার পূর্ণতা হতে পারে না। প্রত্যক্ষ দর্শনে যে অভিজ্ঞতা হয় তার একটা আলাদা মূল্য আছে। প্রাত্যহিক জীবনে একঘেয়েমি মানুষের জীবনে জড়তা আনে। দেশভ্রমণে মানুষের মনের ভার অনেকটা লঘু হয়। দেশে দেশে কত না মানুষ, কত না তাদের জীবনযাপনের পদ্ধতি। দেশভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন সংস্কৃতির সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটে এবং সংহতি তৈরি হয়। মানুষে মানুষে সৌভ্রাতৃত্ব গড়ে ওঠে।

ভ্রমণ শিক্ষার অঙ্গ

বর্তমানে ভ্রমণকে শিক্ষার অঙ্গ হিসাবে দেখা হয়। প্রতি বছর স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এই জন্য সরকারি তহবিল থেকে আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা আছে। বহুমুখী পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা লাভ করতে হলে দেশভ্রমণ আব্যশ্যিক।

উপসংহার

তোমার দেখা একটি মেলা

সূত্র ঃ ভূমিকা।। মেলার বর্ণনা।। অভিজ্ঞতা।। উপসংহার।।

মেলা শব্দের অর্থ হল মিলন। যেখানে বিশেষ কোনো উপলক্ষে অনেক মানুষ সমবেত হয় তাকে মেলা বলে। এই রকমই একটি মেলায় আমি কিছুক্ষণ থাকার সৌভাগ্য লাভ করেছিলাম। মেলাটি ছিল শান্তিনিকেতনের পৌষমেলা।

ভূমিকা

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ প্রতি বছর ৭ পৌষ শান্তিনিকেতনে মেলা বসাতেন। সেই ঐতিহ্য মেনে আজও পৌষ মেলা অনুষ্ঠিত হয় মহাসমারোহে। আমি গত বছর সেখানে গিয়েছিলাম বাবা-মায়ের সাথে। মেলা প্রাঙ্গণটি ছিল বেশ বড়ো। আশ্রমের পূর্বদিকের বিরাট মাঠে এই মেলা বসেছিল। একদিকে সরকারি মঞ্চ এবং সেখানে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছিল। আমরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে বাউলগান এবং নৃত্যানুষ্ঠান দেখেছিলাম। সবচেয়ে অবাক হয়েছিলাম হস্তশিল্পের নানা জিনিস দেখে। বাঁশ, বেত ও কাঠের চোখ ধাঁধানো জিনিসপত্র দেখে অবাক হয়ে গেলাম। মেলার মাঠের মাঝখানে বসেছে মনোহারী দোকান। মাঠের দক্ষিণ প্রান্তে শীতবস্ত্রের বিপুল সমারোহ। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ এখানে পসরা সাজিয়ে বসেছে। ছোটোদের নাগরদোলা, টয়ট্রেন, মিকিমাউস ইত্যাদি আরও কত মজার জিনিস বসেছে একধারে। মাঠের পশ্চিমদিক জুড়ে খাবারের দোকান। আমরা ঘর সাজানোর অনেক কিছু কিনলাম। তারপর হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

মেলার বর্ণনা

মেলা দেখার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম নয়। তথাপি শান্তিনিকেতনের পৌষমেলার আকর্ষণ ও গুরুত্ব আলাদা।

অভিজ্ঞতা

এমন সুন্দর, সুশৃঙ্খল পরিবেশের মেলা আর কোথাও দেখিনি। দেখিনি হস্তশিল্পের এমন সম্ভার। লোকশিল্প যে এখনও এত সমাদৃত তা এখানে না এলে বোঝা যেত না।

আমরা পরের দিন কলকাতার ফিরে এসেছিলাম। একটা স্মরণীয় স্মৃতি আজও অক্ষয় হয়ে আছে আমার মনে।

উপসংহার

আজও সেদিনের কথা মনে হলে কপালে হাত ঠেকিয়ে রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে প্রণাম করি।

আমার প্রিয় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রবন্ধ সংকেত ঃ ভূমিকা।। জন্ম ও বংস পরিচয় ও শিক্ষা।। কাব্যসাধনা।। কেন আমার প্রিয় ।। উপসংহার।।

"শুধু কবিতার জন্য এই জীবন .....
শুধু কবিতার জন্য আমি-অমরত্ব তুচ্ছ করেছি।"

- সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ভূমিকা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় আমার প্রিয় কবি। তাঁর লেখা আমার কাছে ম্যাজিকের মতো। আমি তো বড়োদের কবিতা বুঝতে পারিনা। এ কথা ভেবেই হয়ত তিনি আমাদের মতো ছোটোদের জন্য কত কবিতা, গল্প, গোয়েন্দা কাহিনিই না লিখে গেছেন। তিনি আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু তার লিখে যাওয়া রচনা সম্ভার চির অক্ষয় হয়ে আছে আমাদের মনে।

জন্ম, বংশপরিচয় ও শিক্ষা

১৯৩৪ সালের ৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব বঙ্গের ফরিদপুর জেলায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কালীপদ গঙ্গোপাধ্যায় এবং মাতার নাম মীরা গঙ্গোপাধ্যায়। ফরিদপুরে প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হলেও খুব ছোটোবেলায় সুনীল কলকাতায় চলে আসেন। ভর্তি হন টাউন স্কুলে। তারপর সুরেন্দ্রনাথ, দমদম মতিঝিল এবং সিটি কলেজে পড়াশুনা করেন। ১৯৫৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ. পাশ করেন।

কাব্যসাধনা

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কবিতা 'একটি চিঠি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫১ সালে 'দেশ' পত্রিকায়। এরপর আর তিনি থেমে থাকেন নি। তাঁর উল্লেখযোগ্য কবিতার বই - 'সুন্দরের মন খারাপ', 'হঠাৎ নীরার জন্য', 'একা এবং কয়েকজন', 'মনে পড়ে সেই দিন', 'নীরা, হারিয়ে যেও না', 'স্মৃতির শহর' ইত্যাদি।

আমি পড়েছি তাঁর অজস্র ছড়া এবং গল্প। পড়েছি 'কাকাবাবু সমগ্র'। তাঁর ছড়ার বই 'মনে পড়ে সেই দিন' আমার মনে গভীর দাগ কেটেছে। তাঁর ছড়ার মধ্যে যেন একটা গল্প থাকে। চোখের সামনে ভেসে ওঠে ছবি। একবার পড়লে বহুদিন মনে থাকে।

উপসংহার

২০১২ সালের ২৩ অক্টোবর সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যু ছিল অনেকটাই আকস্মিক। দেশে এবং বিদেশে তাঁর মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই মানুষ শোকে বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। আমরা দূরদর্শনে তাঁর শেষ যাত্রা দেখেছিলাম। বাংলা সাহিত্যকে স্বর্ণযুগের দ্বারে পৌঁছে দিয়ে তিনি চলে গেলেন দিকশূন্যপুরে।

সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা

সূত্র ঃ ভূমিকা।। সংবাদপত্রের ইতিহাস।। সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা।। উপসংহার।

ভূমিকা

সংবাদপত্র যুগের দর্পণ। প্রতিদিন সকালবেলায় সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বুলিয়ে না নিলে দিন শুরু হয়েছে বলে মনেই হয় না। সংবাদপত্রে আমরা পেয়ে যাই দেশ-বিদেশের নানা খবরাখবর। গতকাল কী ঘটল আগামীকাল কী ঘটতে পারে তার সব তথ্য আমাদের সামনে ভেসে ওঠে।

সংবাদপত্রের ইতিহাস

চিন দেশে প্রথম কাগজ আবিষ্কৃত হয়। তাই মনে করা হয় চিন দেশেই প্রথম সংবাদপত্র চালু হয়। তবে ইউরোপের নবজাগরণের সময় ইতালিতেও সংবাদপত্র প্রথম আত্মপ্রকাশ করে বলে অনেকের ধারনা। আমাদের দেশে ঊনবিংশ শতকে সংবাদপত্র চালু হয়। বেঙ্গল গেজেট, সমাচার চন্দ্রিকা, সমাচার দর্পণ, সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি হল আমাদের দেশে প্রাচীন সংবাদপত্র।

সংবাদপত্র পাঠের প্রয়োজনীয়তা

প্রতিদিন আমাদের এই পৃথিবীতে কতই না ঘঠনা ঘটছে। তা আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জানতে পারি। দেশ-বিদেশের নানা সংবাদ পাঠ করে আমরা আধুনিক বিশ্ব সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান লাভ করতে পারি। শিক্ষা, বিজ্ঞান, কৃষি, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয় গুলি যেমন জানতে পারি, তেমনি জানতে পারি বিভিন্ন দেশের রাজনীতির গতি-প্রকৃতি। সংবাদপত্রের মাধ্যমে সরকারি নির্দেশনামা প্রকাশিত হয়। বন্যা, ঝড়, সুনামি ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্যয়গুলির জন্য আগাম সতর্কতা জারি হয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে। তাতে আমরা পূর্ব থেকে সাবধান হতে পারি। সংবাদ পরিবেশন করা সংবাদপত্রের প্রধান কাজ। সংবাদ পরিবেশনের পাশাপাশি সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, সাহিত্য শিল্প, বাণিজ্য, রাজনীতি এবং অর্থনীতি সমন্ধীয় বিভিন্ন আলোচনা আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে বাড়িয়ে তোলে। এসব ছাড়াও চাকরির খবর, দুর্ঘটনার সংবাদ, বাজার দর এবং দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রয়োজনীয় সব ধরনের সংবাদই প্রকাশিত হয় সংবাদপত্রে। গণতন্ত্রের ভিত শক্তিশালী করতে সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। কেননা, জনমত গঠনে সংবাদপত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্র ছাড়া আধুনিক জীবন অচল।

উপসংহার

পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সংবাদপত্র লোকশিক্ষার ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দেশ কোন্ পথে চলছে তা সংবাদপত্রের পাঠকরাই ভালোভাবে বুঝতে পারেন। আবার যারা নিরক্ষর তারা অন্যের কাছ থেকে শুনেও দেশের খবরাখবর সম্পর্কে অবহিত হতে পারে। তাই সংবাদপত্র হল সংশ্লিষ্ট দেশের আয়না।

রিও অলিম্পিক—২০১৬

সূত্র ঃ ভূমিকা।। অলিম্পিকের ইতিহাস।। রিও অলিম্পিক-২০১৬।। উপসংহার।।

'উৎসাহেতে জ্বালিয়া উঠি
দুহাতে দাও তালি,
আমরা বড়ো এ যে না বলে
তাহারে দাও গালি।'

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূমিকা

বিশ্বের দরবারে নিজের দেশকে শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের অন্যতম ক্ষেত্র হল অলিম্পিক ক্রীড়াক্ষেত্র। বিচিত্রধর্মী খেলাধুলার এতবড়ো প্রতিযোগিতা বিশ্বে আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রতি চার বছর অন্তর বিভিন্ন দেশে এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিযোগিতা চলাকালীন বিশ্ববাসীর উত্তেজনা ও কৌতূহলের সীমা থাকে না। ক্রীড়াপ্রেমী মানুষের কাছে প্রতিযোগিতা চলাকালীন দিনগুলি হল উৎসবের দিনের মতো। নিজের দেশ হোক, আর অন্য দেশ হোক—খেলাপ্রিয় মানুষ এই সময় অন্য এক আনন্দের জগতে বিচরণ করে। বলা যায় অলিম্পিক প্রতিযোগিতা হল বিশ্বভ্রাতৃত্ব বন্ধনের সেরা ক্ষেত্র।

অলিম্পিকের ইতিহাস

খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ অব্দে প্রাচীন গ্রিসে অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা হয়। স্থানটির নাম অলিম্পিয়া অনুসারে প্রতিযোগিতার নাম হয় অলিম্পিক। তারপর গ্রিস রোম সাম্রাজ্যের অধীনে আসার পর ৩৯২ খ্রিস্টাব্দে রোম সম্রাট থিয়োডোসিউস আইন জারি করে অলিম্পিক নিষিদ্ধ করেন। আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগে অলিম্পিয়ার ক্রীড়াঙ্গনটিও বিলীন হয়ে যায় মৃত্তিকাগর্ভে। তারপর কেটে গেছে বহু বছর। অবশেষে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে ৬ এপ্রিল ফরাসী শিক্ষাবিদ্ পিয়ের ডি. কুবার্তিনের প্রচেষ্টায় নবপর্যায়ে আধুনিক অলিম্পিকের সূচনা হয়। সেই থেকে প্রতি চার বছর অন্তর এই প্রতিযোগিতা চলে আসছে। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণে অলিম্পিকের ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ে। তারপর আবার যাত্রা শুরু হয় তার। সেই অনুসারে ২০১৬ সালের রিও অলিম্পিক ছিল ৩১তম প্রতিযোগিতা।

রিও অলিম্পিক-২০১৬

রিও অলিম্পিকের সূচনা হয় ৬ আগস্ট। ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়ামে ৮০ হাজার দর্শকের সামনে উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানটি ছিল বড়োই দৃষ্টিনন্দন। তারপর পনেরো দিন ধরে শহরের বিভিন্ন স্টেডিয়ামে প্রতিযোগিতাগুলি অনুষ্ঠিত হয়। এবারের অলিম্পিকে ছিল ২৮টি খেলা এবং ৩০৬টি ইভেন্ট। প্রায় ২০৬টি দেশের ১০,৫০০ খেলোয়াড় এবারের অলিম্পিকে অংশগ্রহন করেছিল এবং তাদের মধ্যে কিছু খেলোয়াড় কিছু বিষয়ে নজরকাড়া সাফল্য দেখিয়েছে। প্রত্যাশা মতো এবারও ১২০টি পদক পেয়ে শীর্ষে থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তারা পেয়েছিল ৪৫টি সোনা, ৩৭টি রুপো এবং ৩৮টি ব্রোঞ্জ। দ্বিতীয় স্থানে ছিল বিট্রেন। তাদের পদক প্রাপ্তির তালিকা : সোনা ২৭টি, রুপো ২৩টি এবং ব্রোঞ্জ ১৭টি। চিন ৭০টি পদক পেয়ে তৃতীয় এবং ৫৬টি পদক পেয়ে রাশিয়া চতুর্থ স্থানে ছিল। ভারতকে মাত্র ২টি পদক পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে

হয়েছিল। পি.ভি. সিন্ধু ব্যাডমিন্টনে রুপো এবং সাক্ষি মালিক কুস্তিতে ব্রোঞ্জ জিতে ভারতের সম্মান রক্ষা করেছিলেন।

উপসংহার

বিশ্বের মানুষের সবচেয়ে বড়ো মিলনক্ষেত্র হল অলিম্পিকের ময়দান। এখানে মানুষ দেশকালের ঊর্ধ্বে উঠে এক অনাবিল আনন্দে একাকার হয়ে যায়। আদান প্রদান ঘটে সংস্কৃতির। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধের বিষয়টিও হয় মজবুত। তাছাড়া সাফল্যের শীর্ষে থাকা দেশগুলির ক্রীড়াকৌশল অন্যান্য দেশের খেলোয়াড়দের কাছে অনুকরণীয় হয়ে ওঠে। আন্তর্জার্তিক সম্পর্কের ক্ষেত্রটি দৃঢ় হয় অলিম্পিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে। ২০২০ সালে ৩২তম অলিম্পিকের আসর বসবে জাপানের টোকিওতে।

তোমার দেখা একটি খেলা

সূত্র ঃ ভূমিকা ।। খেলার সূচনা ।। ফলাফল ।। উপসংহার।।

ভূমিকা

সরাসরি মাঠে বসে খেলা দেখার অভিজ্ঞতা আমার নেই। তবে দূরদর্শনের পর্দায় বহু গুরুত্বপূর্ণ খেলা আমি দেখেছি। দেখেছি বিশ্বকাপ ফুটবল ও ক্রিকেটের বহু উত্তেজনাপূর্ণ খেলা। তবে ২০১৭ সালের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা আমার মনে গভীরভাবে দাগ কেটে রেখেছে। আরও দুঃখের কথা যে, এই খেলায় ভারত ফাইনালে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় পাকিস্তানের কাছে। স্বপ্নভঙ্গের বেদনার জন্যই হয়তো খেলাটির কথা কোনো দিন ভুলতে পারব না।

খেলার সূচনা

টসে জিতে ভারত অধিনায়ক বিরাট কোহলি ফিল্ডিং-এর সিদ্ধান্ত নেন। সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাকিস্তান ব্যাট করতে নামে। সকলেই আশা করেছিল এই সিদ্ধান্ত ইতিবাচক। কারণ, ভারতীয় বোলাররা পাকিস্তানী ব্যাটস্‌ম্যানদের চেপে ধরবেন। তারপর সেই রান তাড়া করে প্রত্যাশিত জয় ছিনিয়ে নেবেন। এই আশাতেই ভারতীয় ক্রিকেটাররা ফিল্ডিং সাজায় এবং খেলা শুরু হয়।

ফলাফল

শুরু থেকেই পাকিস্তানের খেলোয়াড়রা মাথা ঠাণ্ডা রেখে ব্যাট করতে থাকেন। মাত্র চার উইকেট হারিয়ে নির্ধারিত ৫০ ওভারে তাঁরা ৩৩৮ রান করেন। এই বিরাট রানের বোঝা নিয়ে ভারত খেলতে নামে। তবে অতীতে এই ধরণের রান তাড়া করে ভারত বহুবার জিতেছে। তাছাড়া ভারতীয় খেলোয়াড়দের ব্যাটিং দক্ষতার কাছে ৩৩৮ রান তেমন কিছু বেশি ছিলনা। কিন্তু আশা ভঙ্গ হল শুরুতেই। প্রথম দুই ওভারেই রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি আউট হয়ে যান। তবু ভারতবাসী হাল ছাড়েনি। সবাই ভেবেছিল শিখর ধাওয়ান, যুবরাজ, ধোনিরা হাল ধরবেন। কিন্তু এঁরা কেউ দাঁড়াতে পারেন নি। মাত্র ১৫৮ রানে ভারতের সবাই আউট হয়ে যান। এমন শোচনীয় পরাজয় একশো তিরিশ কোটি ভারতবাসীর মনে চরম হতাশা ও বেদনার সঞ্চার করেছিল। আমিও সেদিন খুব দুঃখ পেয়েছিলাম। এমন বেদনাদায়ক খেলা আমি কখনও দেখিনি।

খেলায় হারজিত থাকবেই। একদল জিতবে, আর একদল হারবে—এটাই হল খেলার স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো গুরুত্বপূর্ণ খেলায় ভারতের এমন শোচনীয় হার মেনে নেওয়া খুব কঠিন। খেলা হল দক্ষতা এবং কৌশলের লড়াই। বাঘে বাঘে লড়াই হলেই তো আসল লড়াইটা জমে ওঠে। কিন্তু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির ফাইনাল খেলা দেখে মনে হল সবলের সঙ্গে দুর্বলের লড়াই চলছে। এমন একপেশে খেলা আমি কখনও দেখিনি। শেষ পর্যন্ত খেলা দেখার নেশাটাই একেবারে মাটি হয়ে গিয়েছিল। এমন মর্মান্তিক আশাভঙ্গ হবে কখনই ভাবিনি। কারণ ভারত এই মুহূর্তে বিশ্বের অন্যতম সেরা দল। সেই কারণেই আমাদের আশাও ছিল গগনচুম্বী।

উপসংহার

প্রকৃতির রুদ্ররোষে কেদার-বদ্রী

প্রবন্ধ সংকেত ঃ ভূমিকা ।। কেদার-বদ্রীর পৌরাণিক পরিচয় ।। বিপর্যয়ের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি ।। উপসংহার।।

'তোমার ভ্রুকুটিভঙ্গে তরঙ্গিল আসন্ন উৎপাৎ,
নামিল আঘাত।
পাঁজর উঠিল কেঁপে,
বক্ষে হাত চেপে
শুধালেম, 'আরো কিছু আছে নাকি---
আছে বাকি
শেষ বজ্রপাত?

--- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

প্রকৃতি বড়ো রহস্যময়ী। কখনও সে শান্তমূর্তি স্নেহময়ী জননী। আবার কখনও উগ্রচন্ডা ভয়ংকরী রাক্ষসী। সে ক্ষেপে উঠলে মানুষ বড়ো অসহায় হয়ে ওঠে। থমকে দাঁড়ায় বিজ্ঞানের জয়রথ। যূপবদ্ধ ছাগশিশুর মতো আমরা কাঁপতে থাকি আর আসন্ন মৃতুর জন্য গুনতে থাকি প্রহর। গত ১৬ জুন, ২০১৩ উত্তরাখন্ডের কেদার-বদ্রী, গঙ্গোত্রীতে ঘটে গেল যে প্রাকৃতিক বিপর্যয় তা ভারতের ইতিহাসে ভয়ংকরতম ঘটনা। একজন সংবেদনশীল সুস্থ মানুষের পক্ষে তার বর্ণনা দেওয়াটাও বড়ো কঠিন ব্যাপার।

ভূমিকা

সত্যযুগে ভগবান নারায়ণ স্বয়ং 'কেদার' ও 'বদ্রী' — এই দুই রূপে সাধনা করেন। তাঁদের নাম ছিল 'নর' ও 'নারায়ণ' ঋষি। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হলে গোত্র-হত্যার পাপ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য ব্যাসদের যুধিষ্ঠিরসহ পান্ডবদের কেদার তীর্থে যাওয়ার উপদেশ দিয়েছিলেন। অভিমন্যু-পুত্র পরীক্ষিৎকে রাজ্যপাট অর্পন করে দ্রৌপদীকে নিয়ে পঞ্চপান্ডব এই কেদারনাথে এসে

কেদার-বদ্রীর পৌরাণিক পরিচয়

শিববন্দনা করেন। সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা এই কেদারনাথে এসে তপস্যা করেন। শুধু তাই নয় হিন্দুধর্মের গুরু শঙ্করাচার্যের সমাধিক্ষেত্র এখানে হওয়ার দরুন অতি প্রাচীনকাল থেকেই এই অঞ্চলটি হিন্দুদের অন্যতম পরিত্র তীর্থস্থান। কেদার-বদ্রীর সঙ্গে আরও কিছু স্থান পৌরাণিক ঐতিহ্যে দেবভূমিতে পরিণত হয়েছে। এগুলি হল - হৃষীকেশ, দেবপ্রয়াগ, রুদ্রপ্রয়াগ, গুপ্তকাশী, কর্ণপ্রয়াগ, শোণপ্রয়াগ, উখীমঠ, গৌরীকুন্ড প্রভৃতি। সমগ্র অঞ্চলটিই পর্বতবেষ্টিত।

বিপর্যয়ের কারণ ও ক্ষয়ক্ষতি

১৬ এবং ১৭ জুন উত্তরাখন্ডে প্রবল বৃষ্টিপাত হয়। আবহাওয়া দপ্তরের খবর অনুযায়ী এই দু'দিন মন্দাকিনী, ভাগীরথী ও অলকানন্দা অববাহিকায় ৩৮০ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছিল। এই বিপুল পরিমাণ জলরাশি সংকীর্ণ নদী বেয়ে নীচের দিকে নামতে থাকে। তার গতিবেগ এতই তীব্র ছিল যে, বড়ো বড়ো পাথরের চাঁই পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসতে থাকে। ভেঙে যায় জলাধার। ফলে ভূমিকম্পের মতো বিকট শব্দে যেন বড়ো বড়ো পাহাড় হিংস্র দানবের মতো সব কিছু চুরমার করতে করতে নীচের দিকে পড়তে থাকে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে সমগ্র কেদার-বদ্রী ধ্বংস স্তূপে পরিণত হয়। অলকানন্দা আর মন্দাকিনীর জলে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে বড়ো বড়ো ঘরবাড়ি, হোটেল, মঠ-মন্দির। মানুষের চোখের সামনে ভেসে যায় যাত্রীবোঝাই বাস, গাড়ি। হাজার হাজার মানুষ অসহায়ের মতো মৃত্যুকে বরণ করে নিতে বাধ্য হল। আশ্রয়হীন হয়ে পড়ল আরও বহু মানুষ। স্থানগুলি এত দুর্গম যে, উদ্ধার কার্য চালানো বড়োই কঠিন হয়ে পড়েছিল। খাদ্য ও পানীয় জলের অভাবেও বহু মানুষের মৃত্যু হয়। শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টার করে উদ্ধারের কাজ চালানো হয়।

উপসংহার

পুরাণ প্রসিদ্ধ ভারতের দেবভূমি নামে পরিচিত উত্তরাখন্ডের কেদার-বদ্রী আজ নিশ্চিহ্ন। নিশ্চিহ্ন ধর্মগুরু শঙ্করাচার্যের সমাধি। সমগ্র ভূ-খন্ডটিই এক ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। রাস্তাঘাট, হোটেল, রেঁস্তরা, মঠ-মন্দির সব কিছুই এখন মন্দাকিনীর গর্ভে। হাহুতাশ করা ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই। কারণ প্রকৃতি রুষ্ট হলে মানুষের কীই বা করার থাকে। শুধু দু'চোখ দিয়ে মৃত্যুর মিছিল দেখা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না।

পঞ্চম শ্রেণির উপযোগী কিছু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাকরণগত প্রশ্নের সমাধান

সেট — ১

১। **এলোমেলো বর্ণগুলোকে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো ঃ**
থারূকপ, রত্তুজরাপু, জক্ষীরাপ, পবমনন, জগুবিআ।
উত্তর ঃ রূপকথা, রাজপুত্তুর, পক্ষীরাজ, মনপবন, আজগুবি।

২। **'ডাকছে রে' আর 'ডাক ছেড়ে' শব্দজোড়ার মধ্যে কী পার্থক্য তা দুটি বাক্যরচনার মাধ্যমে বুঝিয়ে দাও ঃ**
উত্তর ঃ ডাকছে রে ঃ আমাকে কে যেন ডাকছে রে। (আহ্বান করা)
ডাক ছেড়ে ঃ ডাক ছেড়ে তুমি কী বলতে চাইছো? (উচ্চ স্বরে)

৩। **নীচের শব্দগুলো বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে লেখো ঃ**
উত্তর ঃ উত্তুরে, থুত্থুড়ে, তল্পি, ঝোলা, জলদি, আজগুবি, সত্বর, শীত, রাজপুত্তুর, কারখানা।

বিশেষ্য	বিশেষণ
তল্পি	উত্তুরে
ঝোলা	থুত্থুড়ে
শীত	জলদি
রাজপুত্তুর	আজগুবি
কারখানা	সত্বর

৪। **'ক্ষ' দিয়ে ৫টি শব্দ তৈরি করো ঃ**
উত্তর ঃ রাক্ষস, যক্ষ, রুক্ষ, লক্ষ, দক্ষ।

৫। **ক্রিয়ার নীচে দাগ দাও ঃ**
(ক) **বইছে** হাওয়া উত্তুরে (খ) ডাক ছেড়ে সে **ডাকছে** রে (গ) **আয়রে** ছুটে ছোট্টরা
(ঘ) **দেখবি** যদি জলদি **আয়** (ঙ) **চেঁচিয়ে** যে তার মুখ ব্যথা

সেট — ২

১। **'ক' এর সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো ঃ**

(ক)	(খ)
বরফ	শুরু
বুনো	হিমানী
কুঁড়ি	বন্য
চঞ্চল	কলি
আরম্ভ	অধীর

উত্তর →

(ক)	(খ)
বরফ	হিমানী
বুনো	বন্য
কুঁড়ি	কলি
চঞ্চল	অধীর
আরম্ভ	শুরু

২। **'জ্ঞা' দিয়ে পাঁচটি শব্দ লেখো ঃ**

উত্তর ঃ রজ্ঞা, বজ্ঞা, লবজ্ঞা, ভজ্ঞা, দজ্ঞাল।

৩। **বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে লেখো ঃ**

বুনো, জখম, লাডাক, শীতকাল, বরফ, তাঁবু, গরম, ন্যাড়া, সঙ্গী; নির্জন, বেচারি, চঞ্চল।

বিশেষ্য	বিশেষণ
লাডাক	বুনো
সঙ্গী	বেচারি
তাঁবু	নির্জন

বিশেষ্য	বিশেষণ
বরফ	গরম
শীতকাল	জখম
চঞ্চল	

৪। **ক্রিয়ার নীচে দাগ দাও ঃ**

(ক) বাড়ির জন্য ওদের মন কেমন **করত**। (খ) পাখিরা আবার আসতে আরম্ভ **করল**।

(গ) দেশে ফিরে ওরা বাসা **বাঁধবে**। (ঘ) সেখানে বুনো হাঁসরা **রইল**।

(ঙ) নিরাপদে তাদের শীত **কাটে**।

৫। **বাক্যরচনা করো ঃ** রেডিয়ো, চিঠিপত্র, থর থর, জোয়ান, তাঁবু।

উত্তর ঃ **রেডিয়ো ঃ** আগেকার দিনে মানুষ **রেডিয়োর** মাধ্যমে দেশবিদেশের খবর পেত।

চিঠিপত্র ঃ মোবাইল ফোন আসায় **চিঠিপত্র** লেখার তাগিদ কমেছে।

থর থর ঃ ভূমিকম্পে বাড়িঘর **থর থর** করে কেঁপে উঠল।

জোয়ান ঃ **জোয়ান** ছেলেরাই দেশের প্রাণশক্তি।

তাঁবু ঃ জঙ্গলেই তারা **তাঁবু** ফেলল।

সেট — ৩

১। **'ক' স্তম্ভের 'খ' স্তম্ভের মিল করো ঃ**

(ক)	(খ)
নালিশ	কাহিল
বারণ	উন্মাদ
পাগল	সবসময়
সদাই	নিষেধ
কাবু	অভিযোগ

উত্তর →

(ক)	(খ)
নালিশ	অভিযোগ
বারণ	নিষেধ
পাগল	উন্মাদ
সদাই	সবসময়
কাবু	কাহিল

২। **বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে লেখো ঃ**

পায়রা, কাবু, খুব, নালিশ, করুণ, পোষা, দুঃখ, চারজন, থানা, বড়োবাবু।

উত্তর ঃ

বিশেষ্য	বিশেষণ
পায়রা	কাবু
চারজন	করুণ
বড়োবাবু	দুঃখ

বিশেষ্য	বিশেষণ
নালিশ	খুব
থানা	পোষা

৩। **'কেঁদে কেঁদে' এই রকম একই শব্দকে দু'বার ব্যবহার করে পাঁচটি নতুন শব্দ তৈরি করো ঃ**
উত্তর ঃ হেসে হেসে, দেখে দেখে, বলে বলে, শুনে শুনে, লিখে লিখে।

৪। **ক্রিয়ার নীচে দাগ দাও ঃ**
উত্তর ঃ (ক) **বললে** কেঁদেই হাবু। (খ) সাতটা বেড়াল **পোষেন** ছোটোবড়ো।
(গ) **বললে** করুণ সুরে। (ঘ) **যাবেই** যে সব উড়ে। (ঙ) ভগবানকেই **ডাকি**।

৫। **বাক্য রচনা করো ঃ** নালিশ, ভগবান, বারণ, করুণ, ভোর
উত্তর ঃ **নালিশ** — তাদের নালিশ শোনার কেউ নেই। **বারণ** — তোমাকে যেতে বারণ করছি।
ভগবান — ভগবান হলেন সর্বমঙ্গালময়। **করুণ** — সে করুণ সুরে কথা বলছে।
ভোর — ভোর হয়েছে, তাই পাখি ডাকছে।

সেট — ৪

১। **অর্থ লেখো ঃ** গর্জন, বাগাল, গুঞ্জন, দুলন্ত, গোড়া।
উত্তর ঃ **গর্জন** — চিৎকার। **বাগাল** — রাখাল। **গুঞ্জন** — গুণ গুণ শব্দ।
দুলন্ত — যা দুলছে। **গোড়া** — প্রথম, শুরু।

২। **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ** পূর্বপুরুষ, আদি, কবি, শুকনো, বিশ্বাস।
উত্তর ঃ **পূর্বপুরুষ** — উত্তরপুরুষ। **আদি** — অন্ত। **কচি** — পাকা।
শুকনো— ভিজে। **বিশ্বাস** — সন্দেহ।

৩। **সমার্থক শব্দ লেখো ঃ** জল, নদী, সমুদ্দুর, জঙ্গাল, উলগুলান।
উত্তর ঃ **জল** — নীর। **জঙ্গাল** — অরণ্য। **নদী** — তটিনী।
উলগুলান — বিদ্রোহ। **সমুদ্দর** — সাগর।

৪। **ক্রিয়াপদের নীচে দাগ দাও ঃ**
উত্তর ঃ (ক) সাবু আর শাল গাছের পাঁচিল যেন **পাহারা দিত** গ্রামকে। (খ) এখন কেউ চাঁদ দিয়ে বছর **হিসাব করে**? (গ) ছোটোনাগপুর **ছাড়লাম**। (ঘ) জঙ্গাল নষ্ট **করি নাই**। (ঙ) যে **বাঁচায়** তাকে কেউ **মারে**?

৫। **দুটি বাক্যে ভেঙে লেখো ঃ**
(ক) হাতিশালটায় দেওয়াল তুলে ওটা এখন **ধান** রাখবার গোলাঘর।
উত্তর ঃ হাতিশাল টায় দেওয়াল তোলা হয়েছে। ওটা এখন ধান রাখবার গোলাঘর।
(খ) আমাদের কালে সেই জঙ্গাল দিয়ে চার মাইল যাও, তবে পাঠশালা।
উত্তর ঃ আমাদের কালে সেই জঙ্গাল দিয়ে চার মাইল যেতে হত। তারপর পাঠশালা পড়ত।
(গ) এখন ও লাফায় আর নদীর জল, কাশবন, বুনোফুল, আকাশ, সকলকে ডেকে ডেকে বলে সেকী ভীষণ যুদ্ধ?
উত্তর ঃ এখন ও লাফায়। আর নদীর জল, কাশবন, বুনোফুল, আকাশ সকলকে ডেকে সেই ভীষণ যুদ্ধের কথা বলে।
(ঘ) ডুলং ও সুবর্ণ রেখাও হেসে চলে যায়, বয়ে যায়।
উত্তর ঃ ডুলং ও সুবর্ণ রেখাও হাসে। আর তারা বয়ে চলে যায়।

৬। **বাক্যরচনা করো ঃ** পাঁচিল, চাঁদ, দেশ, মানুষ, জঙ্গল।

উত্তর ঃ **চাঁদ** — চাঁদ উঠেছে ফুল ফুটেছে। **দেশ** — দেশ তো মায়ের সমান।
মানুষ — মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব। **জঙ্গল** — এই জঙ্গল আগে খুব ঘন ছিল।
পাঁচিল — নিজেদের মধ্যে বিভেদের পাঁচিল ভেঙে ফেলো।

৭। **কোন্‌টি কী ধরনের বাক্য লেখো ঃ**

(ক) স্রোত কী জোরালো! (বিস্ময়বোধক)
(খ) কচি ছেলে, কিছুই জানে না। (নির্দেশক বা বিবৃতিমূলক)
(গ) সে যেন গেরুয়া জলের সমুদ্দুর। (সন্দেহবাচক)
(ঘ) নামটা বদলে গেল কেন গো? (প্রশ্নবোধক)
(ঙ) কী যুদ্ধ, কী যুদ্ধ! (বিস্ময়বোধক)

৮। **নীচের শব্দগুলো নির্দিষ্ট ছকে বসাও ঃ**

(মস্ত, আমাদের, শিকার, তুই, সে, লড়াই, বুড়ো, ভীষণ, ছোট্ট, ও, চরায়, রাখে, ঝাঁকড়া, ওঠে, সরু।)

বিশেষ্য	বিশেষণ	সর্বনাম	অব্যয়	ক্রিয়া
শিকার, লড়াই	মস্ত, বুড়ো, ভীষণ, ছোট্ট, ধারালো, সরু, ঝাঁকড়া	আমাদের, তুই, সে	ও	চরায়, রাখে, ওঠে

৯। **দুটি বাক্য জুড়ে একটি বাক্য লেখো ঃ**

(ক) কী গল্পই বললে আজ দাদু। সবাই শুনছিল গো।
উত্তর ঃ দাদু আজ এমন গল্প বললে যে সবাই শুনছিল গো।

(খ) এতোয়া রে! ছেলে তুই বড্ড ভালো।
উত্তর ঃ এতোয়া তুই বড্ড ভালো ছেলে।

(গ) তুই বড্ড বকিস এতোয়া, তোর বাপেরও এত কথা শুধাবার সহস হতো না।
উত্তর ঃ তুই বড্ড বকলেও এতোয়া, তোর বাপেরও এত কথা শুধাবার সাহস হতো না।

(ঘ) বাবুরা এল। আমাদের সব নিয়ে নিল।
উত্তর ঃ বাবুরা এসে আমাদের সব নিয়ে নিল।

(ঙ) আদিবাসী আসছে। মানুষ বাড়ছে।
উত্তর ঃ আদিবাসী আসছে বলে মানুষ বাড়ছে।

১০। **এলোমেলো বর্ণগুলি সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ তৈরি করো ঃ**

দিসীআবা, বখারের্ণসু, গাংভারদ, টিড়াপোমা, পুদিরুআষ
উত্তর ঃ আদিবাসী, সুবর্ণরেখা, দরংগাড়া, পোড়ামাটি, আদিপুরুষ।

১১। **এলোমেলো শব্দগুলি সাজিয়ে অর্থপূর্ণ বাক্য তৈরি করো ঃ**

(ক) ছাগল কাজ গোরু ওর চরানো
উত্তর ঃ ওর কাজ ছাগল গোরু চরানো।

(খ) তির শন শন তারা তখন ছোঁড়ে।
উত্তর ঃ তারা তখন শন শন তির ছোঁড়ে।

(গ) আগে হাজার চাঁদ হাজার।
উত্তর ঃ আগে হাজার হাজার চাঁদ।

(ঘ) ছিল পাথরের হাতিশালাটা আর।
উত্তর ঃ আর ছিল পাথরের হাতিশালাটা।

(ঙ) সপ্তাহে হাট প্রতি বসে তো গ্রামে।
উত্তর ঃ প্রতি সপ্তাহে গ্রামে তো হাট বসে।

সেট — ৫

১। 'ক'-এর সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মিলিয়ে লেখো ঃ

ক	খ
চাঁদ	গিরি
পাহাড়	শীতল
দিঘি	খদ্যোত
ফুল	নীর
ঠান্ডা	শশী
জোনাকি	জলাশয়/দীর্ঘিকা
জল	পুষ্প

উত্তর ঃ

ক	খ
চাঁদ	শশী
পাহাড়	গিরি
দিঘি	জলাশয়/দীর্ঘিকা
ফুল	পুষ্প
ঠান্ডা	শীতল
জোনাকি	খদ্যোত
জল	নীর

২। **বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে লেখো ঃ**
ঠান্ডা, চাঁদ, লাল, শহর, দরগাতলা, জোনাকি, গোলগাল উটকো, কলরব।

উত্তর ঃ

বিশেষ্য	বিশেষণ
চাঁদ	ঠান্ডা
কলরব	উটকো
জোনাকি	গোলগাল

বিশেষ্য	বিশেষণ
দরগাতলা	মস্ত
শহর	লাল

৩। **'ল' বর্ণ দুবার আছে এমন পাঁচটি শব্দ লেখো ঃ** (যেমন-টলটল)
উত্তর ঃ খলখল, গলগল, ছলছল, জ্বলজ্বল, ঢলঢল।

৪। **'কাছ' শব্দটিকে 'নিকটে' এবং 'দেখা করা' এই দুই অর্থে ব্যবহার করে দুটি বাক্যে লেখো ঃ**
উত্তর ঃ (ক) বাড়ির কাছে নদী (নিকটে)। (খ) শিক্ষক মহাশয়ের কাছে জেনে নাও (দেখা করা)

৫। **ক্রিয়ার নীচে দাগ দাও ঃ**
(ক) ছিটকিনিটা আস্তে খুলে **পেরিয়ে গেলাম** ঘর। (খ) নারকোলের ওই লম্বা মাথায় হঠাৎ **দেখি** কাল। (গ) **এসো**, আমরা সবাই না ঘুমানোর দল। (ঘ) কাব্য হবে, কাব্য হবে— **জুড়ল** কলরব। (ঙ) পাখির কাছে, ফুলের কাছে মনের কথা **কই**।

৬। **অর্থ লেখো ঃ** ঝিমধরা, উটকো, দরবার, কলরব, মিনার।
উত্তর ঃ ঝিমধরা — আড়ষ্টভাব। **উটকো** — আকস্মিক, হঠাৎ উপস্থিত হওয়া।
দরবার — সভা। **কলরব** — চেঁচামেচি, কিচির মিচির। **মিনার** — উঁচু গম্বুজ।

৭। **সমার্থক শব্দ লেখো ঃ** চাঁদ, পাখি, ফুল, গাছ, জোনাকি।
উত্তর ঃ চাঁদ — শশী। **পাখি** — খেচর। **ফুল** — পুষ্প। **গাছ** — বিটপ। **জোনাকি** — খদ্যোত।

৮। **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ** লম্বা, ঠান্ডা, হেসে, পদ্য, মস্ত।
উত্তর ঃ লম্বা — বেঁটে। **ঠান্ডা** — গরম। **হেসে** — কেঁদে। **পদ্য** — গদ্য। **মস্ত** — ছোটো।

সেট — ৬

১। **শব্দ যুগলের অর্থ পার্থক্য লেখো ঃ**
উত্তর ঃ ভার — ওজন। **বাঁচা** — বেঁচে থাকা। **সোনা** — মূল্যবান ধাতু বিশেষ।
ভাঁড় — মাটির পাত্র বিশেষ। **বাছা** — সন্তান। **শোনা** — শ্রবণ করা।

২। **দুটি করে অর্থ লেখো ঃ** বেলা, দাম।
উত্তর ঃ বেলা — দিন, নদী বা সমুদ্রের চর। **দাম** — মূল্য, শ্যাওলা।

৩। **বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে লেখো ঃ**
(ক্ষীর, বেশি, ঝাল, নটেগাছ, বিমলা, কম, দুরন্ত, খোকা, ছোটো, ছাই)

বিশেষ্য	বিশেষণ	বিশেষ্য	বিশেষণ
ক্ষীর	বেশি	বিমলা	ঝাল
নটেগাছ	কম	ছাই	দুরন্ত
খোকা	ছোটো		

৪। **ক্রিয়ার নীচে দাগ দাও ঃ**
(ক) **খাব** না তো আমি। (খ) **যা** বিমলা **যা**। (গ) ও বিমলা, **নে** মা একবার।
(ঘ) অবু বেশি **খাবে**। (ঙ) **দে** মা এনে চুন।

৫। **যেটা বেমানান তার নীচে দাগ দাও ঃ**
(ক) **ক্ষীর**, ছাগল, বিমলা, অবনী, দাদা।
(খ) **ফুল**, রাধু, বিমলা, সোনামণিমা, পূজা।
(গ) সোনার চুড়ো, **ছাইয়ের নুড়ো**, দাদা, বিমলা, মাধু।

৬। **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ** দাও, বড়ো, বেশি, ঝাল, আসে।
উত্তর ঃ দাও — নাও। বড়ো — ছোটো। বেশি — কম। ঝাল — মিষ্টি। আসে — যায়।

৭। **বাক্যরচনা করো ঃ** ক্ষীর, দুরন্ত, ছাই, নটেগাছ, চুন।
উত্তর ঃ ক্ষীর ঃ সে ক্ষীর ভালোবাসে।
দুরন্ত ঃ দুরন্ত নরেন একদিন শান্ত হয়ে গেল।
ছাই ঃ ছাই সরিয়ে সে সোনা পেল।
নটেগাছ ঃ আমাদের উঠোনে নটেগাছগুলো বেশ সতেজ হয়ে উঠেছে।
চুন ঃ পান খেতে চুন লাগে।

৮। **শব্দগুলো ঠিকমতো সাজিয়ে বাক্য তৈরি করো ঃ**
(ক) পরিমাণে দাদার কম বিমলার থেকে ক্ষীর।
উত্তর ঃ দাদার থেকে বিমলার ক্ষীর পরিমাণে কম।

(খ) হয় বিমলাকে ফুল পুজোর আনতে।
উত্তর ঃ বিমলাকে পুজোর ফুল আনতে হয়।

(গ) করে সবার পালন বিমলা ফরমাস সব।
উত্তর ঃ বিমলা সবার সব ফরমাস পালন করে।

(ঘ) মেয়ে বিমলার অবিচার প্রতি শুধু বলে হয় করা।
উত্তর ঃ শুধু মেয়ে বলে বিমলার প্রতি অবিচার করা হয়।

(ঙ) নয় করা ছেলেমেয়ের বৈষম্য মধ্যে উচিত।
উত্তর ঃ ছেলেমেয়ের মধ্যে বৈষম্য করা উচিত নয়।

৯। **কোন্‌টি কী ধরনের বাক্য লেখো ঃ**

(ক) খাব না তো আমি। (নঞর্থক বাক্য)
(খ) যা বিমলা যা। (অনুজ্ঞাসূচক)
(গ) ছাগলেতে নটেগাছ খেলে যে মুড়িয়ে। (বিবৃতিমূলক/সদর্থক)
(ঘ) আমার বেলাই বুঝি, ক্ষীর মাত্র নাম-ই? (প্রশ্নবোধক)

সেট — ৭

১। **'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভের মিল করো ঃ**

ক	খ
কেতাব	ঘোড়াকে দেখাশোনা করার লোক
মরুভূমি	মরুদ্যান
ওয়েসিসবই	ওয়েসিস
চোকিদার	শুষ্ক জলহীন স্থান
সইস	পাহারাদার

উত্তর →

ক	খ
কেতাব	বই
মরুভূমি	শুষ্ক জলহীন স্থান
মরুদ্যান	
সাইস	ঘোড়াকে দেখাশোনা করার লোক
চোকিদার	পাহারাদার

২। **বিশেষ্য ও বিশেষণ পদ আলাদা করে লেখো ঃ**
বেলোয়ারি, চুড়ি, মাদুর, ঝাঁকড়া, বিবাগি, গড়ন, দামি, নীল, গরম, ঘোলা, পুকুর, লোকজন।
উত্তর ঃ বিশেষ্য ঃ চুড়ি, মাদুর, গড়ন, পুকুর, লোকজন।
বিশেষণ ঃ বেলোয়ারি, ঝাঁকড়া, বিবাগি, দামি, নীল, গরম, ঘোলা।

৩। **ক্রিয়ার নীচে দাগ দাও ঃ**
(ক) হঠাৎ তাদের হাঁক **পৌঁছুত**। (খ) সেইখানে অত্যন্ত একলা হয়ে **বসতুম**।
(গ) হাত গলিয়ে ঘরের ছিটকানি **দিতুম খুলে**। (ঘ) ধারাজল **পড়ত** সকল গায়ে।
(ঙ) পুকুর থেকে পাতিহাঁসগুলো **উঠে গিয়েছে**।

৪। **বাক্যরচনা করো ঃ** প্রধান, দেশ, বালিশ, মরুভূমি, ধুলো।
উত্তর ঃ প্রধান — আমাদের দেশ গ্রীষ্মপ্রধান। **দেশ** — দেশকে ভালোবাসো।
বালিশ — তিনি বালিশ ছাড়া ঘুমোন। **মরুভূমি** — রাজস্থানে মরুভুমি আছে।
ধুলো — ঝড়ে ধুলো উড়ছে।

৫। **'গ্রহণ' শব্দটিকে দুটি আলাদা অর্থে ব্যবহার করে বাক্যরচনা করো ঃ**
উত্তর ঃ গ্রহণ -- আমার দান সে গ্রহণ করল। **গ্রহণ** — চাঁদে গ্রহণ লেগেছে।

৬। **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ** আড়াল, চুপ, আনন্দ, গলি, ফিকে।
উত্তর ঃ আড়াল — প্রকাশ্য। **চুপ** — সরব। **আনন্দ** -- বেদনা। **গলি** — রাজপথ। **ফিকে** — উজ্জ্বল।

৭। **প্রতিশব্দ লেখো ঃ** পৃথিবী, পাহাড়, আকাশ, জল, গাছ।
উত্তর ঃ পৃথিবী — বসুন্ধরা। **পাহাড়** — গিরি। **জল** — নীর। **আকাশ** — গগন। **গাছ** — বিটপ, বৃক্ষ।

৮। **দুটি বাক্যে ভেঙে লেখো ঃ**
ক) আমার পিতা যখন বাড়ি থাকতেন তাঁর জায়গা ছিল তেতলার ঘরে।
উত্তর ঃ তেতলার একটি ঘরছিল। আমার পিতা বাড়ি থাকলে সেখানেই থাকতেন।
খ) আমি লুকিয়ে ছাদে উঠতুম প্রায়ই দুপুরবেলায়।
উত্তর ঃ দুপুরবেলা হত। আমি প্রায়ই লুকিয়ে ছাদে উঠতুম।
গ) হঠাৎ তাদের হাঁক পৌঁছত, সেখানে বালিশের উপর খোলাচুল এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকত বাড়ির বউ।
উত্তর ঃ বালিশের উপর খোলাচুল এলিয়ে শুয়ে থাকত বাড়ি বউ। হঠাৎ সেখানেই তাদের হাঁক পৌঁছত।
ঘ) বিছানার একখানা চাদর নিয়ে গা মুছে সহজ মানুষ হয়ে বসতুম।
উত্তর ঃ বিছানার একখানা চাদর দিয়ে গা মুছতুম। তারপর সহজ মানুষ হয়ে বসতুম।
ঙ) গরম বাতাস হুহু করে ছুটে যাচ্ছে ধুলো উড়িয়ে।
উত্তর ঃ গরম বাতাস হুহু করে ছুটে যাচ্ছে। আর ধুলো উড়ছে।

সেট — ৮

১। **বাক্য রচনা করো ঃ** ছুটি, বাঁশি, বাজনা, ছুটন্ত, দীপ।
উত্তর ঃ **ছুটি** — ছুটি মানে প্রাণের মুক্তি। **বাঁশি** — স্টিমার ঘাটে বাঁশি বেজে উঠল।
বাজনা — এবার ঢাকের বাজনা শুরু করো। **ছুটন্ত** — ছুটন্ত গাড়িতে উঠতে যেও না।
দীপ — ঘরে ঘরে দীপ জ্বলে উঠল।

২। **ক্রিয়াটি বেছে নিয়ে আলাদা করে লেখো ঃ**
ক) মাঠে শিশুরা অগাধ খুশিতে লুটোপুটি খায়। খ) ছুটমানে বুঝতে গেলে ছুটতে হবে। গ) আর কিছু বলব না। ঘ) ছুটি সাত সমুদ্দুরের ঢউকে ডেকে আনে।
ঙ) জীবনে আমি শুধু এগিয়ে যাব।
উত্তর ঃ ক) লুটোপুটি খায়। খ) ছুটতে হবে। গ) বলব না। ঘ) ডেকে আনে। ঙ) এগিয়ে যাব।

৩। **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ** ছুটি, হাসি, দিন, শাশ্বত, আশা।
উত্তর ঃ ছুটি — বন্ধন। **হাসি** — কান্না। **দিন** — রাত। **শাশ্বত** — ক্ষণকালীন । **আশা** — নিরাশা ।

৪। **সমার্থক শব্দ লেখো ঃ** দিন, পা, সমুদ্র, ঘুম, শক্ত।
উত্তর ঃ দিন —দিবস। **পা** — পদ। **সমুদ্র** — সাগর। **ঘুম** — নিদ্রা। **শক্ত** — কঠিন।

৫। **বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে লেখো ঃ**
হারানো বাঁশি, শাশ্বত দীপ, পোক্ত ভাষা, ভাঙা খাঁচা, সবুজ সমুদ্দুর।

উত্তর ঃ

বিশেষ্য	বিশেষণ
বাঁশি	হারানো
ভাষা	পোক্ত
সমুদ্দুর	সবুজ

বিশেষ্য	বিশেষণ
দীপ	শাশ্বত
খাঁচা	ভাঙা

৬। **বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো ঃ** পুটোটিলু, দ্দুসমুর, টন্তফু, তশ্বশা, আলগ।
উত্তর ঃ লুটোপুটি, সমুদ্দুর, ফুটন্ত, শাশ্বত, আগল।

৭। **এলোমেলো শব্দগুলোকে সাজিয়ে বাক্যগঠন করো ঃ**
(ক) কী মানে পাখির ছোট্ট ভাঙা আগল খাঁচা ছুট।
উত্তর ঃ ছুট মানে কী ছোট্ট পাখির আগল ভাঙা খাঁচা।
(খ) আর বলব না কিছু ছুটেই কী দেখো ছুট মানে।
উত্তর ঃ ছুট মানে কী ছুটেই দেখো— আর কিছু বলব না।
(গ) শাশ্বত দীপ এক তো মাঠ মানে সবুজ প্রাণের।
উত্তর ঃ মাঠে মানে তো সবুজ প্রাণের শাশ্বত এক দীপ।
(ঘ) ঘুম তাড়ানো মন হারানো বাঁশি কী মাঠ মানে।
উত্তর ঃ মাঠ মানে কী ঘুম তাড়ানো মন হারানো বাঁশি।
(ঙ) ছুটি মানে কী মাজই শুধু মানে মাঠ কী!
উত্তর ঃ মাঠ মানে কী মজাই শুধু মাঠ মানে কী ছুটি!

৮। **এককথায় প্রকাশ করো ঃ**
ক) **যা ছুটছে এমন্ত** — ছুটন্ত। খ) **যা ফুটছে** — ফুটন্ত। গ) **যে ঘুমিয়ে আছে** — ঘুমন্ত।
ঘ) **যে নেচে চলেছে** — নাচনা।

৯। **শব্দ যুগলের পার্থক্য লেখো ঃ**
দীপ — প্রদীপ। ভাষা — কথা। দীন — দরিদ্র।
দ্বীপ — জল বেষ্ঠিত ভূভাগ। ভাসা — ভেসে থাকা। দিন — দিবস।

১০। **একই শব্দকে দু'বার বাক্যে ব্যবহার করে দেখাও, তাদের অর্থ কীভাবে বদলে গেল ঃ**
ঘুম, খুশি, ভাঙা, সোনা, সবুজ।
উত্তর ঃ ঘুম ঘুম — আমার ঘুম ঘুম পাচ্ছে। **খুশি খুশি** — তোমাকে আজ বেশ খুশি খুশি লাগছে। **ভাঙা ভাঙা** — ভাঙা ভাঙা গলায় সে বলে চলল। **সোনা সোনা** — সোনা সোনা করে লোকটা পাগল হয়ে গেল। **সবুজ সবুজ** — গাছগুলোকে কেমন সবুজ সবুজ লাগছে।

সেট — ৯

১। **'চেয়ে' ও 'ভারী' শব্দ দুটিকে দুটি আলাদা বাক্যে প্রয়োগ করো ঃ**
উত্তর ঃ চেয়ে — তোমার চেয়ে শ্যামাশ্রী বয়সে বড়ো। (অপেক্ষা)। **চেয়ে**— সে আকাশের দিকে চেয়ে রইল (তাকিয়ে)। **ভারী** — ভারী মজা। (খুব)। **ভারী** — ব্যাগটা খুব ভারী। (বেশি ওজন)

২। **বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করো ঃ**

এলোমলো বাতাস, চাঁপার বন, কালো জল, কালির দোয়াত, কোমল ঠোঁট।

উত্তর ঃ

বিশেষ্য	বিশেষণ
বাতাস	এলোমেলো
জল	কালো
ঠোঁট	কোমল

বিশেষ্য	বিশেষণ
বন	চাঁপার
দোয়াত	কালির

৩। **ক্রিয়ার নীচে দাগ দাও ঃ**

ক) কোথা থেকে বাতাস **এল**। খ) **আসলো** মাঝি তাড়াতাড়ি। গ) আমি তোমার মেঝের উপর **ঢালি**। ঘ) **পালিয়ে গেল** অনেক দূরে। ঙ) **চেয়ে দেখি** আকাশখানা এক্কেবারে কালো।

৪। **'অন্ধকার' শব্দটির মতো 'ন্ধ'-এর প্রয়োগ আছে এমন পাঁচটি শব্দ তৈরি করো ঃ**

উত্তর ঃ বন্ধু, স্কন্ধ, রন্ধ্র, সিন্ধু, বিন্ধ্য।

৫। **এলোমেলো বর্ণগুলিকে সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো ঃ**

লোলোএমে — এলোমেলো। নাকাআশাকা — আকাশখানা। ড়াড়িতাতা — তাড়াতাড়ি। ক্কেবারেএ — এক্কেবারে। লাকুতবল — বকুলতলা।

৬। **বাক্যরচনা করো ঃ** হাট, ভালো, সময়, গাড়ি, ভীষণ।

উত্তর ঃ হাট — হাট বসেছে শুক্রবারে। **ভালো** — এই ছেলেটা বেশ ভালো। **সময়** — সময়কে অবহেলা করা উচিত নয়। **পাড়ি** — সে বিদেশে পাড়ি দিল। **ভীষণ** — আজ ভীষণ শীত।

৭। **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ**

এলোমেলো — সাজানো গোছানো। **তাড়াতাড়ি** — ধীরে ধীরে। **কোমল** — কঠিন। **জ্বেলে** — নিভিয়ে। **দূরে** — নিকটে।

৮। **'কোমল' ও 'কমল' শব্দ যুগলের অর্থ পার্থক্য বাক্যরচনা করে বুঝিয়ে দাও ঃ**

কোমল — (নরম) ঃ বিদ্যাসাগরের হৃদয়টা ছিল কোমল। **কমল** — (পদ্ম) ঃ সরোবরে কমল ফুটে রয়েছে।

৯। **কোন্‌টি কোন্‌ শ্রেণির বাক্য লেখো ঃ**

(ক) ওই এসেছে ঝড়! (বিস্ময়সূচক) (খ) ঝড় কারে মা কয়? (প্রশ্নবোধক) (গ) কেমন জানি করল আমার মন! (বিস্ময়সূচক) (ঘ) পালিয়ে গেল অনেক দূরে - সাত সাগরের পার। (বিবৃতিমূলক)

সেট — ১০

১। **বাক্যরচনা করো ঃ** নাস্তা, মৌচাক, রং, স্ফূর্তি, কলস।

উত্তর ঃ নাস্তা ঃ তারা নাস্তা খেয়ে যাত্রা শুরু করল। **মৌচাক ঃ** মৌচাকে মধু থাকে।

রং ঃ আকাশে এত রং কীসের? **স্ফূর্তি ঃ** তার মনে বেশ স্ফূর্তি।

কলস ঃ কলস কাঁখে মেয়েরা পুকুরে চলেছে।

২। **সঠিক ছকে শব্দ বসাও ঃ**

এক, কাটে, আর, ভুল, পথ, বিশ্বাস, গোঁয়ার, বোঝাই, গভীর, সকাল, ডাঙা, সরু, তাড়ায়, তার, চিৎকার, মারল, সে, ওদের, ছোটো, কিন্তু, ও, বেজায়, শক্তি, নিয়েছে।

উত্তর ঃ

বিশেষ্য	বিশেষণ	সর্বনাম	অব্যয়	ক্রিয়া
পথ	এক	তার	আর	কাটে
বিশ্বাস	ভুল	সে	কিন্তু	তাড়ায়
সকাল	গোঁয়ার	ওদের		মারল
ডাঙা	বোঝাই			নিয়েছে
চিৎকার	গভীর			
শক্তি	সরু			
	ছোটো			
	বেজায়			

৩। **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ** কাঁচা, ভর্তি, তীক্ষ্ণ, দীর্ঘ, বোঝাই।
উত্তর ঃ **কাঁচা** — পাকা। **ভর্তি** — খালি। **তীক্ষ্ণ** — ভোঁতা। **দীর্ঘ** — হ্রস্ব। **বোঝাই** — খালি।

৪। **সমার্থক শব্দ লেখো ঃ** মৌমাছি, বাঘ, ফুল, বন, মাটি।
উত্তর ঃ **মৌমাছি** — অলি। **বাঘ** — ব্যাঘ্র। **ফুল** — পুষ্প। **বন** — অরণ্য। **মাটি** — মৃত্তিকা।

সেট — ১১

১। **শব্দগুলি সঠিক ঘরে বসাও ঃ**
গাছ, যে, বা, রূপালি, জুড়ত, তুলে, হয়ে, ঝিকিরমিকির, লক্ষ, সে, কম্প, জ্বর।

উত্তর ঃ

বিশেষ্য	বিশেষণ	সর্বনাম	অব্যয়	ক্রিয়া
গাছ	রূপালি	যে	বা	জুড়ত
কম্প	ঝিকিরমিকির	সে		তুলে
জ্বর	লক্ষ			হয়ে

২। **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ** সন্ধে, হঠাৎ, শেষে, হেসে, আলো।
উত্তর ঃ সন্ধে — সকাল। **হঠাৎ** — সর্বদা। **শেষে**— প্রথমে। **হেসে** — কেঁদে। **আলো**— আঁধার।

৩। **সমার্থক শব্দ লেখো ঃ** গাছ, ভুত, বন, বিষ্টি, মাছ, চাঁদ।
উত্তর ঃ গাছ — বৃক্ষ। **ভুত** — অশরীরী। **মাছ**— মীন। **বন** — অরণ্য। **বিষ্টি**— বারি। **চাঁদ**—শশী।

৪। **প্রতিটি বাক্য ভেঙে দুটি আলাদা বাক্যে লেখো ঃ**

(ক) এক যে ছিল গাছ সন্ধে হলেই দু'হাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ।
উত্তর ঃ একটি গাছ ছিল। সেটি সন্ধে হলেই দু'হাত তুলে জুড়ত ভূতের নাচ।

(খ) বৃষ্টি হলেই আসত আবার কম্প দিয়ে জ্বর।
উত্তর ঃ বৃষ্টি হত। অমনি কম্প দিয়ে জ্বর আসত।

(গ) সকাল হল যেই, একটি মাছও নেই।
উত্তর ঃ সকাল হল। তখন একটি মাছও রইল না।

(ঘ) মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে লক্ষ হীরার মাছ।
উত্তর ঃ মুকুট হয়ে ঝাঁক বেঁধেছে। তারা লক্ষ হীরার মাছ।

(ঙ) ভালুক হয়ে ঘাড় ফুলিয়ে করত সে গর্ গর্।
উত্তর ঃ ভালুক হত। আর ঘাড় ফুলিয়ে সে গর্ গর্ করত।

৫। **বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো ঃ** রগ্ রগ্, টকুমু, বআয়াছা, রকিমিঝিরকি, রবেভোলা।
উত্তর ঃ গর্ গর্, মুকুট, আবছায়া, ঝিকিরমিকির, ভোরবেলা।

সেট — ১২

১। **বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো ঃ**
লতকাডাদ—ডাকাতদল। **নণীফসাম**—ফণীমনসা। **রিবিচ্ছিতিকি**—বিতিকিচ্ছিরি। **কংপাশাল**—পালংশাক।

২। **এলোমেলো শব্দগুলিকে সাজিয়ে সঠিক বাক্যটি লেখো ঃ**
(ক) বলো চাও কী রকম তুমি পাতা। **উত্তর ঃ** কী রকম পাতা তুমি চাও বলো।
(খ) হয়েছে তো সুবুদ্ধি তোমার এই। **উত্তর ঃ** এই তো তোমার সুবুদ্ধি হয়েছে।
(গ) না আর পাতা চাই সোনার। **উত্তর ঃ** আর সোনার পাতা চাই না।

৩। **শব্দঝুড়ি থেকে শব্দ নিয়ে দাগ দেওয়া অংশের বদলে সমার্থক শব্দ বসাও ঃ**
শব্দঝুড়ি—অবিরাম, অবস্থা, গগন, যন্ত্রণা, চারাগাছ, প্রবল, আরম্ভ।
উত্তর ঃ ক) আহা-হা **ব্যথায়** মরি। (যন্ত্রণা) খ) **শুরু** হলো **কচি গাছের অঝোর** কান্না। (আরম্ভ, চারাগাছ, অবিরাম) গ) ডাকাতেরা আমায় কী **হাল** করে রেখে গেছে। (অবস্থা) ঘ) **আকাশ** দিয়ে ধেয়ে এল **দুর্দান্ত** ঝড়। (গগন, প্রবল)

৪। **'কাচ-ফাচ' বা 'কাপড়-চোপড়' এমনি প্রথমটির অর্থ থাকলেও দ্বিতীয়টির অর্থ নেই, এরূপ শব্দ আরো কয়েকটা লেখো ঃ**
উত্তর ঃ টাকাফাকা, চা-টা, বাড়ি-টারি, মুড়ি-ফুড়ি, সময়-টময়।

৫। **'কচি কচি' পাতা বলতে অনেক পাতাকে বোঝায়। এই রকম আরও কয়েকটা শব্দ লেখো যার দ্বারা বহুবচন বোঝায়।**
উত্তর ঃ বাড়ি বাড়ি, বনে বনে, ঘরে ঘরে, জনে জনে, দলে দলে।

৬। **দু'রকম অর্থে বাক্যরচনা করো ঃ**
মন্দ — কথাটি মন্দ নয়। **মন্দ**—জাহাজটি তীরে এসে মন্দগামী হল।

৭। **কী ধরনের বাক্য লেখো ঃ**
ক) আ! কী শান্তি! (বিস্ময়সূচক) খ) পাতা ওল্টাতে চাও? (প্রশ্নবোধক) গ) সোনার পাতা আর চাই না (নেতিবাচক) ঘ) বেশ তাই হোক। তথাস্তু। (সম্মতিসূচক) ঙ) এবার তুমি আমায় কাচের পাতা দাও। (অনুজ্ঞাবাচক)

৮। **ছোটো ছোটো বাক্যে ভেঙে লেখো ঃ**
ক) কাচের পাতার ওপর সূর্যের কিরণ পড়ে রামধনু রং ঝিকিমিকি খেতে লাগল।
উত্তর ঃ কাচের পাতার ওপর সূর্যের কিরণ পড়ল। এরপর রামধনু রং ঝিকিমিকি খেতে লাগল।
খ) পরি অদৃশ্য হতেই ফণীমনসার গা ভরে দেখা দিল কচি নরম পাতা।
উত্তর ঃ পরি অদৃশ্য হল। আর ফণীমনসার গা ভরে দেখা দিল কচি নরম পাতা।
গ) ডাকাতরা সব সোনার পাতা ছিঁড়ে নিয়ে পোঁটলা বেঁধে ওকে একবারে ন্যাড়া করে রেখে গেল।
উত্তর ঃ ডাকাতরা সব সোনার পাতা ছিঁড়ে পোঁটলা বাঁধল। এইভাবে ওকে একেবারে ন্যাড়া করে রেখে গেল।

ঘ) ভয়ানক ঝড়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ফণীমনসা গাছের সমস্ত পাতা ছড়িয়ে পড়ে গেল।
উত্তর ঃ ভয়ানক ঝড় এল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই ফণীমনসা গাছের সমস্ত পাতা ছড়িয়ে পড়ে গেল।

৯। **বাক্যগুলি যোগ করে একটি বাক্যে পরিণত করো ঃ**

ক) একসময় ঝড় থামল। আর শুরু হল বাচ্চা গাছের অঝোর কান্না।
উত্তর ঃ একসময় ঝড় থামলে শুরু হল বাচ্চা গাছের অঝোর কান্না।

খ) এমন সময়ে সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল বনের পরি। ওর কান্না শুনে থমকে দাঁড়াল সে।
উত্তর ঃ এমন সময়ে সে পথ দিয়ে যেতে যেতে বনের পরি ওর কান্না শুনে থমকে দাঁড়াল।

গ) গভীর বন। তার ভেতরে ছোট্ট একটি ফণীমনসার গাছ। গাছটির মনে কিন্তু এক ফোঁটাও শান্তি নেই।
উত্তর ঃ গভীর বনের ভেতরে যে ফণীমনসার গাছটি ছিল, তার মনে কিন্তু এক ফোঁটাও শান্তি নেই।

ঘ) ছোট্ট গাছটির এবার দেমাকে যেন পা পড়ে না। মৃদুমন্দ বাতাসে হেলতে দুলতে লাগল সে মজা করে।
উত্তর ঃ ছোট্ট গাছটির এবার দেমাকে পা পড়ে না বলে সে মৃদুমন্দ বাতাসে হেলতে দুলতে লাগল।

১০। **আরও বিশেষণ যোগ করো ঃ**

ক) — — সবুজপাতা। খ) — — ছোট্ট গাছ। গ) — — ন্যাড়া চেহারা।
ঘ) — — জোয়ান ডাকাত। ঙ) — — ছোট্ট মেয়ে।
উত্তর ঃ ক) **কচি নরম** সবুজপাতা। খ) **অতি সুন্দর** ছোট্ট গাছ। গ) **অতি অদ্ভুত** ন্যাড়া চেহারা।
ঘ) **অত্যন্ত বলবান** জোয়ান ডাকাত। ঙ) **ভারী ফুটফুটে** ছোট্ট মেয়ে।

১১। **পাশে যেভাবে বলা আছে, সেই অনুযায়ী বাক্যগুলি বদলে আবার লেখো ঃ**

(ক) আকাশ দিয়ে ধেয়ে এল দুর্দান্ত ঝড়। (ঝড় আগামীকাল এলে কী লিখবে?)
উত্তর ঃ আকাশ দিয়ে ধেয়ে আসবে দুর্দান্ত ঝড়।

(খ) বলতে দেরি আছে কিন্তু নিতে দেরি নেই। (কথাগুলো গতকাল হয়েছে বলতে হলে কী লিখবে?)
উত্তর ঃ বলতে দেরি ছিল কিন্তু নিতে দেরি ছিল না।

(গ) সে-পথ দিয়ে যাচ্ছিল বনের পরি। (কথাগুলো এখনই বলা হচ্ছে, এমন হলে কী লিখবে?)
উত্তর ঃ সে পথ দিয়ে যাচ্ছে বনের পরি।

সেট — ১৩

১। **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ** রাত, বার্ধক্য, খরা, পুরোনো, শান্ত।
উত্তর ঃ **রাত** — দিন। **বার্ধক্য** — শৈশব। **খরা** — বন্যা। **পুরোনো** — নতুন। **শান্ত** — দুরন্ত

২। **বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করে লেখো ঃ**

একশো মানিক, দুরন্ত ছেলে, বাদলা হাওয়া, গুরুগুর বুক, ঝাপসা গাছপালা।

উত্তর ঃ

বিশেষ্য	বিশেষণ
মানিক	একশো
গাছপালা	ঝাপসা
বুক	গুরগুর

বিশেষ্য	বিশেষণ
হাওয়া	বাদলা
ছেলে	দুরন্ত

৩। **ক্রিয়ার তলায় দাগ দাও ঃ**

ক) কাঁসর ঘন্টা **বাজল** ঠঙ ঠঙ। খ) কত খেলা **পড়ে** মনে। গ) **শুনেছিলেম** গান।

ঘ) **বিষ্টি পড়ে** টাপুর টুপুর। ঙ) বাইরেতে মেঘ **ডেকে ওঠে**।

৪। **'সৃষ্টি'—এমন 'ষ্ট' রয়েছে — এরকম পাঁচটি শব্দ লেখো ঃ**
উত্তর ঃ বৃষ্টি, দৃষ্টি, কৃষ্টি, মিষ্টি, যষ্টি।

৫। **সাজিয়ে লেখো ঃ** লেছেবেলা, রিকোচুলু।
উত্তর ঃ ছেলেবেলা, লুকোচুরি।

সেট — ১৪

১। **নীচের শব্দগুলি থেকে খুঁজে নিয়ে একই অর্থের শব্দ পাশাপাশি লেখো ঃ**
(অগ্রভাগ, কৃষি, মৃত্তিকা, ইক্ষু)
উত্তর ঃ **চাষ** — কৃষি। **আখ** — ইক্ষু । **আগা** — অগ্রভাগ। **মাটি** — মৃত্তিকা।

২। **নীচের দাগ দেওয়া শব্দগুলো কী জাতীয় শব্দ লেখো ঃ**
(ক) কুমির আর শিয়াল মিলে **চাষ** করতে গেল। **উত্তর ঃ** চাষ — বিশেষ্যপদ।
(খ) **সে** ভাবলে বুঝি আলু তার গাছের ফল। **উত্তর ঃ** সে — সর্বনাম।
(গ) আচ্ছা আসছে বার **দেখব**। **উত্তর ঃ** দেখব — ক্রিয়াপদ
(ঘ) ভেবেছে, মাটি খুঁড়ে সব **ধান** বার করে **নেব**। **উত্তর ঃ** ধান — বিশেষ্য। নেব — ক্রিয়াপদ।
(ঙ) এবার **আমাকে গোড়ার** দিক দিতে হবে। **উত্তর ঃ** আমাকে — সর্বনাম। গোড়ার — বিশেষণ।

৩। **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ** লাভ, মিষ্টি, নীচে, কাজ, মজা।
উত্তর ঃ **লাভ** — লোকসান। **মিষ্টি** — তেতো। **নীচে** — ওপরে। **কাজ** — অকাজ। **মজা** — দুঃখ।

সেট — ১৫

১। **এলোমেলো শব্দগুলি সাজিয়ে লেখো ঃ**
উত্তর ঃ **মুনসশাক্ত** — শাসনমুক্ত। **টিপুলিঘাঁশ** — পুলিশঘাঁটি। **রকুড়পাপু** — পুকুরপাড়।
তাভারমাত — ভারতমাতা। **কন্যঅরম** — অন্যরকম। **রুবাগোদলা** — গোলাবারুদ।

২। **'মরণপণ' কথাটার শেষ শব্দ 'পণ'। এই 'পণ' যোগে কয়েকটি শব্দ তৈরি করো ঃ**
উত্তর ঃ প্রাণপণ, জীবনপণ, রাজ্যপণ, কন্যাপণ।

৩। **'ছোটো-বড়ো' এ রকম আরো কিছু বিপরীত শব্দ লেখো ঃ**
উত্তর ঃ জীবন-মরণ, জন্ম-মৃত্যু, রাত-দিন, সত্য-মিথ্যা, সাদা-কালো, ভালো-মন্দ।

৪। **কোন্‌টা বিশেষ্য ও কোন্‌টা বিশেষণ লেখো ঃ**
(শক্তিশালী, সম্পদ, উদ্ধৃত, রাশভারী, শক্তি, সম্মান, স্বাধীন, অত্যাচার, শাসন, অনুরোধ)

উত্তর ঃ

বিশেষ্য	বিশেষণ
সম্পদ	শক্তিশালী
শাসন	উদ্ধৃত
শক্তি	
অত্যাচার	

বিশেষ্য	বিশেষণ
সম্মান	রাশভারী
অনুরোধ	স্বাধীন

৫। **পদান্তর করো ঃ** (নীচের শব্দগুলির সাহায্য নাও)
(অত্যাচারিত, স্পর্ধিত, মুক্ত, শাসিত, সুখী, প্রতিবাদী, ভক্ত, সম্মানিত, ত্যক্ত, তেজস্বী, ঘোষিত)

উত্তর ঃ

বিশেষ্য	বিশেষণ
অত্যাচার	অত্যাচারিত
ভক্তি	ভক্ত
শাসন	শাসিত
সম্মান	সম্মানিত
সুখ	সুখী
প্রতিবাদ	প্রতিবাদী

বিশেষ্য	বিশেষণ
মুক্তি	মুক্ত
ত্যাগ	ত্যক্ত
স্পর্ধা	স্পর্ধিত
ঘোষণা	ঘোষিত
তেজস্বিতা	তেজস্বী

৬। **নীচের বিশেষণ পদগুলিকে বিশেষ্যে রূপান্তরিত করো। এই শব্দগুলোর সাহায্য নাও —**
রং, উদ্ধৃতি, গাম্ভীর্য, বিদেশ, মনীষা।

উত্তর ঃ

বিশেষণ	বিশেষ্য
গম্ভীর	গাম্ভীর্য
উদ্ধৃত	উদ্ধৃতি
মনীষী	মনীষা

বিশেষণ	বিশেষ্য
রঙিন	রং
বিদেশি	বিদেশ

সেট — ১৬

১। **নীচের শব্দগুলো মূল কোন্ শব্দ থেকে এসেছে ঃ** আখ, রোদ্দুর।
উত্তর ঃ আখ — ইক্ষু শব্দ থেকে। **রোদ্দুর — রৌদ্র** শব্দ থেকে।

২। **'চড়াই'** ও **'পড়ে'** শব্দটির দুটি করে অর্থ লেখো, বাক্যে ব্যবহার করোঃ
উত্তর ঃ চড়াই — (উঁচু) ঃ সে পাহাড়ের চড়াই পথে হেঁটে চলল। **চড়াই** — (পাখি বিশেষ) ঃ আজকাল চড়াই পাখি আর দেখাই যায় না। **পড়ে** — (পতন হয়) ঃ বৃষ্টি পড়ে। **পড়ে** — (বই পড়া) ঃ সে বই পড়ে।

৩। **বর্ণ সাজিয়ে বাক্য তৈরি করো ঃ**
হুদূরবর্তীর — বহুদূরবর্তী। **লঙ্গাবারম** — মঙ্গালবার। **লপিতিলিটু** — তিলপিটুলি।
অমস্কনন্য — অন্যমনস্ক। **রপাত্তউড়া** — উত্তরপাড়া। **কুঠাখোরকা** — খোকাঠাকুর।

৪। **শব্দগুলিকে সঠিক ঘরে বসাও ঃ**
(তার, নেমন্তন্ন, বোকা, দিয়েছিল, মঙ্গালবার, আকাশ, ঝমঝম, চলাফেরা, প্রকান্ড, মিশকালো, চুঁইচুঁই, তিনি)

উত্তর ঃ

বিশেষ্য	বিশেষণ	সর্বনাম	অব্যয়	ক্রিয়া
নেমন্তন্ন	বোকা	তার	ঝমঝম	দিয়েছিল
মঙ্গালবার	ঝমঝম	তিনি		
আকাশ	প্রকান্ড			
চলাফেরা	মিশকালো			
	চুঁইচুঁই			

৫। **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ** সলজ্জ, সুখাদ্য, অন্ধকার, সাদা, আগ্রহ।
উত্তর ঃ সলজ্জ — নির্লজ্জ। **সুখাদ্য** — কুখাদ্য। **অন্ধকার** — আলো। **সাদা** — কালো। **আগ্রহ**— অনীহা।

৬। **ঝম্‌ঝম্ আর টিপ্‌টিপ্ শব্দের মতো ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টিকারী আরো কিছু শব্দ লেখো ঃ**
উত্তর ঃ শন্‌শন্, পত্‌পত্, ঝন্‌ঝন্, খট্‌খট্, চিক্‌চিক্, কট্‌কট্, খাঁ খাঁ।

সেট — ১৭

১। **বর্ণগুলো সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো ঃ**
উত্তর ঃ পুরিতাসুল —তালসুপুরি। **লাপাছগা** — গাছপালা।
লিড়কাবেঠ — কাঠবেড়ালি। **ততস্তই** — ইতস্তত।

২। **নীচের শব্দগুলি শূন্যস্থানে বসিয়ে মিল করো ঃ** (ওখানে, সেরকম, সেকাল, ওপার)
উত্তর ঃ এপার — ওপার । **একাল** — সেকাল। **এখানে** — ওখানে। **এরকম** — সেরকম

৩। **'ঘর-বার' এই রকম পাশাপাশি বসে থাকা উল্টোকথা তুমি কটা জানো লেখো ঃ**
উত্তর ঃ আলো-আঁধার, ভালো-মন্দ, আকাশ-পাতাল, দিন-রাত, স্বর্গ-নরক, বেচা-কেনা।

৪। **বিপরীত শব্দ লেখো ঃ**
মস্ত, দুঃখ, আশীর্বাদ।
উত্তর ঃ মস্ত — ছোট্ট। **দুঃখ** — সুখ। **আশীর্বাদ** — অভিশাপ।

৫। **বিশেষ্য ও বিশেষণ আলাদা করো ঃ**
একলা, সবুজ, মাথার, পাতা।
উত্তর ঃ বিশেষ্য — পাতা **বিশেষণ** — একলা, সবুজ, মাথার।

৬। **পদান্তর করো ঃ**
গাছ — গেছো । **পাথর** — পাথুরে । **বন** — বুনো। **মাটি** — মেটে। **দুঃখ** — দুঃখিত।

সেট — ১৮

১। **বর্ণ সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো ঃ**
উত্তর ঃ ঠিককাঁপা — কাঁপকাঠি। **নিনিনাচোকাবা** — নাকানিচোবানি।
নার্জআব — আবর্জনা। **করঘুপা** — ঘুরপাক।

২। **সমার্থক শব্দ লেখো ঃ**
নদী, আকাশ, গাছ, বন্ধু, সাগর।

উত্তর ঃ নদী — তটিনী । **আকাশ** — গগন । **গাছ** — বৃক্ষ । **বন্ধু** — মিত্র । **সাগর** — সমুদ্র

৩। **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ**

চিৎকার — নীরবতা। **আনন্দ** — দুঃখ, বেদনা। **ঠিক** — ভুল। **অসহায়** — সহায়। **সাধ্য** — অসাধ্য।

৪। **কোন্‌টি কোন্ প্রকারে বাক্য লেখো ঃ**

ক) মনে মনে বলব, বাঃ ! (বিস্ময়বোধক)

খ) তুই কেমন করে জানলি? (প্রশ্নবোধক)

গ) বরফ নাকি খুব ঠান্ডা! (বিস্ময়বোধক)

ঘ) জানে শুধু আকাশ। (বিবৃতিমূলক)

ঙ) খাবার চাইছে মায়ের কাছে। (বিবৃতিমূলক)

৫। **নীচের শব্দগুলো সঠিক ছকে বসাও ঃ**

(দেখা, বড়, প্রাণ, নতুন, কে, ওদের, ঠান্ডা, শক্ত, ভয়, সবুজ, ভাবছে, মুক্ত, সুতো, যে, লড়াই, আর, ওই, ডাক, ওর, আমরা, রক্ষা, টান, রাখে)

উত্তর ঃ

বিশেষ্য	বিশেষণ	সর্বনাম	অব্যয়	ক্রিয়া
দেখা	বড়	কে	আর	ভাবছে
প্রাণ	নতুন	ওদের		রাখে
ভয়	ঠান্ডা	কেউ		
সুতো	সবুজ	যে		
লড়াই	মুক্ত	ওই		
ডাক		ওর		
রক্ষা		আমরা		
টান				

৬। **ক্রিয়ার নীচে দাগ দাও ঃ**

ক) কে **জানত**, একদিন হঠাৎ ওদের **দেখা হবে**।

খ) আবর্জনা নিয়ে কে আর দয়া **দেখায়**।

গ) এমনি করে রোজ পৃথিবী নতুন **হচ্ছে**।

ঘ) উল্লাসে **ভরে যায়** চারিদিক।

ঙ) **জানে** শুধু আকাশ।

সমুদ্র

ধ্য — অসাধ্য।

লড়াই, আর, ওই,

সেট — ১৯

১। **একটি করে উদাহরণ দাও ঃ**

প্রশ্নবোধক বাক্য, নির্দেশক বাক্য, অনুজ্ঞাসূচক বাক্য, বিস্ময়সূচক বাক্য।

উত্তর ঃ **প্রশ্নবোধক বাক্য** — তুমি কি আজ দিল্লি যাবে?
নির্দেশক বাক্য — সূর্য উঠলে কুয়াশা দূর হয়।
অনুজ্ঞাসূচক বাক্য — মন দিয়ে বই পড়ো।
বিস্ময়সূচক বাক্য — আকাশটা কী নীল !

২। **নীচের পদগুলি পরিবর্তন করে উপযুক্ত জায়গায় শব্দগুলি বসাও ঃ**

পাণ্ডিত্য, দুধ, গাঙ্গেয়, সাপ্তাহিক, শৈত্য।

উত্তর ঃ ক) নবীন কাকারা একটি দুধেল গাইগোরু কিনেছে।
খ) আজ দারুন শীত।
গ) আমাদের বাড়ির কাছেই গঙ্গা প্রবাহিত।
ঘ) বিদ্যাসাগরের মতো খুব কম পণ্ডিত এদেশে জন্মেছেন।
ঙ) এই সপ্তাহ আমার আনন্দেই কাটল।

৩। **'কটি' এবং 'কোটি' শব্দদুটির অর্থপার্থক্য দেখাও ঃ**

উত্তর ঃ **কটি**-কোমর। **কোটি**-শতলক্ষ।

৪। **এখানকার ভূমি উঁচু-নীচু। 'উঁচু-নীচু'— এরকম বিপরীতার্থক শব্দযুগল দ্বারা আরও দুটি বাক্য লেখো ঃ**

উত্তর ঃ ক) **রাত-দিন** সে খেটে মরছে। খ) **ভালো-মন্দ** মিশিয়েই তো জগৎ।

৫। **কিন্তু, অথচ, নতুবা, নাইবা, নচেৎ— এই অব্যয়গুলোকে বাক্যে প্রয়োগ করো ঃ**

উত্তর ঃ কিন্তু — যেতে পারি **কিন্তু** কেন যাব।
অথচ — বৃষ্টি হচ্ছে **অথচ** সে ছাতা নিল না।
নতুবা — আগামীকাল এসো **নতুবা** রামকে পাঠিও।
নাইবা — আজ **নাইবা** গেলে খেলতে।
নচেৎ — দ্রুত হাঁটো **নচেৎ** ট্রেন ধরতে পারবে না।

৬। **যেটি বাক্য তার পাশে (✓) চিহ্ন এবং যেটি বাক্য নয় তার পাশে (✗) চিহ্ন বসাও ঃ**

ক) ঘুড়ি ছেলেটিকে উড়াইতেছে। (✗)
খ) এসো খেলা করি দু'জনে। (✓)
গ) নদীর কাশ পাড়ে বন। (✗)
ঘ) অনেক কলকাতা থেকে দূর বাড়ি। (✗)
ঙ) বাংলাদেশের বর্ষা বড়ো মনোরম। (✓)

সেট — ২০

১। **'বৃদ্ধ'— এই শব্দের মতো 'দ্ধ' দিয়ে আরও পাঁচটি শব্দ তৈরি করো ঃ**
উত্তর ঃ রুদ্ধ, বুদ্ধ, সুদ্ধ, শুদ্ধ, ক্রুদ্ধ।

২। **বাসনগুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে উঠল। 'ঝন্‌ঝন্‌'— এর মতো ধ্বন্যাত্মক শব্দ দিয়ে পাঁচটি বাক্য লেখো ঃ**
উত্তর ঃ ক) পতাকাটি **পতপত** করে উড়ছে।
খ) **শন্‌শন্‌** করে বাতাস বইছে।
গ) সে **হনহন** করে হাঁটছে।
ঘ) ফোঁড়াটা ব্যথায় **টনটন** করছে।
ঙ) কলসিটা **ঝকঝক** করছে।

৩। **নীচে দাগ দেওয়া পদগুলির পরিচয় লেখো ঃ**
ত্রিপুরা এবং অসম ভারতের সুন্দর দুটি রাজ্য। এদের মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের ভাষা বাংলা।
উত্তর ঃ **ত্রিপুরা** — বিশেষ্য। **অসম** — বিশেষ্য।
সুন্দর — বিশেষণ। **এদের** — সর্বনাম।
এবং — অব্যয়।

৪। **নীচের বর্ণগলি সাজিয়ে শব্দ তৈরি করো ঃ**
তাক্ষদ, নিদৈক, গীথীরভা, লকতাকা, লআনসোসা
উত্তর ঃ দক্ষতা, দৈনিক, ভাগীরথী, কলকাতা, আসানসোল।

৫। **নীচের বাক্যগুলি পুনরায় শুদ্ধ করে লেখো ঃ**
ক) এখানে প্রবেশ নিষেধ। খ) খাঁটি গোরুর দুধ।
গ) সে এই মামলায় সাক্ষী দেবে। ঘ) সব ছাত্ররা খেলছে।
ঙ) আজ আমাদের মুখের পরীক্ষা।
উত্তর ঃ ক) এখানে প্রবেশ নিষিদ্ধ। খ) গোরুর খাঁটি দুধ।
গ) সে এই মামলায় সাক্ষ্য দেবে। ঘ) ছাত্ররা খেলছে।
ঙ) আজ আমাদের মৌখিক পরীক্ষা।

৬। **বিপরীতার্থক শব্দ লেখো ঃ**
মহাশয়, চড়াই, বন্ধুর, দিবস, আসমান।
উত্তর ঃ **মহাশয়** — কদাশয়। **চড়াই** — উৎরাই।
বন্ধুর — সমতল। **দিবস** — রজনি।
আসমান — জমিন।

✦✦✦